সুলাইমান আ . এর এক উম্মতের কারামত ও কারামত অস্বীকারকারীদের মনস্তত্ব :
আফগান মুজাহিদদের কারামত ও কারামত অস্বীকারকারীদের মনস্তত্ব (পর্ব - ২)
আফগান মুজাহিদদের কারামত ও কারামত অস্বীকারকারীদের মনস্তত্ব (পর্ব - ৩) তথাকথিত আহলে হাদীসদের যৌন - সমাচার
সৌদি আরবে পাঠ্যপুস্তক সংস্কার , সহীহ ইসলাম কোথা থেকে শিখব ?
এ মুর্খতার শেষ কোথায় ?
থানবী রহ . এর চিকিৎসা পদ্ধতি : আহলে হাদীসদের মাথাব্যথা ও আমাদের কিছু কথা (পর্ব - ১)
থানবী রহ . এর চিকিৎসা পদ্ধতি : আহলে হাদীসদের মাথাব্যথা ও আমাদের কিছু কথা (পর্ব - ২)
আকিদাতুত ত্বহাবীর ব্যাখ্যাকার ইবনে আবিল ইয : হানাফী না কি হাশাবী ?
শরয়ী আইনের উপযোগিতা (পর্ব - ১)
ইসলামী দন্ডবিধি ও শরয়ী আইনের উপযোগিতা (২)
ইমাম আবু হানিফা রহ . এর নামে ভিত্তিহীন বিকৃত আকিদা প্রচার (পর্ব - ১)
ভ্রান্তির বেড়াজালে সালাফী মতবাদ
আফগান মুজাহিদদের কারামত ও কারামত অস্বীকারকারীদের মনস্তত্ব (পর্ব - ৩) মৃত্যুপরবর্তী কারামত ও কারামত অস্বীকারকারীদের মনস্তত্ব (পর্ব - ১) মৃত্যুপরবর্তী কারামত ও কারামত অস্বীকারকারীদের মনস্তত্ব (পর্ব - ২) মৃত্যুপরবর্তী কারামত ও কারামত অস্বীকারকারীদের মনস্তত্ব (পর্ব - ৩) মৃত্যুপরবর্তী কারামত ও কারামত অস্বীকারকারীদের মনস্তত্ব (পর্ব - ৪) মৃত্যুপরবর্তী কারামত ও কারামত অস্বীকারকারীদের মনস্তত্ব (পর্ব - ৫) মৃত্যুপরবর্তী কারামত ও কারামত অস্বীকারকারীদের মনস্তত্ব (পর্ব - ৬) মৃত্যুপরবর্তী কারামত ও কারামত অস্বীকারকারীদের মনস্তত্ব (পর্ব - ৭) মৃত্যুপরবর্তী কারামত ও কারামত অস্বীকারকারীদের মনস্তত্ব (পর্ব - ৮) সালাফে - সালেহীনের ইবাদতময় জীবন (পর্ব - ১)
সালাফে - সালেহীনের ইবাদতময় জীবন (পর্ব - ২)
সালাফে - সালেহীনের ইবাদতময় জীবন (পর্ব - ৩)
সূফীদের সংগ্রামী জীবন (পর্ব - ১)

সূফীদের সংগ্রামী জীবন (পর্ব - ২)
সূফীদের সংগ্রামী জীবন (পর্ব - ৩)
উঁচু আওয়াজে আমিন বলার বিষয়ে আহলে হাদীসদের নিকট কিছু প্রশ্ন (পর্ব - ১) সূফীদের সংগ্রামী জীবন (পর্ব - ৪)
হাদীসের আলোকে তাবাররুক বা বরকত গ্রহণের বিধান

সুলাইমান আ. এর এক উম্মতের কারামত ও কারামত অস্বীকারকারীদের মনস্তত্ব:
January 13, 2015 at 4:45 PM

ইজহারুল ইসলাম আল-কাউসারী

---- - - --------- - - --------- - - --

সহীহ আকিদার নামে সমাজে বিভিন্ন ফেতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এসব ফেতনার মৌলিক একটি বৈশিষ্ট্য হল, এরা কারামত অস্বীকার করে থাকে। কারামত দেখলেই এর মাঝে শিরক খুজতে শুরু করে। বিভিন্ন কৌশলে কারামতকে শিরক হিসেবে চালিয়ে দিয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করাই এদের অন্যতম লক্ষ। বিশেষভাবে যার থেকে কারামত প্রকাশিত হয়েছে তাকে কুফুরী শিরকের অপবাদ দেয়া এদের কাছে খুবই সাধারণ বিষয়। সেই সাথে পরবর্তী কেউ যদি এধরনের কারামত তার কিতাবে লেখে কিংবা তা বর্ণনা করে, তাকেও তারা কুফুরী শিরকের

[illegible]

[illegible]

[illegible] قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ [illegible]?

[illegible] قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ [illegible]

সুলাইমান আ . এর একজন বুজুর্গ উম্মত ছিল । অধিকাংশ মুফাসসির তার নাম লিখেছেন , আসিফ ইবনে বারখিয়া। তিনি ছিলেন সিদ্দিকীনদের অন্তর্ভূক্ত । তিনি বললেন , قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّي অর্থ : তাদের মাঝে যার কাছে কিতাবের ইলম রয়েছে , সে বলল, আমি আপনার নিকট চোখের পলকে সিংহাসন উপস্থিত করতে পারব । অত:পর, সুলাইমান আ . যখন তার সম্মুখে সিংহাস উপস্থিত পেলেন , তিনি বললেন, এটি আমার প্রভূর বিশেষ অনুগ্রহ । [সূরা নামল , ৩৮-৪০]

এই অস্বাভাবিক ঘটনা বা কারামতটি সুলাইমান আ . এর এক উম্মত আসিফ ইবনে বারখিয়ার হাতে প্রকাশিত হয়েছে। কারামতটিতে হাজার মাইল দূরে একটি রাজ সিংহাসন চোখের পলকে তিনি সুলাইমান আ . এর সামনে উপস্থিত করেছেন। একজন কারামতে বিশ্বাসী মু 'মিন যখন এধরনের অপ্রাকৃতিক অলৌকিক ঘটনা অবলোকন করেন, তিনি সুলাইমান আ . এর মত স্বত :স্ফূর্তভাবে স্বীকার করেন , 'এটি আমার প্রভূর অনুগ্রহে সংঘঠিত হয়েছে '। অথচ একজন কারামত অস্বীকারকারী এখানে শিরকের গন্ধ পেতে শুরু করে। আসুন দেখা যাক , কারামত অস্বীকাকারীরা কীভাবে এই কারামত থেকে শিরক নির্ণয় করে। পবিত্র কুরআনের এই ঘটনাটি আমরা যেভাবে বিশ্লেষণ করেছি , হুবহু একই ধরনের বিশ্লেষণ ও মনস্তত্ব খুজে পাবেন তথাকথিত সালাফী ও আহলে হাদীসদের বইয়ে। সুতরাং আমাদের এই বিশ্লেষণে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। উদাহরণ হিসেবে মুরাদ বিন আমজাদের লেখা সহীহ আকিদার মানদন্ডে তাবলিগী জামাত বইটি দেখতে পারেন। সেখানে এধরনের অসংখ্য বিশ্লেষণ দেখতে পাবেন। উক্ত কারামত থেকে অস্বীকারকারীদের শিরক অনুসন্ধানের একটি নমুনা :১. সুলাইমান আ . এর দরবারে বসা আসিফ ইবনে বারখিয়া হাজার মাইল দূরে অবস্থিত বিলকিস আ . এর সিংহাসন কোথায় সংরক্ষিত আছে কীভাবে জানলেন? তিনি কি গায়েব জানেন ? পবিত্র কুরআনে রয়েছে , একমাত্র আল্লাহ তায়ালা গায়েব জানেন। সুতরাং এই ঘটনায় আসিফ ইবনে বারখিয়া চোখের পলকে সিংহাসন এনে দেয়ার যে কথাটি বলেছেন , এটি মূলত : গায়েব জানার দাবী করা। সুতরাং এখানে তিনি গায়েব জানার দাবী করে শিরক করেছেন (নাউযুবিল্লাহ)। ২ . হাজার মাইল দূরের এত বড় সিংহাসন চোখের পলকে কীভাবে আনা সম্ভব ? একজন মানুষ এত বড় জিনিস এত দূর থেকে এক মুহূর্তে কীভাবে আনতে পারে ? এধরণের অসম্ভব ঘটনা ঘটাতে পারেন একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। সুতরাং সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা ছাড়া এটা কেউ ঘটাতে পারে না। অথচ আসিফ ইবনে বারখিয়া এধরনের ঘটনা ঘটিয়ে নিজেকে সর্বশক্তিমান দাবী করে শিরক করেছে (নাউযুবিল্লা)।

ঠিক এধরনের একটি বিশ্লেষণ দেখতে পাবেন, মতিউর রমহমান মাদানীর দেওবন্দী আকিদা নামক লেকচারে। ইবনে বতুতা ও শাহজালাল রহ. এর একটি কারামত দেলোওয়ার হোসেন সাইদী সাহেব তার ওয়াজে বলেছিলেন। সেই কারামত থেকেও এভাবে শিরক বের করেছিলেন তথাকথিত শায়খ মতিউর রহমান মাদানী। ৩. আসিফ ইবনে বারখিয়া সিংহাসনটি চোখের পলকে এনেছিলেন। হাজার মাইল দূরের জিনিস কীভাবে চোখের পলকে আনা সম্ভব? হয়ত সময় দীর্ঘায়িত হয়েছিল নতুবা স্থান সংকুচিত হয়েছিল। আসিফ ইবনে বারখিয়ার পক্ষে এদু'টির কোনটিই করা সম্ভব নয়। সুতরাং তিনি কীভাবে এধরনের অসম্ভব কাজ করার দাবী করলেন?কোন বুজুর্গ থেকে যদি এধরণের কোন ঘটনা বর্ণিত হয় যে, তিনি আসর থেকে মাগরিবের মাঝে এক খতম কুরআন তেলাওয়াত করেছেন অথবা মুহূর্তে এক জায়গা থেকে হাজার মাইল দূরের কোথাও চলে গিয়েছেন, তাহলে সেটাকে নিয়ে আমাদের সহীহ আকিদার ভাইয়ের যারপর নাই তামাশা করে তাকে শিরক আখ্যা দিয়ে থাকেন। একই ঘটনা পবিত্র কুরআনে সুলাইমান আ. এর উম্মতের হাতে প্রকাশিত হয়েছে, এটা সম্পর্কেও হয়ত তারা একই ধরনের বিশ্লেষণ করে থাকেন। আল্লাহ ভাল জানেন।

৪. অনেক সময় অনেক বুজুর্গ থেকে এমন কিছু কারামত প্রকাশিত হয়েছে যেগুলো সাহাবীদের থেকেও প্রকাশিত হয়নি। তথাকথিত সালাফী-আহলে হাদীস ভাইয়েরা খুব জোর দিয়ে আপনার দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দিবে, যে কারামত সাহাবীদের থেকে প্রকাশিত হল না, সেটা ওলী-বুজুর্গ থেকে কীভাবে প্রকাশিত হতে পারে? তাদের এই মনস্তত্ব থেকে উক্ত ঘটনাকে আমরা এভাবে বিশ্লেষণ করতে পারি,"হযরত সুলাইমান আ. আল্লাহর নবী ছিলেন। আসিফ ইবনে বারখিয়া তার উম্মত ছিল। যেই কারামত নবী থেকে প্রকাশিত হল না, সেটা একজন উম্মত থেকে কীভাবে প্রকাশিত হতে পারে? তাহলে কি নবীর চেয়ে উম্মতের সম্মান বেশি?"

এধরনের আরও অনেক বিশ্লেষণ খুজে পাবেন অস্বীকারকারীদের বই ও লেকচারে। কারামত অস্বীকারের এই ফেতনা যদি শুধু অস্বীকারের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকত তাহলে এটাকে মোতাজিলাদের সমপর্যায়ে বলা যেত। কিন্তু বর্তমানের এই ফেতনা মোতাজিলাদেরকেও ছাড়িয়ে গেছে। বর্তমানের ফেতনাবাজরা শুধু কারামত অস্বীকার করেই ক্ষ্যান্ত হয় না, সেই সাথে যার থেকে কারামত প্রকাশিত হয়, তাকে কুফুরী শিরকের অপবাদ দিয়ে থাকে। তাদের এই মনস্তত্ব সাধার ওলী বুজুর্গদের কারামতের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং পবিত্র কুরআনে বর্ণিত কারামত সম্পর্কেও তারা একই ধরনের ধ্যান-ধারণা রাখে। যেহেতু সকল কারামতের মাঝে কিছু সাধারণ বিষয় থাকে। সাধারণ কারামত এবং পবিত্র কুরআনে বর্ণিত

কারামতের তেমন পার্থক্য নেই। ওলী-বুজুর্গদের কারামত যদি কুফুরী শিরকী হয়, তাহলে এদের মনস্তত্ব অনুযায়ী পবিত্র কুরআনে বর্ণিত কারামতও কুফুরী-শিরকী হবে। নাউযুবিল্লাহ। আমরা আল্লাহর কাছে এধরনের ইমান বিধ্বংসী মনস্তত্ব থেকে আশ্রয় চাই।

কারামত সম্পর্কে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা বিশ্বাস ও অস্বীকারকারীদের সকল প্রশ্নের উত্তর জানতে পড়ুন, কারামত সম্পর্কে অসাধারণ একটি কথোপকথন:

....

আমি তাঁকে বললাম, আপনি যে ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করেছেন, এগুলো হলো কারামাত। একে খরকে আদত বা স্বাভাবিক নিয়ম বহির্ভূত বিষয়ও বলা হয়। সাধারণ নিয়ম হলো স্বামী-স্ত্রীর মিলনের মাধ্যমে সন্তান সৃষ্টি হয়। নিয়ম বহির্ভূত বিষয় হলো, কোন পুরুষের স্পর্শ ব্যতীত হজরত মারইয়াম আ: এর সন্তান হয়েছে। স্বাভাবিক নিয়ম হলো, উটনীর পেট থেকে উট জন্ম নেয়। অস্বাভাবিক বিষয় হলো, পাহাড় থেকে উটনী জন্ম নিয়েছে। সাধারণ নিয়ম হলো, সাপের পেট থেকে সাপ জন্ম নেয়। কিন্তু নিয়ম বহির্ভূত হজরত মুসা আ. এর লাঠি সাপ হয়েছে। সাধারণ নিয়ম হলো ওষুধ ও অপারেশনের মাধ্যমে কুষ্ঠরোগী ও অন্ধ ভালো হয়ে থাকে।

কিন্তু অস্বাভাবিক ব্যাপার হলো, হজরত ইউসুফ আ. এর জামা ও হজরত ইসা আ. এর হাতের দ্বারা অন্ধ ভালো হয়েছে। সাধারণ নিয়ম হলো, গরু গরুর মতো শব্দ করবে। অস্বাভাবিক হলো, গাভি যদি মানুষের মতো কথা বলে। সাধারণ নিয়মের ক্ষেত্রে মানুষ বা মাখলুকের সাধারণ নিয়ন্ত্রণ থাকে। কিন্ত কারামত বা নিয়ম বহির্ভূত বিষয় সম্পূর্ণ আল্লাহর ইচ্ছায় হয়ে থাকে, তবে তা মানুষ বা অন্য কোন সৃষ্টির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। পবিত্র কুরআনে হজরত ইসা আ. এর মু’জেযা উল্লেখ করা হয়েছে। মুসলমানরাও এই মু’জেযাগুলো সত্য মনে করে। তারা এও বিশ্বাস করে, এগুলো হজরত ইসা আ. এর হাতে প্রকাশিত হয়েছে; কিন্তু এগুলো ছিলো, আল্লাহ তায়ালার কুদরতের বহি:প্রকাশ। মুসলমানরা যখন এগুলোকে আল্লাহর বিশেষ ক্ষমতা বলে বিশ্বাস করে, তখন প্রত্যেকটা মু’জেযায় তারা আল্লাহর একত্ববাদের প্রমাণ দেখতে পায়। কিন্তু খ্রিস্টানরা এগুলোকে হজরত ইসা আ. এর ইচ্ছাধীন মনে করে। তারা বিশ্বাস করে এগুলো হজরত ইসা আ. এর নিজস্ব ক্ষমতা। ফলে তারা প্রত্যেকটা মু’জেযার ক্ষেত্রে আল্লাহর সঙ্গে শিরক করেছে। এই মু’জেযা থেকে শিরকের অর্থ উদ্দেশ্য নেয়া তাদের ভ্রান্তি। এখানে আল্লাহ তায়ালা ও ইসা আ. এর কোন ত্র“টি নেই। খ্রিস্টীয় ভ্রান্ত ধারণাই এখানে মূল বিষয়। তারা একটা তাউহিদের প্রমাণকে শিরক বানিয়েছে।

একইভাবে আমরা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত যখন কোন কারামত শুনি, তখন একে আল্লাহ তায়ালার কুদরতের বহি:প্রকাশ মনে করি। একারণে এসব কারামতের ক্ষেত্রে আমরা শুধু একত্ববাদের প্রকাশ দেখি, তাউহিদের প্রমাণ পাই। আপনারা যখন একই কারামতকে খ্রিস্টীয় চেতনা নিয়ে পড়েন, তখন একে শুধু শিরকই মনে করেন।

কিছু বান্দাকে আল্লাহর বিশেষ কুদরতের দ্বারা সম্মানিত করার কারণে নাউযুবিল্লাহ আল্লাহ তায়ালা দোষী নন। আবার এগুলো বিভিন্ন বুযুর্গের হাতে প্রকাশ পাওয়ার কারণে তারাও কোন ত্র“টি করেননি। মূল ত্র“টি হলো, আপনাদের এই খ্রিস্টীয় চেতনা। আপনি এখনও

যদি খ্রিস্টীয় চেতনা মুক্ত হয়ে বিশুদ্ধ ইসলামি চেতনায় এগুলো পড়েন, তবে আপনিও একত্ববাদের প্রমাণ দেখতে পাবেন।

এগুলো হতেই পারে না:

ওহিদ সাহেব খুব চটে গিয়ে বললেন, এখানে অনেক ঘটনা এমন রয়েছে, যেগুলো হতেই পারে ন।
একেবারেই অসম্ভব।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কার পক্ষ থেকে হতে পারে না? আল্লাহর পক্ষ থেকে না কি সৃষ্টির পক্ষ থেকে? যদি বলেন, সৃষ্টির পক্ষ থেকে হতে পারে না। তাহলে আপনার কথা শতভাগ সত্য। এগুলোকে সৃষ্টির নিজস্ব ক্ষমতা মনে করায় হলো খ্রিস্টীয় চেতনা। আর যদি বলেন, এগুলো আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে হতে পারে না, তাহলে আপনি আল্লাহর ক্ষমতা ও ইলম অস্বীকার করলেন। আপনি যদি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এগুলোকে অসম্ভব মনে করেন এবং বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ তায়ালার ততটুকু ক্ষমতা আছে, যতটুকু আপনার আছে, তাহলে আপনার এই তাউহিদ থেকে এখনই তওবা করুন। আপনার এধরনের কথা দ্বারা আল্লাহর ওলিদের কারামত অস্বীকার করা হয় না, বরং আল্লাহ তায়ালার ক্ষমতা অস্বীকার করা হয়।

শুধু মিথ্যা

ওহিদ সাহেব বললেন, মানুষ বুযুর্গদের নামে বিভিন্ন মিথ্যা ও মনগড়া ঘটনা তৈরি করে থাকে। এগুলো কী গ্রহণযোগ্যতা আছে?

আমি বললাম, কোথায় মিথ্যা বানানো হয়নি? মানুষ মিথ্যা খোদা বানিয়েছে।মিথ্যা নবি বানিয়েছে। মিথ্যা হাদিস তৈরি করেছে। বাজারে জাল টাকা বানিয়েছে। আপনি কি শুধু মিথ্যা খোদাকেই অস্বীকার করবেন, না কি সাথে সত্য খোদাকেও? শুধু মিথ্যা নবীকে অস্বীকার করবেন, না কি সাথে সত্য নবীকেও? শুধু জাল হাদিস থেকে বেঁচে থাকবেন না কি সহিহ হাদিস থেকেও। জাল নোট থেকে বাঁচতে গিয়ে আসল নোট ব্যবহারও ছেড়ে দিবেন? কারামতের ক্ষেত্রেও আপনাকে মিথ্যা ঘটনা মানতে কে বলেছে? মিথ্যা ঘটনা থাকার কারণে সত্য ঘটনাও অস্বীকার করবেন কোন যুক্তিতে?

বিবেক মেনে নেয় না

এধরনের ঘটনা কীভাবে মেনে নিবো? অনেক বিষয় এমন রয়েছে, যা নবি ও সাহাবিদের ক্ষেত্রেও ঘটেনি। নবি ও সাহাবাদের মর্যাদা তো ওলিদের থেকে অনেক উর্ধ্বে। একটা অসম্ভব ব্যাপার হলো, একজন নবি ও সাহাবির হাতে যেই কারামত প্রকাশিত হয়নি, সেটা একজন ওলির হাতে প্রকাশিত হবে।

আমি বললাম, আজব ব্যাপার। আপনি এখানে যুক্তি দিতে শুরু করলেন। আপনাকে প্রশ্ন করি, আপনি স্বপ্ন দেখেন কি না? তিনি বললেন, হ্যাঁ, দেখি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হুবহু সেগুলোই দেখেন যা নবি ও সাহাবিগণ দেখেছেন না কি এর চে’ বেশি দেখেন? ওহিদ সাহেব বললেন, এখানে নবি ও সাহাবিদের সঙ্গে কিসের সম্পর্ক? আল্লাহ তায়ালা যা ইচ্ছা তাই স্বপ্নে দেখান। কখনও একটা ছোট্র শিশুও স্বপ্ন দেখে। সকালে বলে যে, আমি স্বপ্ন দেখেছি যে, আজ নানা এসেছে। বাস্তবেও ঐ দিন নানা এসে পড়লো। ফলে স্বপ্ন বাস্তব প্রমাণিত হলো। এই

স্বপ্নকে কেউ এই বলে অস্বীকার করে না যে, পরিবারের বড়রা কেউ স্বপ্ন দেখলো না, একটা শিশু কীভাবে দেখলো?

দেখুন, হজরত মারইয়াম আ. আল্লাহর ওলি ছিলেন। তিনি মৌসুম ছাড়া ফল খাচ্ছিলেন। অথচ হজরত যাকারিয়া আ. আল্লাহর নবি হওয়া সত্ত্বেও তার নিকট ফল আসেনি। হজরত আয়েশা রা. নবিজি স. এর স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তার কোন সন্তান হয়নি। এমনকি একটা কন্যা সন্তানও হয়নি। অথচ হজরত মারইয়াম আ. আল্লাহর ওলি হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে স্বামী ছাড়া পুত্র সন্তান দিয়েছেন। হজরত ইয়াকুব আ. প্রতিদিন নিজের মুখে হাত লাগিয়েছেন। চোখ ভালো হয়নি। অথচ হজরত ইউসুফ আ. এর শুধু জামার স্পর্শে চোখ সুস্থ হয়েছে। যেই বাতাস হজরত সুলাইমান আ.এর সিংহাসন উড়িয়ে নিয়ে যেত, তাকে হিজরতের সময় আদেশ দেয়া হয়নি যে, রসুল স. কে এক মুহূর্তে মদিনায় পৌঁছে দাও। হজরত সুলাইমান আ. নবি হওয়া সত্ত্বেও বিলকিসের সিংহাসন এনেছিলো তাঁর এক সাহাবি। এগুলো সব আল্লাহর ইচ্ছা। তিনি চাইলে হাজার মাইল দূরের বাইতুল মুকাদ্দাস চোখের সামনে দেখাতে পারেন। জান্নাত ও জাহান্নাম চোখের সামনে উপস্থিত করতে পারেন। এর বিপরীতে হুদায়বিয়া সন্ধির সময় উসমান গণি রা. এর শাহাদাতের মিথ্যা সংবাদ আসে। সংবাদটি যাচাইয়ের কোন মাধ্যম ছিলো না। একারণে রসুল স. উসমান রা. এর হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য বাইয়াত শুরু করে দিয়েছিলেন। হুদায়বিয়া মক্কা থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। আল্লাহর ইচ্ছায় শত মাইল দূরের জিনিস দেখতে পেলেও আল্লাহর ইচ্ছা না হওয়ার কারণে কয়েক মাইল দূরের বিষয় জানতে পারেননি। আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা না হওযার কারণে হজরত ইয়াকুব আ. সামান্য দূরে কূপের মধ্যে থাকা হজরত ইউসুফ আ. সম্পর্কে জানতে পারেননি। অথচ আল্লাহর ইচ্ছা হওয়ার কারণে মিশরে অবস্থিত হজরত ইউসুফ আ.এর জামার ঘ্রাণ কিনআনে পেয়েছেন। আমি তাঁকে বললাম, আপনি যে দুনিয়ার সবাইকে মুশরিক মনে করছেন, এ ব্যাপারে দ্বিতীয় বার চিন্তা করুন। আর অন্তর থেকে তওবা করুন।

আফগান মুজাহিদদের কারামত ও কারামত অস্বীকারকারীদের মনস্তত্ব (পর্ব-২)
January 15, 2015 at 8:30 PM

আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় বান্দাদেরকে তার অসংখ্য নিয়ামত অবলোকন করান। কখনও সেগুলো সাধারণ মানুষের কাছে প্রকাশিত হয়, কখনও গোপন থাকে। আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা যেসব অলৌকিক ঘটনা বা অপ্রাকৃতিক বিষয় প্রকাশ করেন, সেগুলোকে কারামত বলা হয়। কারামত কখনও বান্দার নিজস্ব ক্ষমতা বা ইচ্ছায় সংঘঠিত হয় না। একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছা ও তার ক্ষমতায় বান্দার হাতে কারামত প্রকাশিত হয়। এক্ষেত্রে বান্দা উপলক্ষ মাত্র। মূল ক্ষমতা ও ইচ্ছা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার। কোন ব্যক্তি যদি প্রকৃত অর্থে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হয়, এবং তার থেকে অস্বাভাবিক কোন কারামত প্রকাশিত হয়, তবে এটা অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে। ঐতিহাসিকভাবে বর্ণিত কারামতের সত্যতা যাচাই করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বর্তমানে সংগঠিত কারামত হোক, কিংবা ঐতিহাসিক সূত্রে বর্ণিত হোক, কারামতে বিশ্বাস স্থাপন আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মৌলিক আকিদার একটি অংশ। কেউ যদি বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসী হয়ে কারামত অস্বীকার করে তাহলে সে

শুধু আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত থেকে বের হবে না, সেই সাথে ইমানহারা হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসসমূহে অসংখ্য কারামত বর্ণিত হয়েছে।
মৌলিকভাবে কারামত অস্বীকারের অর্থ হল কুরআন ও হাদীসের এসব ঘটনা অস্বীকার করা। কারামত থেকে শিরক অনুসন্ধানের চেষ্টাও একটি ইমান বিধ্বংসী প্রয়াস।

সাধারণ কারামতকে শিরক আখ্যা দিয়ে কাউকে মুশরিক বললেই বিষয়টি শেষ হয় না, হুবহু একই পর্যায়ের ঘটনা বা এর চেয়েও অস্বাভাবিক ঘটনা কুরআন ও হাদীসে থাকতে পারে। একজন সাধারণ বুজুর্গের একটি করামতকে শিরক আখ্যা দিয়ে তাকে যদি মুশরিক বলেন, তাহলে এর চেয়েও অস্বাভাবিক যেসব ঘটনা কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে সেগুলোকে কেন শিরক বলেন না? একজন সাধারণ বুজুর্গের কারামত কোন কিতাবে উল্লেখ করাকে কেন্দ্র করে যদি উক্ত কিতাবের লেখককে শিরকের অপবাদ দেন, কারামত চর্চার অপবাদ দেন, তাহলে কুরআন ও হাদীস কীভাবে এই অপবাদ থেকে মুক্ত থাকে? কোন সুনির্দিষ্ট কিতাবে কারামত উল্লেখের কারণে সেটাকে যদি শিরকের উৎস বলা হয়, তাহলে এর চেয়ে অস্বাভাবিক কারামত যেই কুরআন ও হাদীসে রয়েছে, সেটা কি তাদের শিরকের অপবাদ থেকে মুক্ত থাকে? নাউযুবিল্লাহ, কারামত অস্বীকারকারীদের মনস্তত্ব বিশ্লেষণ করতে গিয়েও আমাদের গা শিউরে উঠে। অনেকেই হয়ত প্রশ্ন কররবেন, দেওয়ানবাগী বা আটরশির ভন্ডপীরের নামেও তো অনেক কারামতের কথা শোনা যায়, এগুলোও কি বিশ্বাস করতে হবে?এর উত্তর আল্লামা আমিন সফদর রহ. এর ভাষায় শুনুন: "ওহিদ সাহেব বললেন, মানুষ বুযুর্গদের নামে বিভিন্ন মিথ্যা ও মনগড়া ঘটনা তৈরি করে থাকে। এগুলো কী গ্রহণযোগ্যতা আছে?আমি বললাম, কোথায় মিথ্যা বানানো হয়নি? মানুষ মিথ্যা খোদা বানিয়েছে।মিথ্যা নবি বানিয়েছে। মিথ্যা হাদিস তৈরি করেছে। বাজারে জাল টাকা বানিয়েছে। আপনি কি শুধু মিথ্যা খোদাকেই অস্বীকার করবেন, না কি সাথে সত্য খোদাকেও? শুধু মিথ্যা নবীকে অস্বীকার করবেন, না কি সাথে সত্য নবীকেও? শুধু জাল হাদিস থেকে বেঁচে থাকবেন না কি সহিহ হাদিস থেকেও। জাল নোট থেকে বাঁচতে গিয়ে আসল নোট ব্যবহারও ছেড়ে দিবেন? কারামতের ক্ষেত্রেও আপনাকে মিথ্যা ঘটনা মানতে কে বলেছে? মিথ্যা ঘটনা থাকার কারণে সত্য ঘটনাও অস্বীকার করবেন কোন যুক্তিতে?"

কোন কিতাবে প্রসিদ্ধ কোন বুজুর্গের কারামত বর্ণিত হলে সেটাকে কুফুরী শিরকের অপবাদ দেয়ার অর্থ হল কুরআন ও হাদীসকেও কুফুরী শিরকের উৎস বলা। হ্যা, কারামত বর্ণিত হলে সেটার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে, কিন্তু কারামতে গায়েবের কোন বিষয়, অস্বাভাবিক ক্ষমতা প্রকাশ ইত্যাদির কারণে অমুক গায়েব জানার দাবী করেছে বলে তাকে শিরকের অপবাদ মূর্খতা ছাড়া কিছুই নয়। কারণ কারামত অর্থই হল অলৌকিক ঘটনা। যেসব বিষয় সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত সেগুলোই কারামত। সুতরাং অস্বাভাবিক ঘটনা হলেই সর্বশক্তিমান, বা গায়েব জানার দাবী করেছে বলে অপবাদ দেয়া হলে সকল কারামতই শিরক হবে। কেননা

প্রত্যেক কারামতের মাঝেই অস্বাভিবক কুদরত বা গায়েব সংশ্লিষ্ট বিষয় থাকে। কারামত অস্বীকারকারীদের এই মনস্তত্ব অনুযায়ী সকল কারামতই শিরক হতে বাধ্য।

ইবনে তাইমিয়া রহ. কারামতের বাস্তবতা ও প্রকার সম্পর্কে বলেন,

"পূর্ণতা মূলত: তিনটি বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। ১.ইলম বা জ্ঞান ২. কুদরত বা ক্ষমতা।
৩. গিনা বা অমুখাপেক্ষীতা।.. এই তিনটি বিষয়ের পরিপূর্ণতা একমাত্র আল্লাহর রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তার ইচ্ছায় কোন বান্দাকে এই তিনটি বিষয়ের কিছু অংশ কারামত হিসেবে দান করে থাকেন।....ইলম বা জ্ঞানের সাথে সংশ্লিষ্ট কারামতের উদাহরণ হল, কেউ এমন কিছু শ্রবণ করা যা অন্য কেউ শোনে না। জাগ্রত বা ঘুমন্ত অবস্থায় এমন কিছু দেখা অন্য অন্যরা দেখে না। ওহী (নবীদের ক্ষেত্রে) বা ইলহাম (ওলীদের ক্ষেত্র) এর মাধ্যমে এমন কিছু জানা, যা অন্যরা জানতে পারে না। অথবা কারও উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ ইলম অবতীর্ণ হওয়া। অথবা এমন বিচক্ষণতা যা আল্লাহ তায়ালা দান করে থাকেন। এগুলোকে কাশফ ও মুশাহাদা (অদৃশ্য বা গায়েবী বিষয় অবলোকন), মুকাশাফা (অদৃশ্য বিষয় উন্মোচন) , মুখাতাবা (অদৃশ্য কথোপকথন) ও বলা হয়ে থাকে। কুদরতের সাথে সংশ্লিষ্ট কারামতের উদাহরণ হল, কোন কিছুর উপর তা'সীর বা ক্ষমতা প্রয়োগ। কখনও এটি মনোবল, সত্যবাদীতা বা দুয়া কবুলের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। কখনও আল্লাহর পক্ষ থেকে কাজটি সম্পন্ন হয়। এক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির নিজস্ব প্রভাব থাকে না। যেমন, কোন ব্যবস্থা নেয়া ছাড়াই শত্রু মৃত্যুবরণ করা। যেমন হাদীসে কুদসীতে রয়েছে, আল্লাহ তায়ালা বলেন, যে আমার ওলীর সাথে শত্রুতা রাখে, আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করি.......। একইভাবে কোন বুজুর্গের প্রতি কারও মনকে আকৃষ্ট করে দেয়া বা তার মহব্বত কারও অন্তরে সৃষ্টি করা। এসকল ক্ষেত্রে বুজুর্গের কোন নিজস্ব প্রভাব থাকে না। একইভাবে কাশফের কিছু বিষয়ও কুদরতের সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমন বুজুর্গের বিভিন্ন হালত অন্যের সামনে প্রকাশিত হওয়া। "সূত্র: আল-মু'জিযা ওয়াল কারামত, পৃ.৯-১০-১১।

ডাউনলোড লিংক:http://ia600409.us.archive.org/10/items/waq50062/50062.pdf

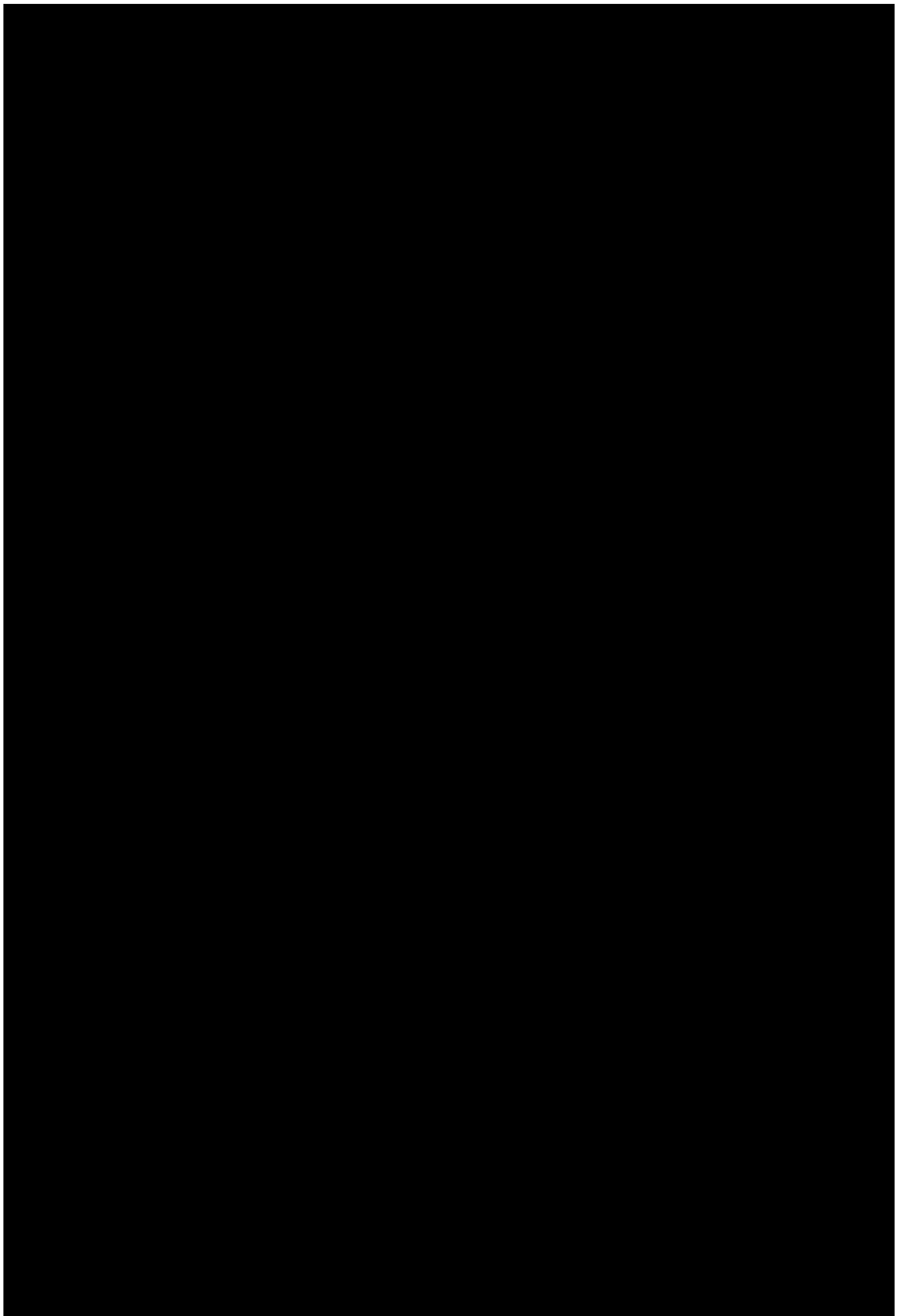

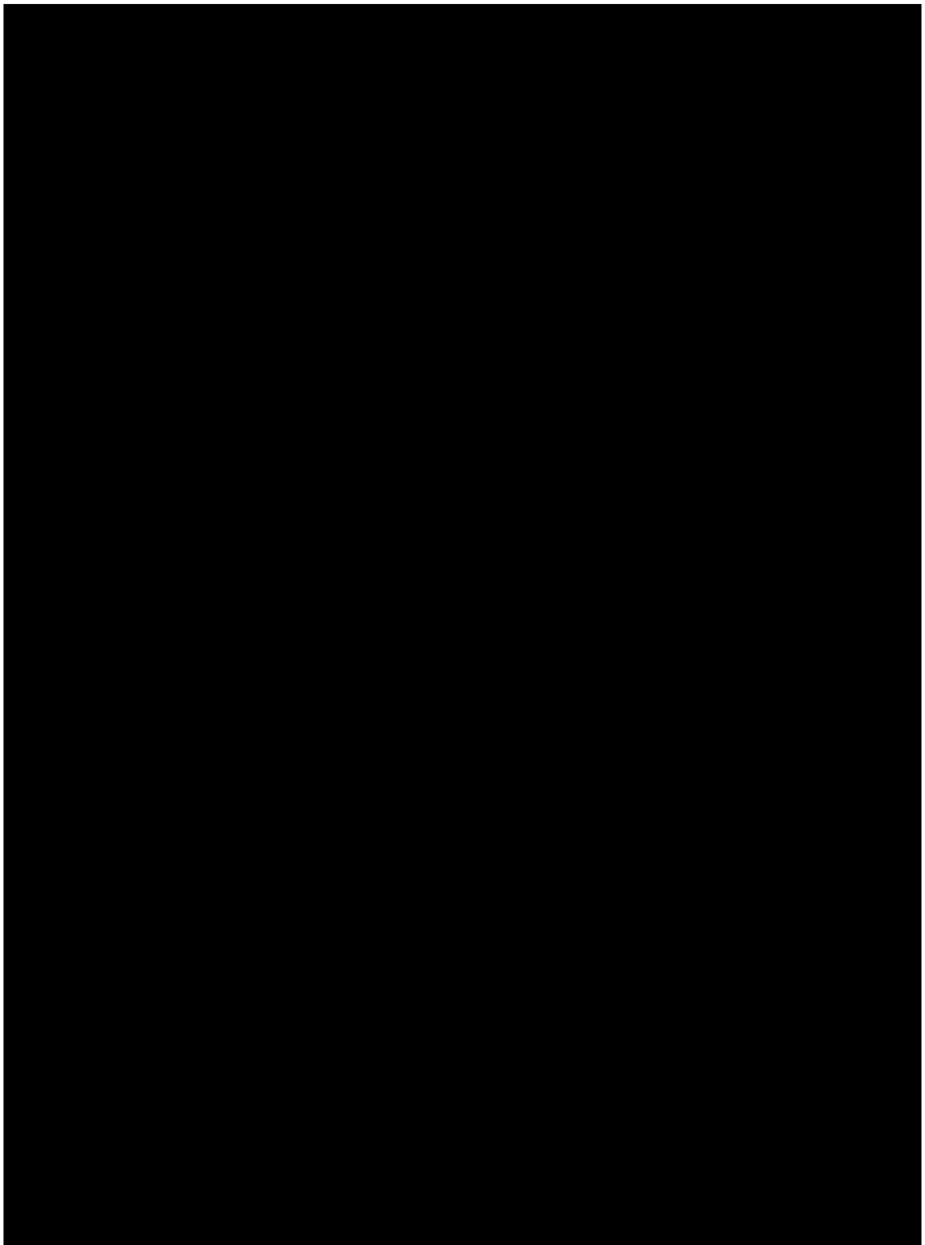

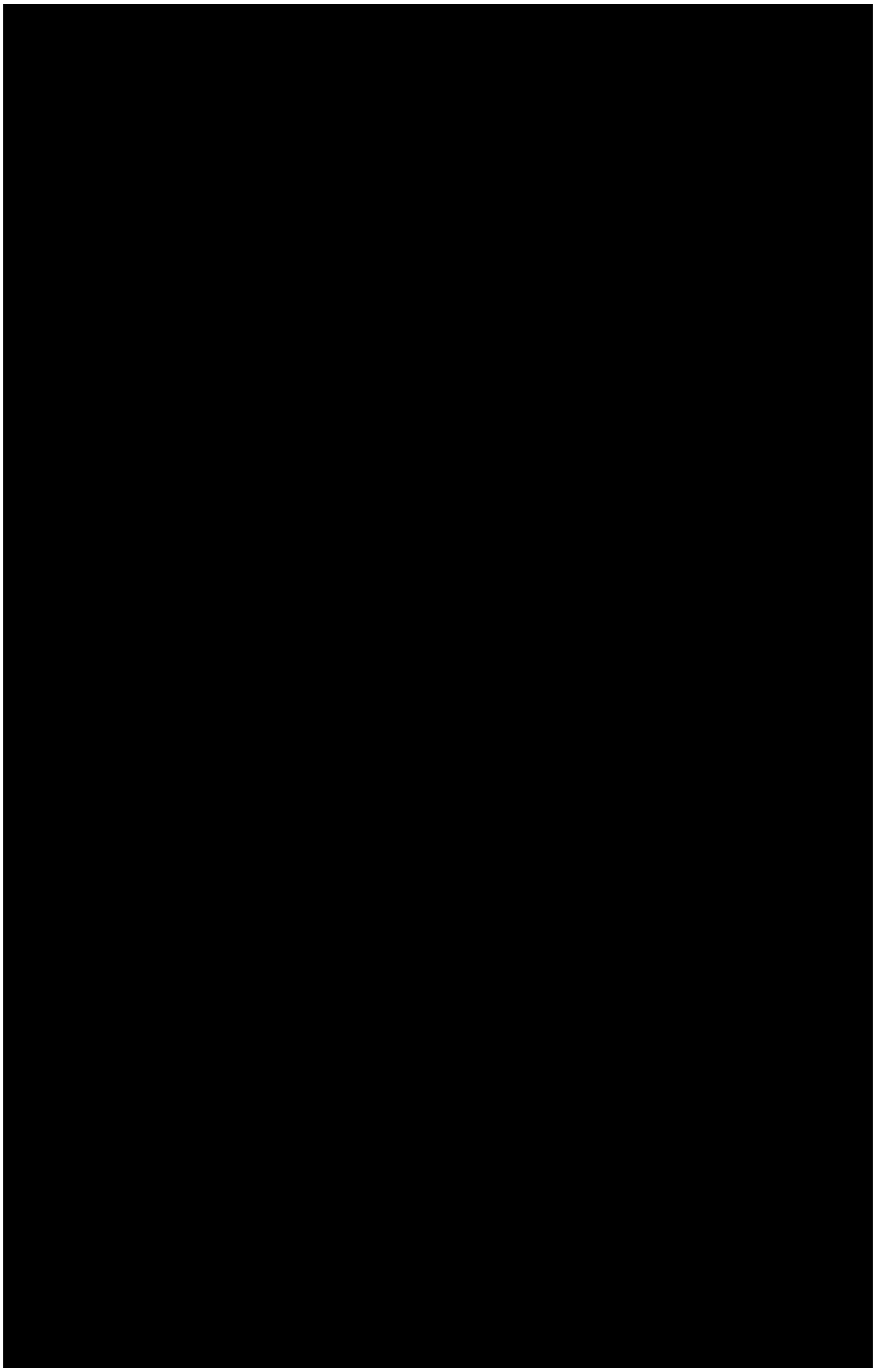

তাদের মনস্তত্ব অনুযায়ী সকল কারামতই শিরক। নাউযুবিল্লাহ। কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত কারামত ও অন্যন্য কিতাবে বর্ণিত কারামতের মাঝে তাদের নিকট পার্থক্য এটুকু যে কুরআন ও হাদীসের কারামতকে মুখ ফুটে সরাসরি শিরক আখ্যা দেয় না, কিন্তু অন্যান্য কিতাবের কারামতকে অবলীলায় শিরক আখ্যা দেয়। এছাড়া শিরকের কারণ বর্ণনার ক্ষেত্রে এদুয়ের মাঝে তাদের নিকট কোন পার্থক্য নেই। মোটকথা, তথাকথিত সালাফী ও আহলে হাদীসদের যারা কারামতকে শিরক আখ্যা দেয়, তাদের মনস্তত্ব অনুযায়ী সকল কারামতই শিরক। সেটি কুরআন-হাদীসে বর্ণিত হোক, কিংবা অন্য কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থে বর্ণিত হোক। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, ঐতিহাসিক গ্রন্থে বর্ণিত কারামতকে সরাসরি শিরক বলে কিন্তু সাধারণ মানুষের ভয়ে কুরআন-হাদীসের কারামতকে শিরক বলা থেকে বিরত থাকে। আল্লাহ এসকল কারামত অস্বীকারকারীদেরকে হেদায়াত দান করুন। আমিন।

কারামত অস্বীকারকারীদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী আফগান জিহাদের কিছু কারামত নিয়ে আসুন আলোচনা করি। তারা যেসকল বিশ্লেষণের আলোকে কারামতকে শিরক বলে, আমরা তাদের দেখানো পদ্ধতি প্রয়োগ করে কিছু বিশ্লেষণ উল্লেখ করছি। রাশিয়ার সাথে আফগানিস্তানের মুজাহিদরা দীর্ঘ সময় যুদ্ধ করেছে। সহায়-সম্বলহীন আফগান মুজাহিদরা তৎকালীন সুপার-পাওয়ারকে নাকানি-চুবানি দিয়ে পালাতে বাধ্য করেছে। এটি মুজাহিদদের অস্ত্র বা পেশীবলে ঘটেনি। একমাত্র আল্লাহর সাহায্যেই এ বিজয় অর্জিত হয়েছিল। আফগান জিহাদে মুজাহিদগণ আল্লাহর অসংখ্য কুদরত ও নিদর্শন অবলোকন করেছেন। অনেক বুজুর্গ মুজাহিদদের হাতে প্রকাশিত হয়েছে অসংখ্য অলৌকিক কারামত। এ ধরনের কিছু কারামত সংকলন করেছেন জানবাজ মুজাহিদ শহীদ ড. আব্দুল্লাহ আজজাম। তার সংকলিত গ্রন্থটির আরবী নাম, আয়াতুর রহমান ফি জিহাদিল আফগান (আফগান জিহাদে আল্লাহর নিদর্শন)। এই কিতাবের ভূমিকায় তিনি কারামত অস্বীকারকারীদের মনস্তত্ব নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। বিশেষভাবে আফগান মুজাহিদ আব্দে রব্বির রাসূল সাইয়্যাফ এই কিতাবের ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। কিতাবের ভূমিকায় তিনি বলেন, وأما الذين يشككون في هذه الكرامات فأنا لا ألومهم لأنهم غارقون في نظراتهم المادية بعيدون عن واقع الجهاد: "যারা এসব কারামতের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে, আমি তাদেরকে ভর্সৎসনা করি না। কেননা তারা তাদের "বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণায়" নিমজ্জিত আছে। তারা জিহাদের বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে।"

আব্দে রব্বির রাসূল সাইয়্যাফ একটি ধ্রুব সত্য তুলে ধরেছেন। বাস্তবে যারা কারামত অস্বীকার করে কিংবা একে কুফুরী শিরকী আখ্যা দেয়, হয়ত এদের মাথায় তথাকথিত 'সহীহ আকিদার' ভূত চেপেছে নতুবা এরা ইউরোপের বস্তুবাদী চেতনায় নিমজ্জিত রয়েছে। মূল আলোচনা শুরুর পূর্বে ড. আব্দুল্লাহ আজজামের এই কিতাব সম্পর্কে কারামত অস্বীকারকারীরা কী মনোভাব পোষণ করে তার একটি ছোট্র উদাহরণ উল্লেখ করব।

" ২০০৭ সালের আগস্ট মাসে সৌদি আরব থেকে প্রকাশিত আর-রিয়াদ পত্রিকায় ফারিস বিন হাজজাম একটি আর্টিকেল প্রকাশ করেন। তিনি এর নাম দেন, আকাজিবুশ শায়খ বা শায়খের মিথ্যাচার। প্রবন্ধের সূচনা করেছেন তিনি এভাবে, " حدثني محمد منجل، قال: رأيت بعينيء الدبابة مرت على أختر محمد" فلم يمت، ثم أخذوه مع اثنين من المجاهدين وأطلقوا على الثلاثة النار من الرشاش، فلم يمت".

هذا بعض من الكتاب الخرافي "آيات الرحمن في جهاد الأفغان"، لمؤلفه الشيخ عبدالله عزام، يرحمه الله، عراب القتال في أفغانستان. وما لم يأت في سير الأنبياء، عليهم السلام، تجده في حكاوي الشيخ عن القتلى".

মুহাম্মাদ মুনজিল আমার কাছে বর্ণনা করেছে, আমি নিজ চোখে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি যে, মুজাহিদ আখতার মুহাম্মাদের শরীরের উপর দিয়ে শত্রুরা ট্যাংক চালিয়েছে, কিন্তু সে শহীদ হয়নি। এরপর তারা আখতার মুহাম্মাদ ও আরও দু'জন মুজাহিদকে ধরে নিয়ে তাদের উপর বিস্ফোরণ নিক্ষেপ করে। এরপরেও তারা শহীদ হয়নি। 'এই হল শায়খ আব্দুল্লাহ আজজামের লেখা কুসংস্কারে ভরা কিতাব আয়াতুর রহমান ফি জিহাদিল আফগান (আফগান জিহাদে আল্লাহর নিদর্শন) এর কুসংস্কারের কিছু নমুনা। নবীদের জীবনে যেসব ঘটনা ঘটেনি, শায়খের বর্ণনায় আফগানিস্তানে মৃত মুজাহিদদের ক্ষেত্রে সেগুলো ঘটতে দেখবেন।

"সূত্র: http://www.alriyadh.com/275872

আমাদের দেশের সহীহ আকিদার ভাইয়েরা যেই যুক্তিতে কারামত অস্বীকার করেন, একই যুক্তি এই লেখক দেখিয়েছেন। নবী বা সাহাবীদের ক্ষেত্রে যেটি ঘটেনি, সেটি অমুক ওলীর ক্ষেত্রে ঘটেছে ? এটা কি সম্ভব ? ওমুক কি তাহলে নবী বা সাহাবীদের চেয়ে সম্মানিত হয়ে গেছে ? এধরনের খোড়া যুক্তি দেখিয়ে তথাকথিত সহীহ আকিদার ভাইয়েরা কারামত অস্বীকার করে থাকে।

প্রিয় পাঠক, লক্ষ করুন, কত ঔদ্ধত্যের সাথে কারামতকে কুসংস্কার আখ্যা দিয়েছে! ট্যাংকের নীচে কারও শহীদ না হওয়া যদি কুসংস্কার হয়, তাহলে ইবরাহীম আ. এর আগুনে পড়ার পরে সুস্থ থাকাকে কী বলা হবে? এভাবেই মানুষকে সালাফী আকিদার নামে, সহীহ আকিদার নামে পথভ্রষ্ট করা হচ্ছে। আকিদা বিশুদ্ধির নামে ঈমানহারা হওয়ার দাওয়াত দেয়া হচ্ছে।

কারামত সম্পর্কে আলোচনা ও কিতাবে কারামত উল্লেখ করাকে যারা কুসংস্কার ও বিদয়াত প্রচারের কারণ বলে মনে করেন, তাদের অভিযোগ খন্ডন করে ড. আব্দুল্লাহ আজজাম লিখেছেন, " এই কিতাবের উপর চতুর্থ অভিযোগ হল, এধরনের ঘটনা প্রচারের মাধ্যমে মানুষের মাঝে কুসংস্কার ও বিদয়াত প্রসারিত হবে। আমি বলব, সন্দেহ নেই, কুসংস্কারাচ্ছন্ন কেউ হয়ত একে কুসংস্কারের উৎস বানিয়ে এর দ্বারা ব্যাবসা করবে, কিংবা তার কুসংস্কারে ভরা চেতনার খোরাক যোগাবে, কিন্তু বাস্তবতা হল, সাহাবায়ে কেরাম রা. তাদের জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বদর প্রান্তে অবতীর্ণ ফেরেশতাদের কথা আলোচনা করতেন; তাদের আকিদায় তো কুসংস্কার বাসা বাধেনি? তাদের আকিদা তো ভ্রষ্ট হয়নি। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ বিশেষভাবে ঐতিহাসিকদের মাঝে যারা মুহাদ্দিস ছিলেন যেমন ইবনে কাসীর তার আল-বিদায়াতে এবং ইবনুল আসীরসহ অন্যরা তাদের কিতাবে অসংখ্য কারামত উল্লেখ করেছেন। হাদীসের এমন কোন কিতাব নেই যে কিতাবে সাহাবায়ে কেরামের ফজীলত ও মর্যাদা, তাদের কারামত ও বৈশিষ্ট উল্লেখ করা হয়নি। এগুলোকি পরবর্তী প্রজন্মের আকিদায় কোন প্রভাব ফেলেছে? এগুলোর কারণে কি মুসলিম উম্মাহের মাঝে বিদয়াত ছড়িয়ে পড়েছে? আমরা আমাদের এসব সালাফের (পূর্ববর্তীগণ) উত্তরসূরী। এক্ষেত্রে আমরা নতুন কিছুর অবতারণা করিনি, আমরা কেবল তাদের অনুসারী।" [সূত্র: আয়াতুর রহমান ফি জিহাদিল আফগান, শহীদ ড. আব্দুল্লাহ আজজাম, পৃ.৩৬]

ডাউনলোড লিংক: http://ia600508.us.archive.org/32/items/waq38881/38881.pdf

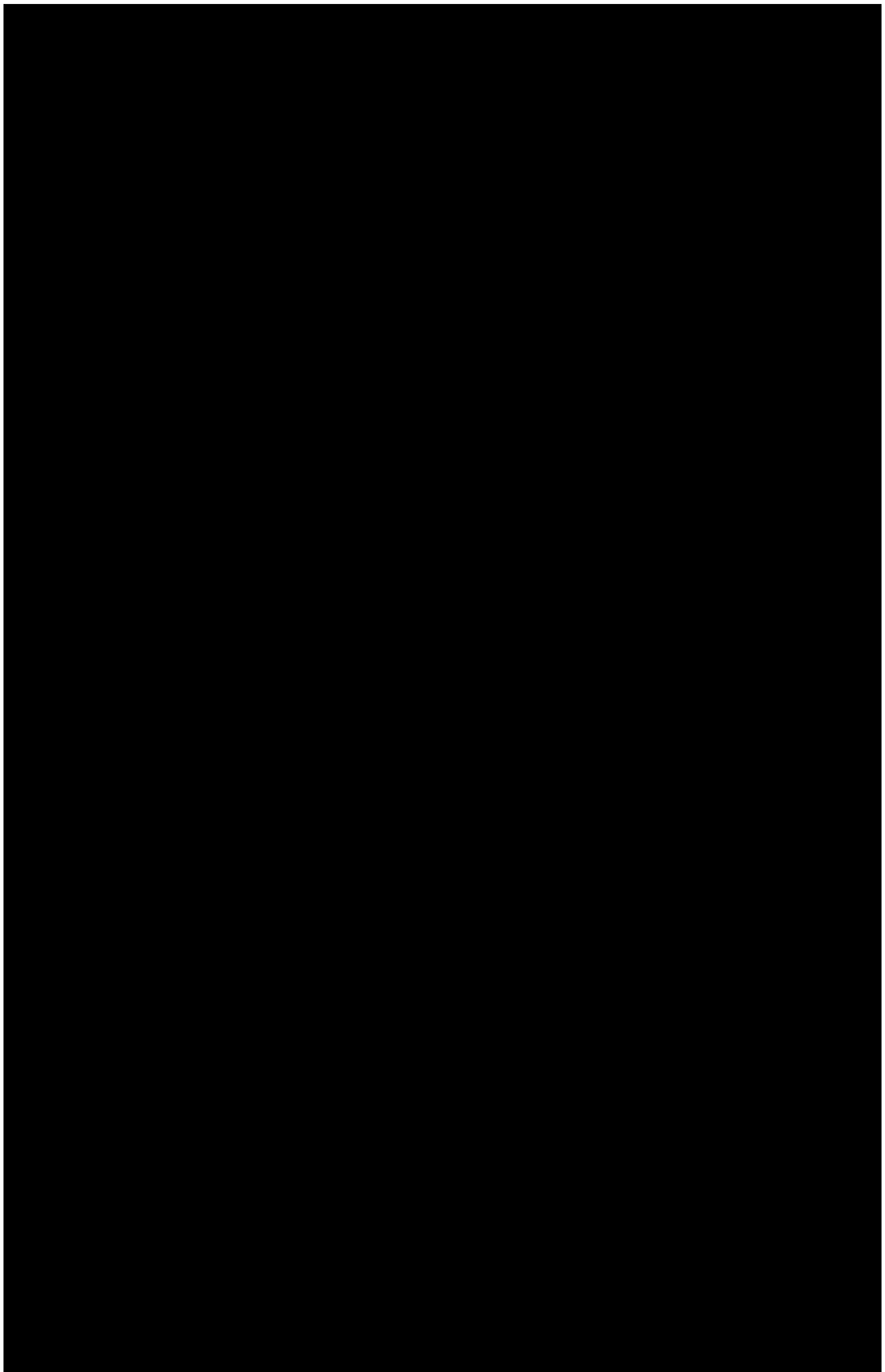

আফগান মুজাহিদদের কারামত ও কারামত অস্বীকারকারীদের মনস্তত্ব (পর্ব-৩)
January 20, 2015 at 8:37 PM

শহীদ হওয়ার তিন দিন পরে পিতার সাথে মুসাফাহা

শহীদ ড. আব্দুল্লাহ আজজাম রহ. তার আয়াতুর রহমান কিতাবের ১০২ নং পৃষ্ঠায় একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

ঘটনার বিবরণ নিম্নরূপ,

"আমার নিটক বিশিষ্ট মুজাহিদ ওমর হানিফ বর্ণনা করেছে, ১৯৮০ সালে রাশিয়া আফগানিস্তানে একটি বড় সেনাদল পাঠায়। তাদের সাথে সত্তরটি ট্যাং ছিল। সাথে বিপুল পরিমাণ অন্যান্য সমরাস্ত্র ছিল। এ সেনাদলকে বারটি হেলিকপ্টার নিরাপত্তা দিচ্ছিল। তাদের মোকাবেলায় ১১৫ জনের একটি মুজাহিদ বাহিনী অগ্রসর হয়। কাফেরদের সাথে প্রচন্ড লড়াই হয়। অবশেষে শত্রু পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। মুজাহিদ বাহিনী তাদের ১৩ টি ট্যাং ধ্বংস করে। মুজাহিদদের মাঝে ৪ জন শাহাদাৎ বরণ করে। এদের মাঝে ইবনে জান্নাত গুল নামে এক ভাই ছিলেন। আমরা তাকে যুদ্ধের ময়দানে দাফন করে আসি। তিন দিন পরে আমরা সেখানে গিয়ে তাকে তার পিতার কবরস্থানে দাফনের জন্য স্থানান্তর করি। তার পিতা জান্নাত গুল এসে ছেলেকে উদ্দেশ্য করে বললেন, " প্রিয় ছেলে!, তুমি যদি শহীদ হয়ে থাকো, তাহলে আমাকে তোমার শাহাদাতের একটি নিদর্শন দেখাও? হঠাৎ শহীদ ছেলেটি হাত বাড়িয়ে তার পিতার সাথে মুসাফাহা করল এবং তাকে সালাম দিল। এমনকি মুসাফাহা করে পনের মিনিট যাবৎ পিতার হাত ধরে রাখল। এরপর হাত তার ক্ষতস্থানে রাখল। শহীদের পিতা পরে বলেছেন, ছেলে মুসাহাফা করার সময় এতো জোরে চাপ দিচ্ছিল যে আমার হাত ভেঙ্গে যাওয়ার আশংকা হচ্ছিল। উমর হানিফ বলেন, এই ঘটনা আমি নিজের চোখে দেখেছি। [সূত্র: আয়াতুর রহমান ফি জিহাদিল আফগান, পৃ. ১০২-১০৩, লিংক: http://ia600508.us.archive.org/32/items/waq38881/38881.pdf]

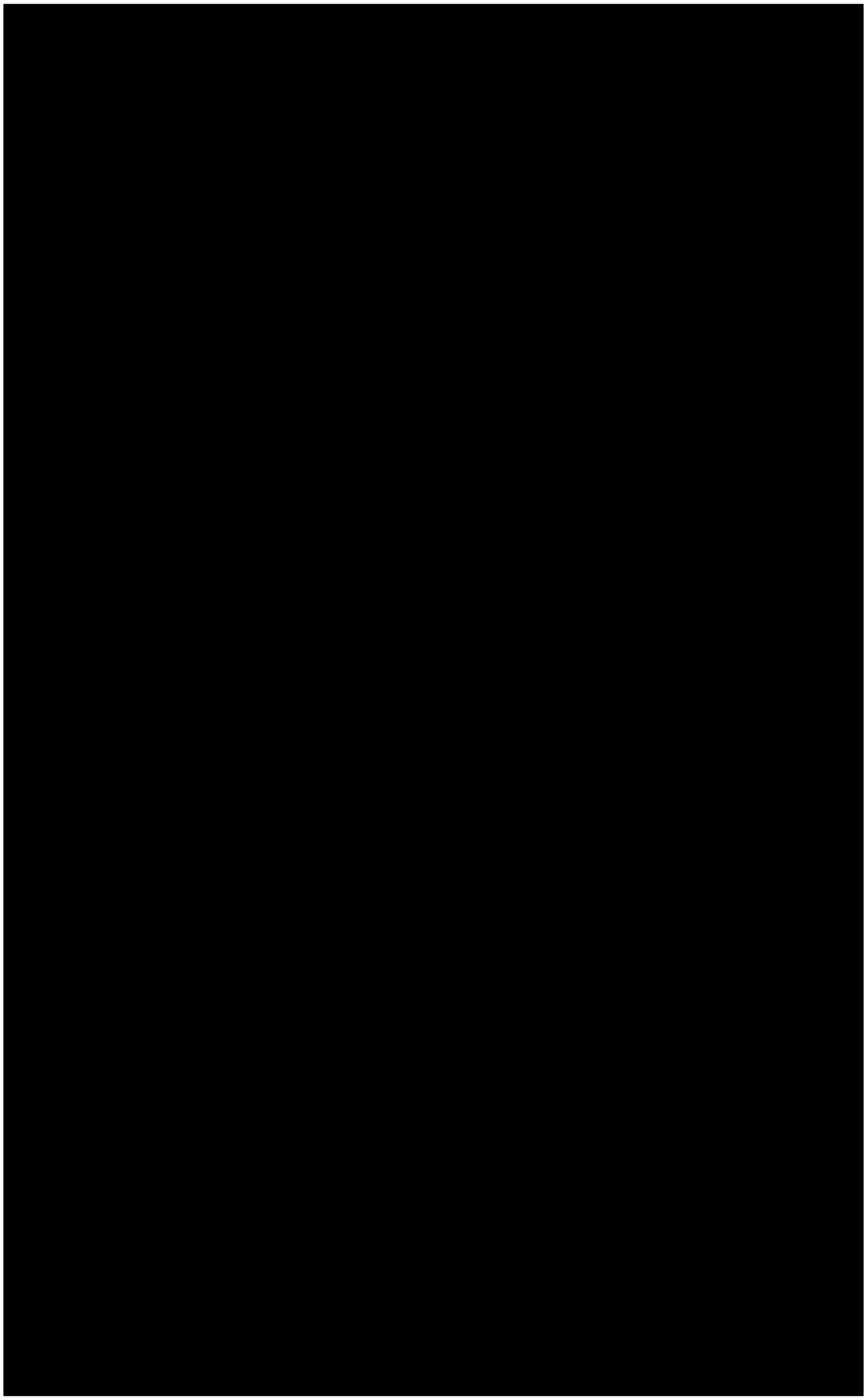

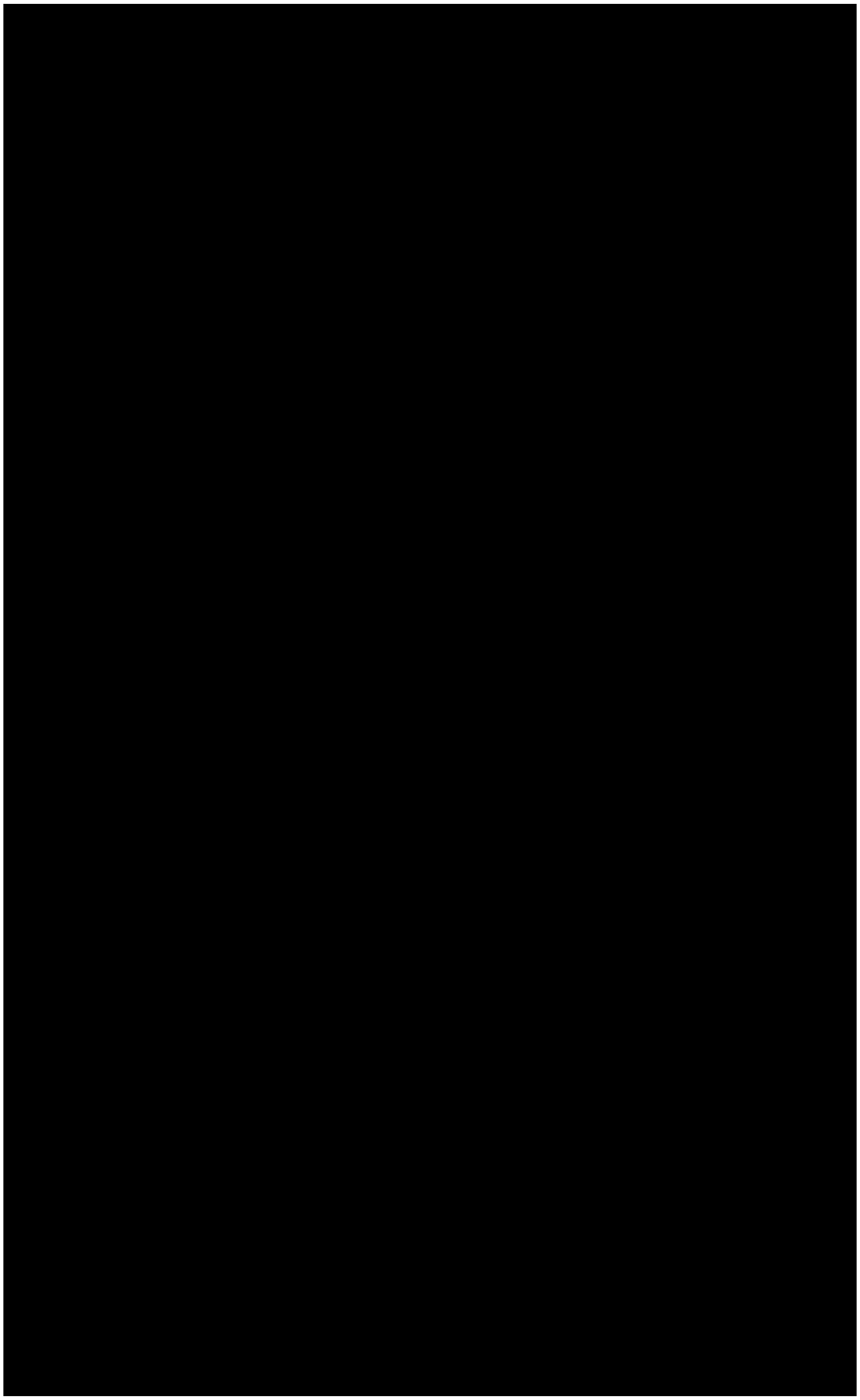

একজন তথাকথিত সহীহ আকিদার সালাফী-আহলে হাদীস ভাইয়েরা এই ঘটনাকে কীভাবে শিরকের অভিযোগে অভিযুক্ত করে, তার একটি নমুনা দেখি। ১. প্রথমত ইবনে জান্নাত গুল শহীদ হয়ে

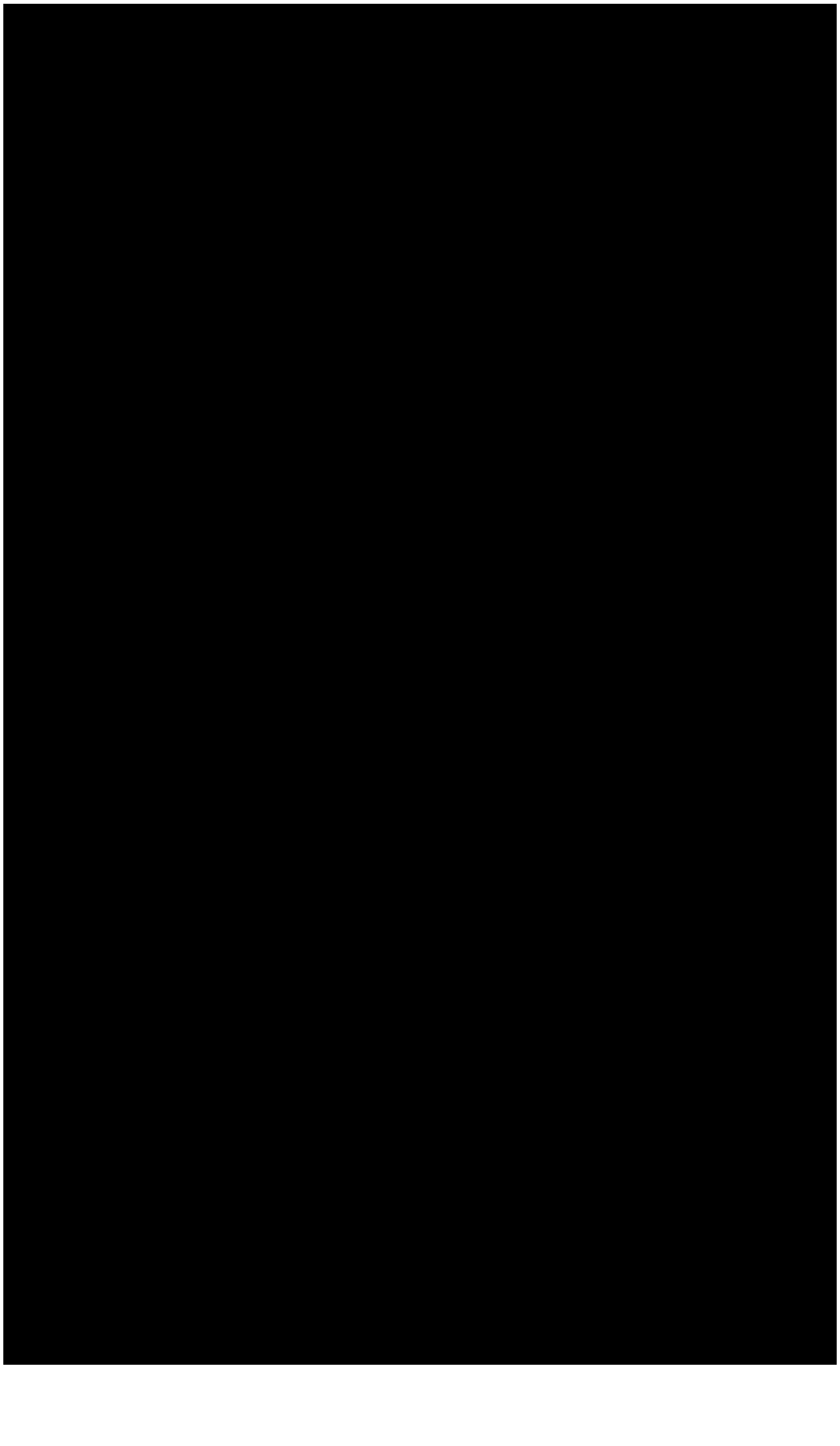

গিয়েছে। সুতরাং তার পক্ষে নড়া-চড়া করাই সম্ভব নয়। সে কীভাবে হাত উঠিয়ে মুসাফাহা করবে?

এধরনের একটি ঐতিহাসিক ঘটনা রয়েছে আহমাদ রিফায়ী রহ. সম্পর্কে। রাসূল স. তার রওজা থেকে হাত বের করে আহমাদ রিফায়ী রহ. এর সাথে মুসাফা করেন। ঘটনাটি জালালুদ্দিনী সূয়ূতী রহ. সহ অনেকেই বর্ণনা করেন। সম্প্রতি এই ঘটনার উপর তাহকীক করে তিন শ পৃষ্ঠার অধিক একটি গবেষণাপত্র বের হয়েছে। আমাদের আলোচ্য বিষয় এটি নয়। ড. আব্দুল্লাহ আজজামের বর্ণনা ও আহমাদ রিফায়ী রহ. এর ঘটনা মৌলিক দিক থেকে একই। আহমাদ রিফায়ী রহ. এর ঘটনা সম্পর্কে তথাকথিত সালাফী মতবাদের অনুসারী সৌদি মুফতী বোর্ডের কাছে একটি ফতোয়া জিজ্ঞাসা করা হয়। ফাজাইলে আমলে যেহেতু আহমাদ রিফায়ী রহ. এর ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, একারণে ফাজায়েলে আমল সম্পর্কে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করা হয়। ফতোয়ার সার-সংক্ষেপ হল,

১. الأصل في الميت نبيًّا كان أم غيره أنه لا يتحرك في قبره بمد يد أو غيرها " মৃত মানুষের ক্ষেত্রে মূল বিষয় হল, তিনি নবী হোক বা অন্য কেউ, তিনি নড়া-চড়া করতে পারেন না। হাত-নাড়ানো বা অন্য কোন ধরনের নড়া-চড়া সম্ভব নয়।

২. রাসূল স. আবু বকর ও উমর রা. এর সাথে হাত বাড়িয়ে মুসাফা করলেন না, অথচ আহমাদ রিফায়ী এর সাথে মুসাফা করলেন?

৩. ولا تجوز الصلاة خلف من يعتقد صحة هذه القصة؛ لأنه مصدق بالخرافات ومختل العقيدة" এই ঘটনা যে বিশ্বাস করে, তার পিছে নামায হবে না। কেননা সে কুসংস্কারপূর্ণ ঘটনায় বিশ্বাস রাখে এবং তার আকিদা বিকৃত।

৪ " ولا تجوز قراءة كتاب (فضائل أعمال) وغيره مما يشتمل على الخرافات والحكايات المكذوبة على الناس في المساجد أو غيرها؛ لما في ذلك من تضليل الناس ونشر الخرافات بينهم." ফাজায়েলে আ'মাল বা এজাতীয় যেসব কিতাবে এধনরের কুসংস্কারপূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলো পড়া জায়েজ নয়। মসজিদে বা অন্য কোথাও সাধারণ মানুষের সামনে এগুলো পড়া জায়েজ হবে না। কেননা এগুলোর দ্বারা তাদেরকে পথভ্রষ্ট করা হবে এবং তাদের মাঝে কুসংস্কার ছড়ানো হবে।"

ফতোয়ায় সাক্ষর করেছেন , ড.বকর আবু যায়েদ ,সালেহ আল-ফাউজান,আব্দুল আজিজ বিন আব্দুল্লাহ আলুশ শায়খ,আব্দুল্লাহ গাদইয়ান [সূত্র : http://www.alifta.net/fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=3&View=Page&PageNo=5&PageID=11014&languagename=]এই ফতোয়ায় তথাকথিত সালাফী শায়খরা যেসব ধৃষ্টতাপূর্ণ বক্তব্য লিখেছে , এর বিস্তারিত জবাব ইনশাআল্লাহ অন্য কোন সময় লিখব । সংক্ষেপে কয়েকটি বিষয় লিখছি।প্রথমত : তারা একটি মূলনীতি উল্লেখ করেছে যে , মৃতের পক্ষে নড়া -চড়া সম্ভব নয় । সে নবী হোক বা অন্য কেউ । এসব সালাফী শায়খদেরকে ছোট্র একটি প্রশ্ন করতে চাই , রাসূল স . মিরাজের রাতে মুসা আ .কে তার কবরে 'দাড়িয়ে ' নামাজ পড়তে দেখেছেন । মুসলিম শরীফসহ বহু হাদীসের কিতাবে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। হযরত আনাস রা . থেকে বর্ণিত এই হাদীসের আরবী পাঠ , مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره[□□□□□□□□□, http://library.islamweb.net/hadith/hadithServices.php?type=1&cid=1256&sid=720]

মুসা আ . যে তার কবরে দাড়িয়ে নামাজ পড়ছিলেন , এটা কি আপনারা বিশ্বাস করেন না কি অস্বীকার করেন ? এটা কে সম্ভব বলেন না কি অসম্ভব বলেন ? এছাড়াও মিরাজের রাতে সমস্ত নবী বাইতুল মুকাদ্দাসে উপস্থিত হলেন এবং বোখারী মুসলিম সহ প্রায় সকল হাদীসের কিতাবে বিভিন্ন আসমানে নবীদের সাথে রাসূল স . এর কথোপকথন রয়েছে। এগুলো বিশ্বাস করেন না কি এগুলোও অস্বীকার করেন ? এগুলোকে কি কুসংস্কার বলে ছুড়ে ফেলার ফতোয়া দেন ? এধরনের ঘটনা বিশ্বাস করলে তার পিছে নামায হবে না। রাসূল স . মুসা আ . এর কবরে নামাযের ঘটনা বর্ণনা করেছেন, রাসূল স . এর পিছে কি সাহাবাদের নামায হয়েছে ? রাসূল স . নিজে মি 'রাজের ঘটনা বর্ণনা করেছেন , তাহলে কি রাসূল স . এর পিছে সাহাবীদের নামায হত না ? এধরনের ঘটনা বর্ণনা করে হাদীসের কিতাবগুলো কি উম্মতের মাঝে কুসংস্কার ছড়িয়েছে ? হাদীসের কিতাব কি তাহলে উম্মতের আকিদা নষ্ট করেছে ? আপনারা ফতোয়া দিয়েছেন , যেসব কিতাবে এই জাতীয় ঘটনা থাকবে সেগুলো পড়া জায়েজ নয়। তাহলে বোখারী -মুসলিম পড়া কি বৈধ ? আপনাদের ফতোয়াটি শুধু আহমাদ রিফায়ী রহ . এর ঘটনা সংশ্লিষ্ট নয় , আপনারা স্পষ্ট লিখেছেন , যেসব কিতাবে এজাতীয় ঘটনা থাকবে সেগুলো মসজিদে বা অন্য কোথাও পড়া জায়েয নয়। বোখারী -মুসলিমের কথা না হয় বাদই দিলাম , পবিত্র কুরআনে মৃত জীবিত হওয়ার যেসব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে , সেগুলো সম্পর্কে আপনাদের ফতোয়া কি ? সেগুলোকেও কি কুসংস্কার বলে ছুড়ে ফেলবেন ? গাভীর গোশ্তের স্পর্শে মুসা আ . এর এক উম্মত জীবিত হওয়ার ঘটনা সূরা বাকারায় রয়েছে। এটাও কি খুরাফাত বা কুসংস্কার ? এধরনের অসংখ্য উদাহরণ কুরআন ও হাদীসে রয়েছে। মূল কথা হল , তথাকথিত সহীহ আকিদার ধোয়া তুলে মানুষকে যারা মূল কুরআন -সুন্নাহের প্রতি আস্থাহীন করে তুলছে , তাদের বাস্তবতা বড় ভয়ংকর।

ইবনে তাইমিয়া রহ. তার কিতাবে লিখেছেন, وقد يكون إحياء الموتى على يد أتباع الأنبياء (ع) كما وقع لطائفة من هذه الأمة "কখনও নবীদের অনুসারী উম্মতের হাতেও মৃতকে জীবিত করার ঘটনা ঘটতে পারে। যেমন, রাসূল স. এর উম্মতের অনেকের ক্ষেত্রে এই ঘটনা ঘটেছে।"[আন-নুবুওয়াত, পৃ.২৯৮]ইবনে তাইমিয়া রহ. এর এই ফতোয়ার কারণে কিন্তু এসব সালাফী শায়খরা কখনও এই ফতোয়া দেননি যে, ইবনে তাইমিয়া রহ. এর নিজের নামায হত না, এবং তার পিছে যারা নামায পড়ত তাদেরও নামায হত না। সেই সাথে ইবনে ইবনে তাইমিয়া রহ. এর কিতাবও পড়া জায়েজ নয়, কারণ এগুলো মানুষের আকিদা নষ্ট করে এবং এতে কুসংস্কার রয়েছে। মৃত ব্যক্তি নড়া-চড়া করা তো দূরে থাক, ওলী-বুজুর্গের হাতে মৃত ব্যক্তি জীবিত হলেও তাদের নিকট আকিদা নষ্ট হয় না। তবে শর্ত হল, উক্ত আলেম তাদের ঘরানার হতে হবে। কিন্তু অন্য কোন মতের অনুসারী কোন আলেম যদি এই কথা লিখত, তাহলে ঠিকই মুফতী বোর্ড ফতোয়া বের করত, অমুকের কিতাব পড়া জায়েজ নয়। তার কিতাব বাতিল আকিদা ও কুসংস্কারে ভরা। কিন্তু তাদের অনুসরণীয় ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এর চেয়েও মারাত্মক কোন বিষয় লিখলেও সেগুলো সহীহ আকিদা হিসেবেই বিবেচিত হয়। আসলে এখানে হিন্দু সমাজে প্রচলিত প্রবাদই প্রতিপাদ্য। যত দোষ নন্দ-ঘোষ।

যাই হোক, সৌদি মুফতী বোর্ডের উক্ত ফতোয়া অনুযায়ী আমরা যেই উপসংহার টানতে পারি, শহীদ ড. আব্দুল্লাহ আজজামের পিছে নামায পড়া বৈধ নয়। তার কিতাব আয়াতুর রহমান পড়া জায়েজ নয়। ড. আব্দুল্লাহ আজজামের আকিদা বাতিল ও বিকৃত ছিল। এধরনের ঘটনা কুসংস্কার। এগুলো বর্ণনা করার মাধ্যমে ড. আব্দুল্লাহ আজজাম সাধারণ মানুষের মাঝে কুসংস্কার ছড়িয়েছেন, এবং তাদের আকিদা বিনষ্ট করেছেন।

২. তথাকথিত সালাফী-আহলে হাদীসদের মনস্তত্ব অনুযায়ী শহীদ আব্দুল্লাহ আজজামের উক্ত ঘটনায় সহীহ আকিদা বিরোধী আরেকটি বিষয় হল, মৃত ব্যক্তি শুনতে পায় না। দাফনের তিন দিন পরে যাকে উঠানো হয়েছে সে কীভাবে তার পিতার কথা শুনল?৩. তথাকথিত সহীহ আকিদার ভাইদের মনস্তত্ব অনুযায়ী উক্ত ঘটনার উপর তৃতীয় অভিযোগ হল, শহীদ হওয়ার তিন দিন পরে সে কীভাবে টের পেল যে তার পিতা তার সাথে কথা বলছে? সে কি গায়েব জানে? সে যদি গায়েব না জানত, তাহলে তো তার পিতাকে চেনার কথা নয়। সুতরাং এটি সহীহ আকিদা বিরোধী শিরকী ঘটনা। ৪. তিন আগে মারা যাওয়া ব্যক্তি সালাম দিয়ে হাত বাড়িয়ে মুসাফাহা করার মত কুসংস্কার যে কিতাবে রয়েছে সেটি পড়া বা প্রচার করা বৈধ নয়। সুতরাং ড. আব্দুল্লাহ আজজামের এই

কুসংস্কারপূর্ণ কিতাব পড়া ও প্রচার করা জায়েয নয়। এটি হল তথাকথিত কারামত অস্বীকারকারীদের সর্বশেষ মনস্তত্ব।

আল্লাহ তায়ালা সহীহ আকিদার নামে সাধারণ মানুষকে যারা ভ্রান্তির অতল তলে নিমজ্জিত করার চেষ্টা করছে, তাদের সবাইকে হেদায়াত দান করুন। আমীন।

তথাকথিত আহলে হাদীসদের যৌন-সমাচার
January 22, 2015 at 11:13 PM

[কৈফিয়ত: ফেসবুকের মতো একটি ওপেন সোশাল মিডিয়াতে বিষয়টি আলোচনা করা সমীচীন মনে করছি না। এরপরও বাধ্য হয়ে করতে হচ্ছে। হাজার বছরের সমৃদ্ধ ইসলামী ফিকহ ভান্ডার হানাফী মাজহাবকে কিছু উগ্র আহলে হাদীস বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নোংরা অপবাদে জর্জরিত করার চেষ্টা করে। হানাফী মাজহাবের লাখ লাখ মাসআলা থেকে দু'একটি মাসআলার খন্ডিত বক্তব্য নিয়ে তারা নিজেদের পক্ষ থেকে কিছু বিকৃত ব্যাখ্যা জুড়ে দিয়ে সেগুলোকে নোংরাভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করে আসছে। একাজে আহলে হাদীসদের প্রসিদ্ধ আলেমদের থেকে শুরু করে কর্মী পর্যায়ের সকলেই সিদ্ধহস্ত বলা যায়। এদের ছোট ছোট বইগুলোও এধরনের বিকৃতি ও নোংরামির প্রমাণ বহন করে। হানাফী মাজহাবের একটি মাসআলার খন্ডিত অংশ নিয়ে সাধারণ মানুষকে এই বলে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে যে, দেখুন, হানাফী মাজহাব কত নোংরা কথা বলে। হানাফী মাজহাবের মাসআলার কতো লজ্জাকর। এভাবে মিথ্যাচার আর বিকৃতির আশ্রয় সাধারণ মানুষকে সরল-সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করার অপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ বাস্তবতা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। আহলে হাদীসদের ফতোয়া ও মাসআলাসমূহ এতটা নোংরা ও রুচিহীন যে, খোদ আহলে হাদীস আলেমরাই একে কুক শাস্তর বা কামসূত্র আখ্যা দিয়েছে। বিষয়গুলো যেহেতু রুচিহীন ও নোংরা, একারণে এগুলো আলোচনা করাটাও সমীচীন নয়। নোংরা বিষয়ের আলোচনা করাও এক ধরনের নোংরামি। তবে শরীরের কোন অঙ্গ পচে গেলে বাধ্য হয়েই সেটার সার্জারি করতে হয়। বিকৃত মস্তিষ্কের যেসব উগ্র আহলে হাদীস হানাফী মাজহাবের ফতোয়া নিয়ে মিথ্যাচার করে, তাদের সামনে তাদের নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক। একারণে একান্ত বাধ্য হয়ে এধরনের একটা নোংরা বিষয়ে কলম ধরতে হল। আলোচনায় আহলে হাদীসদের যেসব আলেমদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, এদের অধিকাংশই আহলে হাদীসদের পুরোধা আলেম ছিলেন। এদের বিস্তারিত পরিচয় উপমহাদেশে আহলে হাদীসদের ইতিহাস বিষয়ক যে কোন বইয়ে পাবেন। আমি এখানে বাংলাদেশে আহলে হাদীসদের মুখপাত্র মাসিক আত-তাহরীক পত্রিকা থেকে কিছু কিছু পরিচয় উল্লেখের চেষ্টা করেছি।]

১. আহলে হাদীসদের একজন পুরোধা আলেম হলেন, জনাব ওহিদুজ্জামান হাইদ্রাবাদী। তিনি আহলে হাদীস মহলে সর্বাধিক প্রচলিত সিহাহ সিত্তার উর্দু অনুবাদক। এছাড়াও বহু গ্রন্থপ্রণেতা। আহলে হাদীসদের প্রথম সারির আলেম ছিলেন জনাব ওহিদুজ্জামান হাইদ্রাবাদী। মাসিক আত-তাহরীক পত্রিকায় মনীষী চরিত শিরোনামে ওহিদুজ্জামান হাইদ্রাবাদীর জীবন ও কর্ম আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনায় ওহিদুজ্জামান সাহেবের পরিচয় দেয়া হয়েছে এভাবে, [''শায়খুল কুল ফিল কুল' মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর (১৮০৫-১৯০২ খৃঃ) প্রায় সোয়া লক্ষ ছাত্রের মাঝে যারা নিজেদের ইলমী আভা বিকিরণে সদা তৎপর ছিলেন এবং গ্রন্থ রচনা ও হাদীছ শাস্ত্রের প্রচার-প্রসারে নিশিদিন অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করেছেন মাওলানা অহীদুয্যামান ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ইমাম মুহাম্মাদ বিন সঊদ বিশ্ববিদ্যালয়ের (রিয়াদ, সঊদী আরব) শিক্ষক ড. আব্দুর রহমান ফিরিওয়াঈ বলেন, من مشاهير الهند وكبار تلامذة السيد نذير حسين. قضى حياته فى نشر السنة النبوية، وله منة عظيمة على أهل الهند حيث قام بترجمة وشرح كتب السنة إلى الأردية. 'তিনি ভারতের প্রখ্যাত আলেম এবং সাইয়িদ নাযীর হুসাইনের বড় মাপের ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হাদীছের প্রসারে তিনি তাঁর জীবন ব্যয় করেছেন। ভারতবাসীর ওপর তাঁর বড় অবদান রয়েছে। তিনি উর্দূতে হাদীছের গ্রন্থাবলী অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করেন'। মাসিক আত-তাহরীক পত্রিকায় ওহিদুজ্জামান সাহেবের রচিত গ্রন্থাবলীর তালিকা দেয়া রয়েছে। আমরা যেসব কিতাব থেকে উদ্ধৃতি দিব, সেগুলোর নাম উক্ত তালিকা থেকে দেখে নিতে পারেন। যেমন, ওহিদুজ্জামান সাহেবের নুজুল আবরার। বিস্তারিত: http://www.at-tahreek.com/april2011/4.html]

২. ভারত উপমহাদেশে আহলে হাদীস মতবাদ যাদের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি প্রসার লাভ করেছে, তাদের অন্যতম পুরোধা আলেম হলেন, নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান ভুপালী। নওয়াব সাহেব অতীত ও বর্তমানের সকল আহলে হাদীসের নিকট গ্রহণযোগ্য আলেম। তার রচিত গ্রন্থ ও লেখনী নিয়ে আহলে হাদীসরা গর্ব করে থাকেন। মাসিক আত-তাহরীক পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান ভূপালীর জীবন ও কর্ম, তার বক্তব্যের উদ্ধৃতি আলোচনা করা হয়েছে। আত-তাহরীক পত্রিকার সার্চ অপশনে গিয়ে 'হাসান খান' লিখে সার্চ দিলেই বিস্তারিত পেয়ে

যাবেন। http://www.at-tahreek.com/search.html মাসিক আত-তাহরিকে নওয়াব সিদ্দিক হাসান খানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়া হয়েছে এভাবে,"নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভারতীয় উপমহাদেশের বহু গ্রন্থ প্রণেতা আলেম ছিলেন। তিনি আরবী, ফার্সী ও উর্দূ তিন ভাষাতেই লিখেছেন। তাফসীর, হাদীছ, ফিকহ, ইতিহাস, আক্বাইদ, কবিতা ও কাব্যচর্চা, সাহিত্য, নৈতিকতা, তাছাওউফ প্রভৃতি বিষয়ে তিনি বিভিন্ন শিরোনামে ৩২৩টি গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেছেন।"[বিস্তারিত, http://www.at-tahreek.com/june2014/article0201.html]

এমনকি আহলে হাদীসদের অনুসরণী সালাফী আলেম শায়খ নাসীরুদ্দীন আলবানী সিদ্দিক হাসান খানের কিতাব পড়ার জন্য মানুষকে নসীহত করেছেন। [বিস্তারিত, http://www.at-tahreek.com/tawheederdak/sep-oct2010/8.html]

নওয়াব সিদ্দিক হাসানের খানের বিশিষ্ট সাহেবজাদা জনাব নুরুল হাসান খানও আহলে হাদীসদের অন্যতম বরেণ্য আলেম ছিলেন। আমরা এখানে নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান ও তার ছেলে নুরুল হাসান খানের বেশ কয়েকটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করব। ৩. আহলে হাদীসদের আরেকজন শীর্ষস্থানীয় আলেম হলেন মিয়া নজীর হুসাইন দেহলভী। তিনি আহলে হাদীসদের সকলের উস্তাদ বা শাইখুল কুল ফিল কুল হিসেবে পরিচিত। আহলে হাদীসদের দাবী অনুযায়ী তিনি সোয়ালক্ষ ছাত্রের উস্তাদ ছিলেন। আহলে হাদীসদের মাঝে মিয়া ছাহেব বললে মিয়া নজীর হুসাইন দেহলভীকে বোঝান হয়। মাসিক আত-তাহরিক পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় মিয়া নজীর হুসাইনের উদ্ধৃতি, কর্ম বা খেদমত আলোচনা করা হয়েছে।আমরা যাদের কিতাব থেকে উদ্ধৃতি দিব, তাদের সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে আহলে হাদীসদের লিখিত চালিস উলামায়ে আহলে হাদীস দেখতে পারেন।

এবার আসুন আহলে হাদীসদের এই বরেণ্য আলেমের কিছু উল্লেখযোগ্য ফতোয়া দেখা যাক।

১. নওয়াব সিদ্দিক হাসান খানের পুত্র জনাব নুরুল হাসান খান লিখেছেন," নামাযে কারও গোপনাঙ্গ যদি সকলের সামনে খোলা থাকে, তাহলে তার নামায নষ্ট হবে না। "[আরফুল জাদী, পৃ.২২]

নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান লিখেছেন,"মহিলারা একাকী নামাযের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় নামায আদায় করতে পারবে। মহিলা যদি অন্যান্য মহিলাদের সাথে সকলেই উলঙ্গ অবস্থায় নামায আদায় করে, তবে তাদের নামায বিশুদ্ধ হবে। স্বামী-স্ত্রী দু'জনে যদি উলঙ্গ হয়ে নামায আদায় করে তবে নামায বিশুদ্ধ হবে। মহিলা যদি তার পিতা, ছেলে, ভাই, চাচা, মামু সকলের সামনে উলঙ্গ অবস্থায় নামায আদায় করে, তবুও নামায বিশুদ্ধ হবে। "[বুদুরুল আহিল্যা, পৃ.৩৯]

এই মাসআলা থেকে কেউ হয়ত ভাবতে পারেন যে, এটি হয়ত বিশেষ ওজরের কারণে বলেছে। বিষয়টি এমন নয়। আহলে হাদীসদের নিকট কাপড় থাকা অবস্থায়ও যদি কেউ উলঙ্গ হয়ে নামায পড়ে, তার নামায বিশুদ্ধ হবে। ওহিদুজ্জামান হাইদ্রাবাদী বিষয়টি স্পষ্ট করে লিখেছেন,"সাথে কাপড় থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ উলঙ্গ হয়ে নামায পড়ে, তাহলে তার নামায বিশুদ্ধ হবে"[নুজুলুল আবরার, খ.১. পৃ.৫২]

নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান লিখেছেন,"রানে সঙ্গম করা এবং স্ত্রীর মলদ্বারে সঙ্গম করা জায়েয। বরং এটি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। "[বুদুরুল আহিল্যা, পৃ.১৭৫]কয়েকবার আস্তাগফিরুল্লাহ পড়ে নিন। ওহিদুজ্জামান সাহেব লিখেছেন, " স্ত্রীদের মলদ্বারে সঙ্গম করতে চাইলে স্ত্রীদের জন্য নিষেধ করা জায়েজ নয়"[হাদইয়াতুল মাহদী, খ.১, পৃ.১১৮]তিনি আরও স্পষ্ট করে লিখেছেন, "গুহ্যদ্বারে সঙ্গমের কারণে গোসলও ফরজ হয় না"[নুজুলুল আবরার, খ.১, পৃ. ২২]

ওহিদুজ্জামান সাহেব অতি আশ্চর্যজনক একটি মাসআলা লিখেছেন। " কেউ যদি নিজের পুরুষাঙ্গ নিজের মলদ্বারে প্রবেশ করায়, তাহলে গোসল ওয়াজিব হবে না"[নুজুলুল আবরার, খ.১, পৃ.২২]মন্তব্য: এধরনের নোংরা বিষয়ের উপর মন্তব্য করা নিষ্প্রয়োজন। তবে তিনি কীভাবে এর এক্সপেরিমেন্ট করেছিলেন সেটাই বিস্ময়।

ওহিদুজ্জামান সাহেব আরও লিখেছেন, "মুতয়া বিবাহের বৈধতা কুরআনের অকাট্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত " [নুজুলুল আবরার, খ.২, পৃ.৩৩]আহলে হাদীস আলেম জনাব নুরুল হাসান খান লিখেছেন," মা, বোন, মেয়ে ও মাহরাম মহিলাদের গুপ্তাঙ্গ ছাড়া সমস্ত শরীর দেখা বৈধ"[আরফুল জাদী, পৃ.৫২]

ওহিদু্জ্জামান সাহেব লিখেছেন, মহিলার জন্য বয়স্ক পর-পুরুষকে নিজের স্তনের দুধ পান করানো জায়েজ। যদিও উক্ত পর-পুরুষ দাড়ি বিশিষ্ট হোক। এর দ্বারা তাদের একজনের জন্য আরেকজনকে দেখা বৈধ হয়ে যাবে। [নুজুলুল আবরার, খ.২, পৃ.৭৭]

নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান লিখেছেন, চারজন স্ত্রী রাখার কোন সীমাবদ্ধতা নেই। বরং যত ইচ্চা তত স্ত্রী রাখতে পারবে। [জফরুল আমানী, পৃ. ১২১]ওহিদুজ্জামান সাহেব লিখেছেন,"কেউ যদি তার মায়ের সাথে যিনা করে, যিনাকারী বালেগ বা নাবালেগ হোক, ছেলের পিতার জন্য তার মা হারাম হবে না "[নুজুলুল আবরার, খ.২, পৃ.২৮]

ওহিদুজ্জামান সাহেব আরও লিখেছেন, " কোন মহিলা যদি তিনজন লোকের সাথে সঙ্গম করে এবং এদের সঙ্গম থেকে বাচ্চা জন্ম নেয়, তাহলে উক্ত তিনজনের মাঝে লটারি করা হবে। যার নাম উঠবে বাচ্চা সে পাবে। যে বাচ্চা নিবে সে অপর দুইজনকে দুই তৃতীয়াংশ দিয়ত বা পণ দিয়ে দিবে "[নুজুলুল আবরার, খ.২, পৃ. ৭৫]

আহলে হাদীসদের বিখ্যাত আলেম আবুল হাসান মুহিউদ্দীন লেখেন,

"বীর্য পবিত্র। একটি ফতোয়া অনুযায়ী বীর্য খাওয়া বৈধ"

[ফিকহে মুহাম্মাদী , খ.১, পৃ .২৬]

আহলে হাদীসদের শাইখুল কুল ফিল কুল মিয়া নজীর হুসাইন দেহলবী তার ফতোওয়ার কিতাব ফতোয়াওয়ায়ে নজীরিয়াতে লিখেছেন ,"প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের মেয়ে , বোন বা পুত্রবধুকে দিয়ে নিজের রান মালিশ করাতে পারবে। এবং প্রয়োজনে নিজের পুরুষাঙ্গে হাত দেয়াতে পারবে "[ফতোওয়ায়ে নজীরিয়া , খ.৩, পৃ .১৭৬]

আরও অনেক বিষয় লেখার ছিল। কিন্তু অতিরিক্ত নোংরা হওয়ার কারণে সেগুলো উল্লেখ করা হল না। পরিশেষে একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই।

সৌদি আরব থেকে পবিত্র কুরআনের যে উর্দু অনুবাদ বিতরণ করা হয় , এটি অনুবাদ করেছেন আহলে হাদীস আলেম মুহাম্মাদ জোনাগড়ী। আব্দুল্লাহ রুপড়ী নামে আহলে হাদীসদের একজন খ্যাতনামা আলেম ছিলেন । তিনি মায়ারেফে কুরআনী বা কুরআনের তত্ত্বকথা নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন । সেখানে তিনি এত নোংরা কথার অবতারণা করেন , যেগুলো এখানে উল্লেখ করা সমীচীন নয় । আহলে হাদীসদের বিখ্যাত এই মুহাদ্দিস আব্দুল্লাহ রুপড়ীর এই লেখনী সম্পর্কে মুহাম্মাদ জোনাগড়ী সাহেব লিখেছেন , " روپڑی نے معارف قرآنی بیان کرتے ہوئے رنڈیوں اور بھڑووں کا ارمان پورا کیا "আব্দুল্লহ রুপড়ী কুরআনের তত্ত্বকথা লিখতে গিয়ে পতিতা ও ব্যভিচারীদের মনোবাসনা পূরণ করেছে। "[আখবারে মুহাম্মাদী , ১৫ই এপ্রিল , ১৯৩৯, পৃ .১৩]

আব্দুল্লাহ রুপড়ীর সমালোচনায় মুহাম্মাদ জোনাগড়ী যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন , তার শিরোনাম দিয়েছেন , ” عبداللہ روپڑی ، ایڈیٹر تنظیم کے معارف قرآنی ، اسے کوک شاستر کہیں یا لذت النساءیا ترغیب بدکاری؟

“"তানজীম পত্রিকার সম্পাদক আব্দুল্লাহ রুপড়ীর কুরআনের তত্ত্বকথাকে কামসূত্র বলব না কি লজ্জাতুন নেসা না কি যৌন উদ্দীপক চটি বলব ?

এই হল, আহলে হাদীসদের মুফাসসিরের ভাষা। যার অনুবাদ করা কুরআন শরীফ সৌদি থেকে ছাপা হয়। আশ্চর্যের বিষয় হল, স্বয়ং আহলে হাদীস আলেমরাই তাদের লেখনীকে কুক শাস্তর বা কামসূত্র বলে অভিহিত করছে, তাহলে অন্যরা কী করবে? এরা যেসব নোংরা কথা লিখেছে, তাতে একে কামসূত্র বললেও কম বলা হবে। আস্তাগফিরুল্লাহ। আল্লাহ হেফাজত করুন।

সৌদি আরবে পাঠ্যপুস্তক সংস্কার, সহীহ ইসলাম কোথা থেকে শিখব?
February 2, 2015 at 9:25 AM

কিছুদিন আগে সৌদি বাদশাহ আব্দুল্লাহ ইন্তেকাল করেছেন। তার মৃত্যুতে অনেকেই বিভিন্ন শোকগাথা রচনা করে সহমর্মিতা প্রকাশের চেষ্টা করেছেন। কেউ কেউ তাকে 'ইমাম', 'আমিরুল মু'মিনীন' উপাধি দেয়ার চেষ্টা করেছেন। অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে লিখেছেন, বিশ্বের একমাত্র তাউহীদবাদী রাষ্ট্রের মহামান্য ইমাম ইন্তেকাল করেছেন। বাদশাহ আব্দুল্লাহকে ইমাম, খলিফা বা আমিরুল মু'মিনীন বলল না কি আরও বড় কোন উপাধি দিল, সেটা নিয়ে আমাদের কোন মাথাব্যথা নেই। বাদশাহ আব্দু্ল্লাহ কত বড় (!) ইমাম ছিলেন সেটা প্রায় সব মুসলমানই জানে। তার অবস্থা লিখে পৃষ্ঠা ও সময় নষ্ট করার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। তবে একটা বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'বিশ্বের একমাত্র তাউহীদবাদী' রাষ্ট্র, তাউহীদের ঝান্ডাবাহী, সহীহ আকিদার প্রচারক একমাত্র দেশ সৌদি আরব। এই শব্দগুলো নিয়ে আমার ঘোরতর আপত্তি আছে। এই রাজতন্ত্রের বেতন-ভাতায় পরিচালিত কিছু প্রতিষ্ঠান ও তাদের পোষ্য কিছু শায়খ প্রায়ই এই শব্দগুলো ব্যবহার করে থাকেন। সহীহ আকিদা প্রচারে সৌদি আরবের ভূমিকা, তাউহীদের প্রচারে সৌদি আরবের অবদান ইত্যকার শিরোনামে তারা লেকচারও দিয়ে থাকেন। সৌদি আরব কতটা সহীহ আকিদা ও তাউহীদ প্রচার করে সেটা নিয়ে বিস্তারিত লেখার ইচ্ছা ছিল বহু আগে থেকেই। বাদশাহ আব্দুল্লাহর মৃত্যুতে বিষয়টির পুন:চর্চা হওয়ার কারণে এটা নিয়ে নতুন করে কিছু লেখার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কিন্তু সময়ের অভাবে হয়ে উঠছে না। আজও এ বিষয়ে খুব বেশি আগাতে পারব না। 'সহীহ ইসলাম কোথা থেকে শিখব' এটা আজকের আলোচনার শিরোনাম। সুতরাং মূল বিষয়ে যাওয়াটাই কর্তব্য। তবে যারা বক্তৃতা ও লেখনীতে সব-সময় প্রচার করে থাকেন, একমাত্র তাউহীদবাদী রাষ্ট্র সৌদি আরব, তাদের কাছে আমি কিছু প্রশ্ন রেখে যেতে চাই।

আশা করি বিষয়গুলো তারা স্পষ্ট করবেন।

১. সৌদি রাজতন্ত্র কি সম্পূর্ণ শরীয়া নির্ভর না কি এখানে মানব রচিত বিধানও চলে?

২. সৌদি রাজতন্ত্রের সকল (মানব রচিত) আইন কি সম্পূর্ণ কুরআন-সুন্নাহ অনুগামী? এখানে সুস্পষ্ট কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী একটা আইনও নেই?

৩. সৌদি আরবের ব্যাংকিং ব্যবস্থা সম্পূর্ণ সুদমুক্ত না কি সেখানেও সুদ অনুমোদিত?৪. ইসলামে 'ইমাম' বা খলিফার সমালোচনাকারীর জন্য কোন দন্ডবিধি আছে কি? সৌদি রাজা-বাদশার ভুল-ত্রুটি নিয়ে আলোচনাকারীর জন্য কোন দন্ডবিধি আছে কি?

৫. সৌদি আরব অত্যন্ত গর্বের সাথে প্রচার করে থাকে যে, সৌদি আরব জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য। সৌদি আরব যেহেতু জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য সুতরাং জাতিসংঘের মূলনীতি ও এজেন্ডাসমূহের সাথে অবশ্যই সহমত পোষণ করতে বাধ্য। আমাদের প্রশ্ন হল, জাতিসংঘ ও এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠানসমূহের সকল কর্ম-কান্ড কি কুরআন-সুন্নাহ অনুগামী? এখানে সুস্পষ্ট কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী বা কুফুরী একটি বক্তব্যও নেই? মানবাধিকার রক্ষার বিভিন্ন এজেন্ডায় সৌদি যে অনুমোদন দিয়েছে এর সবগুলিই কি শরীয়া নির্ভর? সৌদি সরকার জাতিসংঘের যেসকল এজেন্ডায় বর্তমানে চুক্তিবদ্ধ রয়েছে, সেগুলোর সব কি সহীহ আকিদা ভিত্তিক?

৬. মুসলমানদের গনহারে হত্যার জন্য কোটি কোটি ডলারের অনুদান প্রদানের কথা কুরআন-সুন্নাহ বা সহীহ আকিদার কোন কিতাবে আছে? যে কোন একটা আয়াত, হাদীস বা সহীহ আকিদার কোন ইমামের বক্তব্য হলেও চলবে।

৭. নাইন-ইলেভেনের পর থেকে অ্যামেরিকাসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো সৌদি আরবের পাঠ্যপুস্তক সংস্কারের উপর চাপ প্রয়োগ করে আসছে। সৌদি সরকার পাঠ্যপুস্তক সংস্কারের উপর চুক্তিবদ্ধ হয়েছে এবং মিডিয়াতে প্রচার করেছে যে, সৌদি আরবের পাঠ্যপুস্তক সংস্কার করা হয়েছে। প্রশ্ন হল, সৌদি আরবের আগের পাঠ্যপুস্তক কি কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক ছিল না? এগুলো সংস্কারের অর্থ কি? সহীহ ইসলাম শিখার জন্য যেহেতু একটি কারিকুলাম বা সিলেবাস প্রয়োজন, এজন্য সৌদি আরবের পাঠ্যপুস্তক সংস্কার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করাটা জরুরি মনে করছি।

উপর্যুক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর পাব বলে আশা রাখি। ওমুক কাফের, ওমুক বিদয়াতী এগুলোর নামই শুধু ইসলাম না, এর বাইরেও যে ইসলামের শত শত বিধান পদদলিত হচ্ছে সেগুলোও কিন্তু বিবেচ্য। সৌদি পোষ্য শায়খগণ সাধারণ মুসলামনদেরকে ওমুক বিদয়াতী, ওমুক কাফের এই কাজে ব্যস্ত রাখে। আসলে তাদেরকে নিয়োগই দেয়া রাজতন্ত্রের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করার জন্য। একজন বিখ্যাত আলেম লিখেছেন, কোটি ডলারের অস্ত্র বা সেনাবাহিনী যা করতে পারে না, সৌদি অর্থে পালিত এসকল শায়খগণ রাজতন্ত্রের জন্য এর চেয়ে বহুগুণ খেদমত করে থাকেন।
'ইসলামের' ধোয়া তুলে এসকল শায়খগণ সৌদি সরকারের অপকর্মগুলো বৈধতা প্রদান করে থাকেন।
এসকল শায়খদের অবদানে পরিস্থিতি এমন হয়েছে যে, সৌদি সরকারের কুফুরীর বিরুদ্ধে বললেও সেটা যেন ইসলামের বিরুদ্ধে বলা হয়। কারণ সৌদি হল সহীহ ইসলামের রক্ষক। নাউযুবিল্লাহ।

যাই হোক, এই আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। মূল প্রসঙ্গে আসা যাক। দীর্ঘ সময় থেকে সৌদি আরবে পাঠ্যপুস্তক সংস্কার হয়ে আসছে। অ্যামেরিকাসহ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো এই সংস্কার তদারকি করছে। আমাদের সামনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন হল, আমরা যারা সহীহ ইসলামের নামে সালাফী শায়খ বা সৌদির বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ইসলাম শিখছি, আমরা কি সংস্কার হওয়া মডারেট ইসলাম শিখছি না কি সহীহ ইসলাম শিখছি?প্রশ্নটি অধিক গুরুত্ববহ একারণে যে 'সহীহ ইসলামের' নামে সৌদি আরবের সংস্কার হওয়া এসব সিলেবাসকে আমাদের দেশেও প্রচলনের চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রসঙ্গক্রমে এধরনের একটি প্রচেষ্টা সম্পর্কেও সামান্য আলোচনা করছি। সৌদি সরকারের পোষ্য আলেমদের দ্বারা প্রভাবিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। ভূঁইফোড় এসব প্রতিষ্ঠান বা দায়ী সম্পর্কে আমরা অনেকেই বেখবর। এদেরকে নিয়ে মাথা-ঘামানোর খুব বেশি প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। তিন দিন আগে ও.আই.ই.পি এর সি.ই.ও নাসিল শাহরুখের একটি লেকচার এক ভাই আমাকে দিলেন। লেকচারের শিরোনাম ছিল, 'আপনার সন্তানকে আলেম বানাবেন কেন ও কিভাবে' । লেকচারটির বিষয়বস্তু খুবই স্পষ্ট। এটি মূলত: তাদের প্রতিষ্ঠিত নতুন স্কুলের একটি প্রচারণা। https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com %2Fwatch%3Fv%3DB-J7GJrErS4&h=OAQHIlfg8

যাই হোক, এই লেকচারের ১৮-২২ মিনিটে জনাব নাসিল শাহরুখ সাহেব যা বললেন তার সারমর্ম হল, "তার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী বাংলাদেশে এমন একটি প্রতিষ্ঠানও নেই যেখানে আপনার সন্তানকে আপনি দ্বীন শিখাতে পারবেন।" এজন্য তিনি নতুন কারিকুলামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন।

লেকচারটি শুনে স্কুলের কারিকুলাম সম্পর্কে জানার চেষ্টা করলাম। তাদের ওয়েবসাইটে তেমন কোন তথ্য পেলাম না। অবশেষে ফেসবুক সেলিব্রেটি শরীফ আবু হায়াত অপুর স্ট্যাটাস থেকে কিছুটা ধারণা পেলাম।
https://www.facebook.com/sharif.abu.hayat/posts/10154850235170024 স্কুলের কারিকুলাম সম্পর্কে শরীফ আবু হায়াত অপু লিখেছে, " ৩-৪ বছরে বাচ্চারা আরবি শিখে ফেলবে, আকিদা ফিকহের উপরে কিং সৌদ ভার্সিটির আরবি বই পড়বে, নিজ আগ্রহে হিফজ করবে, আরেকটু বড় হয়ে ক্লাসিকাল স্কলারদের বই পড়ে হাদিসের ব্যাখ্যা শিখবে -- চিন্তা করতেই আশায় বুকটা বিশাল হয়ে যায়।"

এই প্রতিষ্ঠানের নতুন এমনকি বৈশিষ্ঠ্য আছে, যেটা বাংলাদেশে অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে নেই? এই প্রশ্নের উত্তর খুজছিলাম। জনাব নাসিল শাহরুখ সাহেব তার লেকচারে প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যা বললেন তার সারমর্ম হল,

১. এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা দায়ী হবে। উদ্দেশ্যটি মহৎ। কিন্তু এটি অনন্য কোন বৈশিষ্ঠ্য নয়। বরং বাংলাদেশে যত কওমী মাদ্রাসা আছে, প্রত্যেকটা কওমী মাদ্রাসার উদ্দেশ্যও এটি। বাস্তবে দেশে-বিদেশে হাজার হাজার দায়ী এসব প্রতিষ্ঠান থেকেই বের হয়। সুতরাং এটি এমন কোন বৈশিষ্ঠ্য নয় যার কারণে নাসিল শাহরুখ সাহেবের প্রতিষ্ঠানেই যেতে হবে। শাহরুখ সাহেবের স্কুল বা তার কারিকুলাম নিয়ে আমরা কিছু বলতে চাই না। আমাদের মূল উদ্দেশ্য হল, তিনি যে দাবী করলেন, বাংলাদেশে তার সন্তান দেয়ার মত কোন দ্বীনি প্রতিষ্ঠান নেই, এই দাবীর বাস্তবতা যাচাই করা।

২. নাসিল শাহরুখ সাহেব আরবী ভাষার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। স্কুলটি অ্যারাবিক মিডিয়াম হবে। এটিও মহৎ উদ্যোগ। তবে এটি স্কুলের অনন্য কোন বৈশিষ্ট্য নয়। কারণ বাংলাদেশে ভাল আরবী জানা লোকের অভাব নেই। বাংলাদেশের কওমী মাদ্রাসাগুলো শুধু আরবী ভাষায় যোগ্য আলেম তৈরি করে না, আরবী সাহিত্যে গবেষক আলেমও তৈরি করেছে। বিশেষভাবে মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ সাহেব এর মাদ্রাসাতুল মদীনার সিলেবাসে যেসব প্রতিষ্ঠান

রয়েছে, সেগুলো অবশ্যই শাহরুখ সাহেবের এই স্কুল থেকে বহুগুণ উন্নত। বিশেষভাবে আরবী ভাষা শেখার জন্য। নাসিল শাহরুখ সাহেব আরবী শেখানোর জন্য যেসব শিক্ষক নিয়েছেন, আমার জানামতে দু'জন শিক্ষক, আব্দুল্লাহ ও মাহমুদ মাদানী নেসাবে পড়া-শোনা করেছে। সুতরাং ভাল আরবী শেখানো এই প্রতিষ্ঠানের অনন্য কোন বৈশিষ্ট্য নয়, যা বাংলাদেশের অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে নেই।

৩. এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা আকিদা, হাদীস ও ফিকহ শিখবে। কিন্তু এগুলো শেখানোর জন্য প্রতিষ্ঠান কোন কারিকুলাম ব্যবহার করবে? শরীফ আবু হায়াত অপুর স্ট্যাটাস থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে, "আকিদা ফিকহের উপরে কিং সৌদ ভার্সিটির আরবি বই পড়বে" । অর্থাৎ আকিদা, ফিকহ ও হাদীস শেখানোর জন্য কিং সৌদ ইউনিভার্সিটির কারিকুলাম ফলো করা হবে। এটি আমার কাছে নতুন মনে হয়েছে। বাংলাদেশে সম্ভবত অন্য কোন প্রতিষ্ঠান কিং সৌদ ভার্সিটির কারিকুলাম ফলো করে না। প্রতিষ্ঠানের অনন্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে এটি উল্লেখযোগ্য হতে পারে।যেহেতু এই প্রতিষ্ঠান থেকে পড়া-শোনা করলে কেউ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হতে পারবে না, একারণে নাসিল শাহরুখ সাহেবের প্রতিষ্ঠানের অনন্য বৈশিষ্ট্য হল, এখানে আকীদা ও ফিকহের ক্ষেত্রে কিং সৌদের সিলেবাস ফলো করা হবে। সারকথা এই দাড়াল যে, এই স্কুলটি একটি অনন্য সালাফী স্কুল হবে। এখানে যেহেতু কিং সৌদের সিলেবাস ফলো করা হবে, এজন্য কিং সৌদ বা সৌদি আরবের সিলেবাস সম্পর্কে দু'একটি কথা বলা আবশ্যক। শুধু নাসিল শাহরুখ বা তার প্রতিষ্ঠান নয়, আমাদের দেশে সালাফী মতবাদের প্রচারক শায়খগণ সাধারণ মানুষকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলে থাকেন যে, সহীহ ইসলামের চর্চা একমাত্র সৌদি আরবেই হয়ে থাকে। সৌদির স্কুল, ইউনিভার্সিটিগুলো হল বিশুদ্ধ ইসলাম শিক্ষার আদর্শ প্রতিষ্ঠান।

সৌদি বেতনভুক্ত শায়খগণ জোরালভাবে বিষয়টি সাধারণ মানুষের মনে বদ্ধমূল করার চেষ্টা করে থাকেন। যাই হোক, সৌদি আরবের পাঠ্যপুস্তক সংস্কার সম্পর্কে আমাদের সামান্য ধারণা নেয়া আবশ্যক ।

পাঠ্যপুস্তক সংস্কারের পটভূমি:

মানবাধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা, নারী অধিকার, সন্ত্রাস, বাক-স্বাধীনতা এই বিষয়গুলোকে পুঁজি করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা গড়ে উঠেছে। আন্তর্জাতিক অনেক রেজুলেশনের

মাধ্যমে এসব এজেন্ডা বিশ্বব্যাপী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ সকল এজেন্ডার সারমর্ম হল , নাস্তিকতা , অবাধ যৌন-স্বাধীনতা , ধর্মহীনতা ও ইসলামকে অবমাননার লাগামহীন সুযোগ প্রদান। জাতিসংঘের UDHR (Universal Declaration of Human Rights), USCIRF (United States Commission on International Religious Freedom)অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালসহ যত মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান রয়েছে , এসবগুলিই উপর্যুক্ত এজেন্ডা বাস্তবায়নে নিবেদিত। almoslim.net এ জামাল আরাফা একটি আরটিকেল লিখেছিলেন।

আরকিটেলেকের শিরোনাম ছিল , تقرير "الحريات الدينية" الأمريكي.. أين التقرير الإسلامي ؟! মূল উপপাদ্য ছিল , স্বাধীনতার শ্লোগানে আজ ধর্মহীনতাকে লালন করার আহব্বান করা হচ্ছে , ইসলাম ধর্ম পালনের স্বাধীনতা থাকল কোথায় ?USCIRF আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন দেশে তথাকথিত ধর্মীয় স্বাধীনতা পর্যবেক্ষণ করে থাকে। এসব পর্যবেক্ষণের বাৎসরিক রিপোর্ট প্রকাশ করে। এই প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে তাদের অ্যানুয়াল রিপোর্ট প্রকাশিত হয় । সৌদি আরবে ধর্মীয় স্বাধীনতার উপর এই প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে থাকে। সৌদি আরব সম্পর্কে তাদের বাৎসরিক রিপোর্টগুলো নিচের লিংকে পাবেন । http://www.uscirf.gov/countries/saudi-arabia#annual-reports

২০০৯ ও ২০১০ সালের বাৎসরিক রিপোর্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

http://www.uscirf.gov/sites/default/files/resources/final%20ar2009%20with%20cover.pdf

এখানে সৌদি আরবের পাঠ্যপুস্তক সংস্কার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

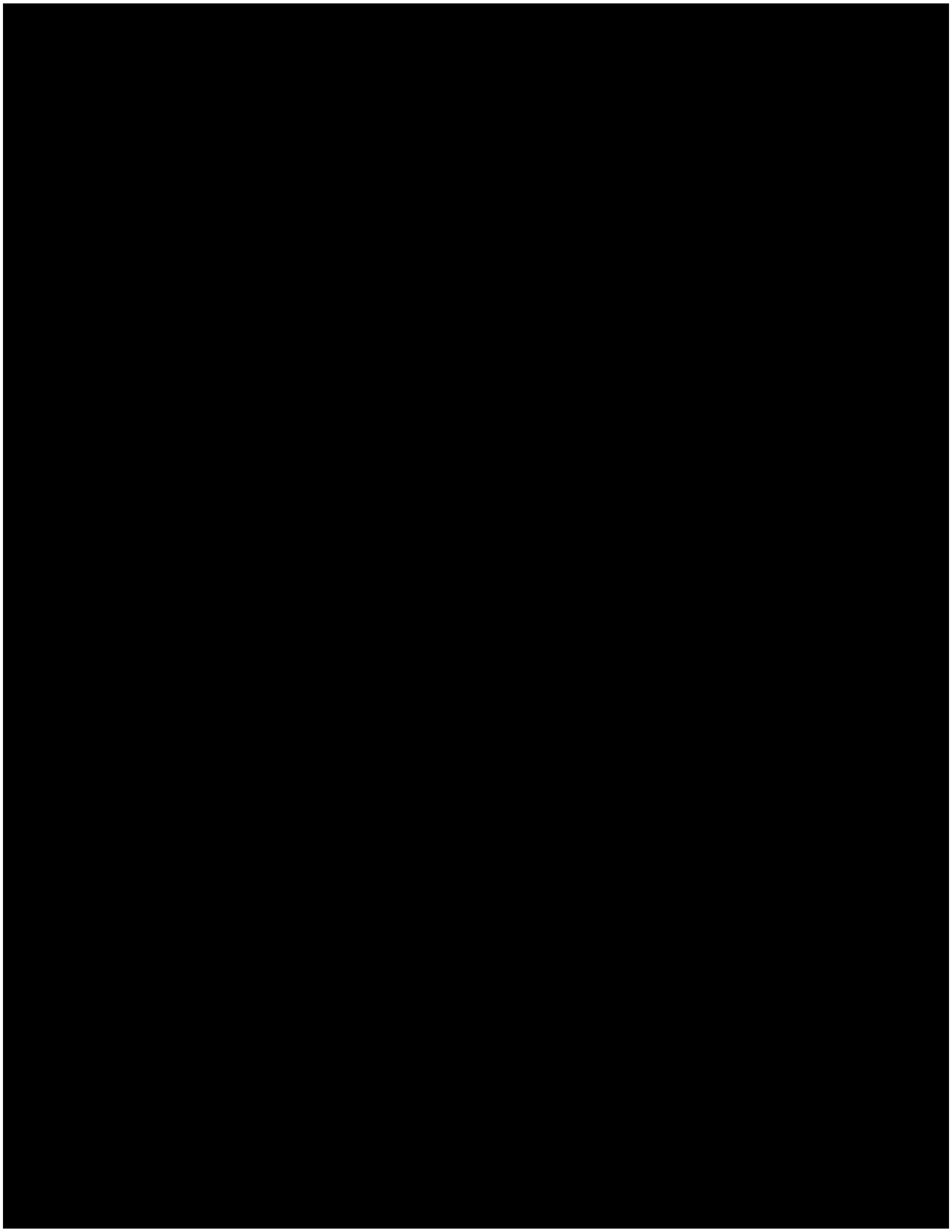

আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো কী ধরনের সংস্কার চায় ?

২০০৬ সালে দি ওয়াশিংটন পোস্টে নিনা শিয়া সৌদি আরবের পাঠ্যপুস্তক সংস্কার সম্পর্কে একটি আর্টিকেল প্রকাশ করেন। এই আর্টিকেলটি ঠান্ডা মাথায় পড়লে খুব সহজেই বুঝতে পারবেন , আন্তর্জাতিক সংস্থা কী ধরনের ধর্মহীন , কুফুরী সংস্কার চায়।

আর্টিকেলের লিংক ,http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/05/19/AR2006051901769.html

সংস্কারবাদীদের প্রথম দাবী হল কোন অমুসলিমকে অবিশ্বাসী বা কাফের বলা যাবে না। ইসলাম একমাত্র সত্য ধর্ম এটি পাঠ্যপুস্তকে রাখা যাবে না। এগুলো হল ইনটোলারেন্ট ও হেট্রিড বক্তব্য। আন্তর্জাতিক সংস্থা মূলত : এগুলোরই সংস্কার চায়।

নিনা শিয়া তার আলোচনা শুরু করেছে এভাবে ,Saudi Arabia's public schools have long been cited for demonizing the West as well as Christians, Jews and other "unbelievers." But after the attacks of Sept. 11, 2001 -- in which 15 of the 19 hijackers were Saudis -- that was all supposed to change.

ইহুদী , খ্রিষ্টান ও মুশরিকদেরকে 'অবিশ্বাসী ' বলাটাও না কি ইনটোলারেন্স ! আর আমাদের সহীহ ইসলামের ধ্বজাধারী তাউহীদবাদী রাষ্ট্র তাদের চাহিদা অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছেন। এমনকি ৭৪ পৃষ্ঠাব্যাপী এজাতীয় সংস্কারের নমুনা প্রভুদের নিকট পেশ করেছে। নিনা শিয়ার আর্টিকেলে সৌদি পাঠ্যপুস্তকে ইনটোলারেন্ট বক্তব্যের কিছু নমুনা দেয়া হয়েছে। যেগুলোর সংস্কার তারা চায় ,The passages below -- drawn from the same set of Saudi texts proudly cited in the new 74-page review of curriculum reform now being distributed by the Saudi Embassy -- are shaping the views of the next generation of Saudis and Muslims worldwide. Unchanged, they will only harden and deepen hatred, intolerance and violence toward other faiths and cultures. Is this what Riyadh calls reform?

FIRST GRADE

" Every religion other than Islam is false.""Fill in the blanks with the appropriate words (Islam, hellfire): Every religion other than ______________ is false. Whoever dies outside of Islam enters ____________."

ইসলামকে একমাত্র সত্য ধর্ম বিশ্বাস করাটাও একজন মুসলিমের অপরাধ। পাঠ্যপুস্তকে এটি থাকলে সংস্কার করা আবশ্যক। আসুন দেখা যাক, এধরনের সংস্কারের ক্ষেত্রে আমাদের তাউহীদবাদী রাষ্ট্রের ভূমিকা কী?

পাঠ্যপুস্তক সংস্কারে সৌদি সরকারের ভূমিকা:২০০১ সাল থেকেই সৌদি সরকার অ্যামেরিকাকে পাঠ্যপুস্তক সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এবং সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও বাদশাহ আব্দুল্লাহর বক্তব্য অনুযায়ী তারা নাইন ইলেভেনের পর থেকেই পাঠ্যপুস্তক সংস্কারের কাজ শুরু করেছে। কিছু কর্মকর্তার দাবী অনুযায়ী সৌদি পাঠ্যপুস্তকের প্রায় শতকরা ৫ ভাগ সংস্কার করা হয়েছে। অন্যদের দাবী অনুযায়ী, ৬৬ টি পাঠ্যপুস্তকের প্রায় ৩৬ টি রিভিশন দেয়া হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, সৌদি সরকার ৩১ টি বিতর্কিত বিষয় পাঠ্যপুস্তক থেকে সরিয়ে নিয়েছে। বিস্তারিত দেখুন,https://freedomhouse.org/sites/default/files/CurriculumOfIntolerance.pdf

সংস্কারের ফলাফল:

সংস্কারের নামে ধর্মহীন, কুফুরী আকিদা বিশ্বাস লালনের যেই প্রচেষ্টা সৌদি আরবে চলছে তার ফলাফল ভয়ঙ্কর। এই ধর্মহীন, কুফুরী সংস্কারের অংশ হিসেবে সহমর্মিতা ও আধুনিকতার নামে ২০০৮ সালে ৪০ হাজার লোককে সৌদি সরকার ট্রেনিং দিয়েছে। এর মাঝে ইমাম, খতিব, প্রফেসর, ডাক্তারসহ উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তা রয়েছে। usirf এর ২০০৯ সালের অ্যানুয়াল রিপোর্ট দেখুন,

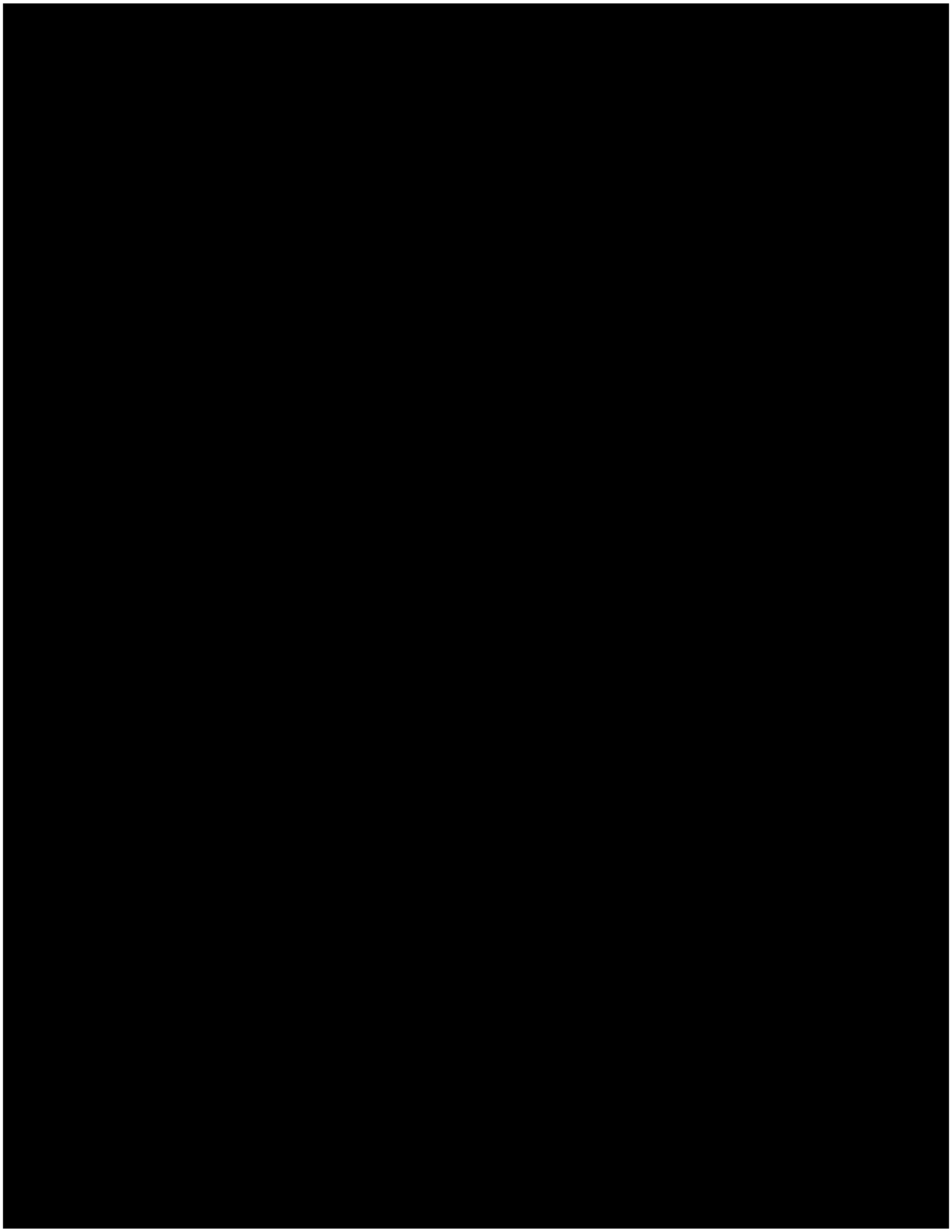

এরপরেও কি আমরা নাসিল শাহরুখের মত গর্ব করে বলতে পারি, এদেশে সহীহ ইসলাম শেখার মত কোন প্রতিষ্ঠান নেই, এজন্য আমাদেরকে কিং সৌদের কারিকুলাম প্রয়োজন?

এ মুর্খতার শেষ কোথায়?
7 February 2015 at 05:15

গত ২২ জানুয়ারি আমি বাধ্য হয়ে "আহলে হাদীসদের যৌন-সমাচার" নামে একটি নোট লিখেছিলাম। যদিও এটি লিখতে গিয়ে বারবার হোচট খেয়েছি। মালিকের দরবারে এধরনের নোংরা কথা থেকে আশ্রয় চেয়েছি বার বার। হক্বপন্থী উলামায়ে কেরামের উপর অন্যায় অভিযোগের জবাব হিসেবে বাধ্য হয়ে লিখেছিলাম। আজ ফেব্রুয়ারির ছয় তারিখে এসে জনৈক আহলে হাদীস ভাই আমাকে বললেন, তিনি দেওবন্দী উলামায়ে কেরামের পর্ণগ্রাফি প্রকাশ করবেন। আমার পোস্টে অপ্রাসঙ্গিক কমেন্ট করার কারণে বারবার ডিলেট করার পরও তিনি নির্লজ্জভাবে কমেন্ট করে যাচ্ছিলেন। যাই হোক, দীর্ঘ তের চৌদ্দ দিনে তিনি একটি বারও আমার প্রাসঙ্গিক লেখায় কমেন্ট করেননি এবং উক্ত লেখার কোন জওয়াব দেননি। কোন আহলে হাদীসই তাদের যৌন সমাচার সম্পর্কে কোন জবাব দেয়নি। আজ আনিসুর রহমান সম্মান বাচাতে দায়সারা গোছের একটি উত্তর লিখেছে। একে উত্তর বললে ভুল হবে। আনিসুর রহমানের মহা মূর্খতা বৈ কিছুই নয়। আনিসুর রহমানের পোস্টের লিংক,https://www.facebook.com/permalink.php? story_fbid=637596646368358&id=100003540851590

১. প্রথমত: আনিসুর রহমান গংরা রহস্যজনকভাবে দাবী করছেন, ওহীদুজ্জামান হাইদ্রাবাদী তাদের কেউ নয়। অথচ ওহীদুজ্জামান গুণকীর্তণ করে মনীষী চরিত শিরোনামে "মাসিক আত-তাহরিক " পত্রিকায় ২০১১ সালে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এরা যে কত বড় ধোকাবাজ এদের এধরনের আচরণ থেকে বোঝা যায়। ওহীদুজ্জামান সম্পর্কে মাসিক আত-তাহরিক পত্রিকা কী লিখেছে, সে সম্পর্কে এরা একেবারেই অন্ধ । কোনভাবেই চোখ খুলতে নারাজ। আমরা ছোট্র প্রশ্ন করতে চাই, সাধারণ মানুষের বিবেক নিয়ে কে খেলা করছে? মাসিক আত-তাহরিক পত্রিকা না কি আপনারা?অবশ্য আশার কথা হল, আনিসুর রহমান সাহেব স্বীকার করেছেন যে, আহলে হাদীসদের প্রথম শ্রেণির আলেমদের যৌন-জাগরণী ফতোয়াগুলো কুরআন হাদীস বিরোধী। আনিসুর রহমান লিখেছে,

"আমরা কোনো আলেমের তাকলীদ করিনা, বরং আলেমের বক্তব্যকে কুরআন ও সহীহ হাদিস দিয়ে যাচাই করি। যদি সঠিক হয় তাহলে মেনে নেই আর যদি কুরআন ও হাদিস বিরোধী ফতওয়া হয় তাহলে সেই ফতওয়ার স্থান ডাস্টবিন"

আমরাও আপনার সাথে একমত। আপনি আপনাদের আলেমের ফতোয়া ডাস্টবিনে ফেলুন। অসুবিধা নেই। কিন্তু কথা হল, যারা এসব আলেমের প্রশংসায় উচ্চকিত, তাদের সম্পর্কে কী বলবেন? এসব আলেমদের ব্যাপারে আপনাদের আকিদা কী? ওহীদুজ্জামান হাইদ্রাবাদী, নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান ভুপালী, নুরুল হাসান খান, আব্দুল্লাহ জোনাগড়ী, এরা কি কাফের, ফাসেক, বিদয়াতী না গোমরাহ? আপনাদের কাছ থেকে স্পষ্ট হুকুম চাই। এরা কুরআন হাদীস বিরোধী ফতোয়া দেয়ার কারণে উপরের কোনটি হয়েছে? আপনারা যে হুকুমই লাগাবেন, তার উপর ভিত্তি করে জিজ্ঞাসা করছি, এধরনের লোকদেরকে যারা প্রশংসা করে বা তাদের কিতাব পড়ার জন্য নসীহত করে তাদেরকে সম্পর্কে আপনাদের বক্তব্য কী?

আহলে হাদীসদের প্রথম শ্রেণির আলেমদের ফতোয়া ডাস্টবিনে ফেলতে চেয়ে আনিসুর রহমান সাহেব পরোক্ষভাবে একটি বিষয় স্বীকার করলেন, তাকলিদ মুক্ত হয়ে তাদের যেসব আলেম সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ অনুসরণ করতে গিয়েছে, তারা এধরনের ডাস্টবিনে নিক্ষেপযোগ্য ফতোয়া দিয়েছে। আমি এখানে শুধু যৌন বিষয়ে তাদের কিছু বক্তব্য এনেছি, অন্যান্য বিষয়ের বক্তব্য আনলেও আনিসুর রহমান গংরা একইভাবে নাক সিটকাবে। এর দ্বারা হুসাইন বাটালভীর বক্তব্যের সত্যতা আরেকবার প্রমাণিত হল। অথচ যেই ধৃষ্টতার সাথে তারা ইমামগণ ও তাদের মাজহাবের বিরোধীতা করে, তাদের তো বুক ফুলিয়ে বলা উচিৎ, আমাদের প্রত্যেকটি বক্তব্য কুরআন ও হাদীস থেকে গৃহীত। আমাদের আলেমদের পৃথক কোন ফতোয়া নেই, কুরআন-হাদীসই তাদের ফতোয়া। অথচ আজ সেই ধৃষ্টতাকে জলাঞ্জলি দিয়ে বলছে, আমাদের আলেমদের ফতোয়া কুরআন ও হাদীসের সাথে মিলিয়ে দেখব। এখন মেলানোর প্রয়োজন কেন? আপনাদের সকল বক্তব্যই তো কুরআন হাদীস ভিত্তিক? সিদ্দিক হাসান মাজহাব কেন ছেড়েছিল? ওহীদুজ্জামান মাজহাব ছেড়েছিল কেন? আপনারাই তো শ্লোগান দেন, আহলে হাদীস কে এক উসুল, কালাল্লাহ ও কালার রাসূল (আহলে হাদীসদের একটিই মূলনীতি, আল্লাহ ও তার রাসূলের কথা)? এসব শ্লোগান আজ কোথায়? এসব যৌন ফতোয়া আল্লাহ ও তার রাসূলের কোন কথায় আছে?

হুসাইন বাটলভীর বক্তব্য আরেকবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি,

"মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন বাটালভী সাহেব যিনি আহলে হাদীসদের অন্যতম প্রসিদ্ধ আলেম । তিনি বলেন, পঁচিশ বৎসরের অভিজ্ঞতায় এ কথা বুঝে এসেছে, যারা দ্বীনী জ্ঞান ব্যতিরেকে কামিল গবেষক হয়ে যায় এবং সম্পূর্ণ তাকলিদ ছেড়ে দেয় তারা শেষ পর্যন্ত ইসলামকেই প্রত্যাখ্যান করে বসে । কুফরী, মুরতাদ এবং ফাসিক হওয়ার যদিও অনেক কারণই পৃথিবীতে বর্তমান । কিন্তু ধার্মিক লোকদের অধার্মিক হয়ে যাওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ হলো পর্যাপ্ত পরিমাণ ধর্মীয় বিদ্যা ছাড়া তাকলিদ ছেড়ে দেওয়া । আহলে হাদীসদের মধ্যে যারা ধর্মজ্ঞান রাখে না বা যৎ সামান্য জ্ঞান রাখে এবং নিজেদের লা মাযহাবী বলে দাবী করে, তারা যেন উক্ত পরিণতির ভয় করে । উক্ত দলের সর্বসাধারণ স্বাধীন এবং সেচ্ছাচারী হয়ে যাচ্ছে ।(রিসালা ইশাআতুস-সুন্নাহ, সংখ্যা নং ২,খন্ড নং ১১, ১৯৮৮ ইংরেজী)"

আল্লাহর কী মহান বিচার। যারা কথায় কথায় ইমামদের ফতোয়া ডাস্টবিনে ফেলতে চাইত, আজ তাদের অনুসারীরা তাদের ফতোয়া ডাস্টবিনে ফেলছে। মহান আল্লাহ মহা ন্যায়-পরায়ণ। এভাবেই তিনি প্রত্যেককে তার কর্মের ফল দিয়ে থাকেন। আশ্চর্যের বিষয় হল, আনিসুর রহমান যাতের ফতোয়াকে ডাস্টবিনে ফেলতে চাইছে, তারা এগুলো তাদের নিজস্ব ফতোয়া হিসেবে লেখেনি। বরং এগুলো স্বয়ং রাসূল স. এর ফতোয়া হিসেবে লিখেছে। প্রমাণস্বরুপ এদের কিতাবের নাম দেখুন। ওহীদুজ্জামান হাইদ্রাবাদীর কিতাবের নাম " হাদইয়াতুল মাহদী" অর্থাৎ রাসূল স. এর হাদিয়া। সিদ্দিক হাসান খানের কিতাবের নাম, নুজুলুল আবরার মিন ফিকহিন নাবিয়্যিল মুখতার (নির্বাচিত নবীজীর ফেকাহ থেকে নেককারদের মেহমানদারি)। অর্থাৎ সিদ্দিক হাসান খান একিতাবে যা লিখেছেন, সব নবীজীর ফেকাহ। একইভাবে আরফুল জাদীর ক্ষেত্রেও রাসূল স. এর হেদায়াত ও ফেকাহ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ কিতাবের নাম থেকেই এসকল আহলে হাদীস আলেমরা স্পষ্ট করে দিয়েছেন, তারা হানাফী, শাফেয়ী বা মালেকী ফেকাহ সংকলন করছেন না, তারা সরাসরি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ স. এর ফেকাহ সংকলন করছেন। আনিসুর রহমান সাহেবদের নিকট জিজ্ঞাসা করতে চাই, কোন সাহসে আপনারা রাসুলুল্লাহ স. এর ফেকাহকে ডাস্টবিনে ফেলতে চান? আপনাদের বরেণ্য আলেমরা দাবী করছেন, এগুলো রাসুল স. এর ফেকাহ, সুতরাং তাদের কিতাবের ফেকাহব ডাস্টবিনে ফেলার অর্থ রাসুল স. এর ফেকাহকে ডাস্টবিনে ফেলা। নাউযুবিল্লাহ। রাসূল স. এর ফেকাহের নাম দিয়ে যারা এধরনের কুরুচিপূর্ণ শরীয়ত বিরোধী যৌন করেছে, তারাই তো রাসূল স. এর হাদীসের সংরক্ষক? আপনারা কী বলেন? যাদের মুখে রাসূল স. এর হাদীস অনুসরণের তুবড়ি ছোটে, তারাই আবার সেই পুত-পবিত্র নবীর দিকে এধরনের জঘন্য কথা সম্পৃক্ত করে? নাউযুবিল্লাহ। আল্লাহ হেফাজত করুন।

আহলে হাদীসদের কোন চুনোপুটি যদি ওহীদুজ্জামানকে না চেনে, কিংবা নওয়াব সিদ্দিক হাসান খানকে না চেনার ভান করে, তাতে আমরা একটুও বিস্মিত হই না। কারণ আল্লামা আমীন সফদর রহ. বহু আগেই এদের এসব স্বভাবের কথা বলে গেছেন। আর কোথাকার কোন আনিসুরের চেনা-না চেনার উপর এদের পরিচয় নির্ভর করে না। মাসিক আত-তাহরীক ঠিকই তাদেরকে চেনে, শায়খ আলবানী তাদেরকে চেনে, শায়খ আলবানী যার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন, শায়খ রশিদ রেজা এদেরকে চেনে। আনিসুর রহমান এসব বিখ্যাত আহলে হাদীস আলেমকে না চেনার ভান করেছেন। এজন্য আজকের আলোচনায় বিস্তারিতভাবে এদের পরিচয় করিয়ে দিব ইনশাআল্লাহ।

আহলে হাদীস আলেম নওয়াব সিদ্দিক হাসান খানের পরিচয়:উপমহাদেশে আহলে হাদিস আলেম হিসেবে সবচেয়ে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান ভুপালী। তিনি আহলে হাদীস আলেমদের মাঝে সর্বাধিক গ্রন্থপ্রণেতা। যদিও এসব গ্রন্থের অধিকাংশই অন্যের কিতাব থেকে কপি-পেস্ট করা, এরপরেও তিনি আহলে হাদীস আলেম হিসেবে সর্বাধিক প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন। আনিসুর রহমান গংরা তাকে না চিনলেও এদের শায়খরা নওয়াব সিদ্দিক হাসান খানকে কতটা মূল্যায়ন করে তার কিছু নমুনা নীচে উল্লেখ করছি। " কিতাবগুলোতে সিদ্দিক হাসান খান নিজের লিখিত ১১ টি কিতাবে নিজের জীবনী লিখেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, ১. আবজাদুল উলুম। ২. আত-তাজুল মুকাল্লাল। ৩. আল-হিত্তা ফি যিকরির সিহাহ সিত্তা। এছাড়াও নওয়াব সিদ্দিক হাসান খানের পুত্র আলী হাসান মায়াসেরে সিদ্দিকী নামে পৃথকভাবে তার জীবনী রচনা করেছে। তার অপর পুত্র নুরুল হাসান খানও তার জীবনী লিখেছে।

বিখ্যাত সালাফী আলেম সুলাইমান ইবনে সাহমান তার উপর কিতাব লিখেছেন। বিভিন্ন উলামায়ে কেরামের অভিমত ও বক্তব্য সংকলন করে মাতবাউল জাওয়াইব থেকে একটি কিতাব প্রকাশিত হয়েছে, قرة الأعيان ومسرة الأذهان في مآثر النواب السيد صديق حسن خان

নওয়াব সিদ্দিক হাসান খানের উপর থিসিস:সৌদি আরবের বিভিন্ন ভার্সিটি থেকে নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান ভুপালীর উপর থিসিস করে অনেকে মাস্টার্স ডিগ্রি নিয়েছেন।

১. ড. আলী আল-আহমাদ। তার থিসিসের নাম, دعوة الأمير العالم صديق حسن خان واحتسابه

২. ড. মুহাম্মাদ আখতার খান নওয়াব সিদ্দিক হাসান খানের আকিদা বিশ্লেষণ করে বৃহৎ
কলেবরের দু 'খন্ডের থিসিস লিখেছেন । তার থিসিসের নাম , السيد صديق حسن القنوجي آراؤه الاعتقادية وموقفه من عقيدة السلف।

৩.ড. রজিয়া হামেদ পৃথকভাবে সিদ্দিক হাসান খানের জীবনী রচনা করেছেন।

৪.ড. মুহিউদ্দীন আল -আলওয়াই মদীনা ইউনিভার্সিটি থেকে প্রকাশিত পত্রিকায় তার জীবনী আলোচনা করেছেন। (সংখ্যা , ৪৭-৪৮)৫.শায়খ আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ "মুহাম্মাদ বিন সউদ ইউনিভার্সিটি " থেকে তাফসীর বিষয়ে সিদ্দিক হাসান খানের অবস্থান সম্পর্কে মাস্টার্সের থিসিস করেন । তার থিসিসের নাম , منهج صديق حسن خان في التفسير،

নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান সম্পর্কে সালাফী শায়খদের প্রশংসাবাণী :

১. সালাফীদের অনুসরণীয় শায়খ নাসীরুদ্দীন আলবানী দীর্ঘ দিন যাবৎ সিদ্দিক হাসান খানের আর-রওজাতুন নাদিয়্যা কিতাবটি ছাত্রদেরকে পড়িয়েছেন। এবং তিনি তার কিতাব পড়ার নসীহত করেছেন।

[বিস্তারিত , http://www.at-tahreek.com/tawheederdak/sep-oct2010/8.html]

শায়খ আলবানী তার অনেক কিতাবে নওয়াব সিদ্দিক হাসান খানকে "আল্লামা ", মুহাক্কিক (গবেষক) উপাধি দিয়েছেন। বিশেষভাবে , তার সিফাতুস সালাহ (পৃ .১৭৬) ও কিতাবু সালাতিত ত্বারাবীহ (পৃ .৮৪)

২. সালাফীদের অনুসরণীয় বিখ্যাত আলেম হলেন মুহাম্মাদ রশীদ রেজা। এই শায়খের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে শায়খ আলবানী হাদীস শাস্ত্র চর্চায় উদ্বুদ্ধ হন । শায়খ রশীদ রেজা সিদ্দিক হাসান খান সম্পর্কে বলেন , وناهيك بسلفها الصالح السيد صديق حسن خان صاحب المصنفات الشهيرة التي هي من دعائم إحياء العلم والدين، رحمه الله تعالى.অর্থাৎ তাকে 'সালাফে সালেহ ' ও ইলম দ্বীনের পুন :জাগরণী মহান পুরুষ আখ্যায়িত করেছেন । (মাজাল্লাতুল মানার , ১৪/৪৭১) অন্য জায়গায় তিনি সিদ্দিক হাসান খানকে 'মহান সংস্কারক ' উপাধি দিয়েছেন ।

৩. আহলে হাদীসদের অপর আলেম শামসুল হক আজিমাবাদী তের শ হিজরীতে তিনজনকে মুজাদ্দিদ হিসেবে উল্লেখ করেছেন । একজন হলেন, ১. মিয়া নজীর হুসাইন দেহলবী। ২ . হুসাইন আল-আনসারী। ৩. নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান ভুপালী। নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান সম্পর্কে আজীমাবাদী আউনুল মা'বুদে লিখেছে , والعلامة الأجل، المحدِّث الفاضل الأكمل، جامع العلوم الغزيرة، ذو التصانيف الكثيرة، النواب صديق الحسن خان البوفالي القنوجي [আউনুল মা'বুদ , খ.১১, পৃ .৩৯৬]

৪. মাসিক আত-তাহরীক পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান ভুপালীর জীবন ও কর্ম , তার বক্তব্যের উদ্ধৃতি আলোচনা করা হয়েছে। আত -তাহরীক পত্রিকার সার্চ অপশনে গিয়ে 'হাসান খান ' লিখে সার্চ দিলেই বিস্তারিত পেয়ে যাবেন। http://www.at-tahreek.com/search.html মাসিক আত-তাহরিকে নওয়াব সিদ্দিক হাসান খানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়া হয়েছে এভাবে ,"নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভারতীয় উপমহাদেশের বহু গ্রন্থ প্রণেতা আলেম ছিলেন। তিনি আরবী , ফার্সী ও উর্দূ তিন ভাষাতেই লিখেছেন। তাফসীর , হাদীছ , ফিকহ, ইতিহাস , আক্বাইদ , কবিতা ও কাব্যচর্চা , সাহিত্য , নৈতিকতা , তাছাওউফ প্রভৃতি বিষয়ে তিনি বিভিন্ন শিরোনামে ৩২৩টি গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেছেন।

"[বিস্তারিত , http://www.at-tahreek.com/june2014/article0201.html]

মোটকথা, আহলে হাদীস ও সালাফীদের প্রথম শ্রেণির আলেমদের নিকট নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান ছিলেন তের শতকের সংস্কারক বা মুজাদ্দিদ। এতকিছু লেখার উদ্দেশ্য হল , আগের মত যেন

কোন চুনোপুটি এই দাবী না করতে পারে যে, সিদ্দিক হাসান খান কে আমরা চিনি না অথবা সিদ্দিক হাসান খানের সাথে আহলে হাদীসদের কোন সম্পর্ক নেই। এরপরেও যদি কোন চুনোপুটি এধরনের দাবী করার চেষ্টা করে, তাহলে তাদেরকে বাংলার প্রবাদ শুনিয়ে প্রবোধ দিবেন বলে আশা রাখি। হাতি ঘোড়া গেল তলভেড়াঁ বলে কত জল

আনিসুর রহমান তার পোস্টে লিখেছে, (("দেওবন্দী আকাবীরদের যাদেরকে তারা মাথার তাজ মনে করে আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকদের কাছে যারা বড় (!) আলেম বলে স্বীকৃত তাদের এমন কিছু ফতওয়া আছে যা পর্ণগ্রাফিকে হার মানাবে। এগুলো বই পড়লে মানুষের চটি বই পড়ার দরকার নেই।আপনারা হয়তো জানেন নাস্তিক ও ইসলাম বিদ্বেষীরা কুরআন অবমাননা করে। আর আমরাও সোচ্চার হয়ে উচ্চকণ্ঠে সাধ্যমতো প্রতিবাদ জানাই। আপনারা অবাক হবেন আল্লাহর যমিনে কোনো নাস্তিকরা কুরআনের এরকম অবমাননা করেছে কিনা আমার জানা নেই, যতটা করেছে দেওবন্দীরা।"

শেষে মন্তব্য লিখেছে,হে আমার সম্মানিত ভাইয়েরা! একটু চোখ বন্ধ করে চিন্তা করে দেখুন তো মহান আল্লাহর বানী, কুরআনের আয়াতের সাথে এরকম অবমাননা কোনো নাস্তিকেরা করেছে কিনা?মাযহাবী ভাইদের বাড়াবাড়ির কারনে আমরা এগুলো উল্লেখ করতে বাধ্য হলাম, নতুবা আমাদের রুচি হয়না এরকম কিছু উল্লেখ করতে। আমরা এখানে নমুনা হিসাবে মাত্র কয়েকটি উল্লেখ করলাম, এরকম আরও অসংখ্য কুরআনের সাথে ধৃষ্টতা দেখানো হয়েছে। বিস্তারিত পরবর্তীতে দেয়া হবে ইন শা আল্লাহ।))

আনিসুর রহমান সাহেবের সদয় অবগতির জন্য অত্যন্ত বিনয়ের সাথে জানাচ্ছি, "আল্লাহর যমিনে কোনো নাস্তিকরা কুরআনের এরকম অবমাননা করেছে কিনা আমার জানা নেই, তবে তের শতকে আহলে হাদীসদের মহান মুজাদ্দিদ, সংস্কারক ও ইমাম নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান ভুপালী তার কিতাবে এগুলো লিখে তাদের চেয়ে বেশি কুরআন অবমাননা করেছেন। "

আনিসুর রহমান সাহেব যেহেতু একজন স্বঘোষিত আহলে হাদীস ও তাদেরই মহান মুজাদ্দিদ এগুলো তার কিতাবে লিখেছেন, সুতরাং আনিসুর রহমানের বক্তব্য যেমনটি হওয়ার কথা ছিল,

" আহলে হাদীস আকাবীরদের যাদেরকে তারা মাথার তাজ মনে করে আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকদের কাছে যারা বড় (!) আলেম বলে স্বীকৃত তাদের এমন কিছু ফতওয়া আছে যা পর্ণগ্রাফিকে হার মানাবে। এগুলো বই পড়লে মানুষের চটি বই পড়ার দরকার নেই।আপনারা হয়তো জানেন নাস্তিক ও ইসলাম বিদ্বেষীরা কুরআন অবমাননা করে। আর আমরাও সোচ্চার হয়ে উচ্চকণ্ঠে সাধ্যমতো প্রতিবাদ জানাই। আপনারা অবাক হবেন আল্লাহর যমিনে কোনো নাস্তিকরা কুরআনের এরকম অবমাননা করেছে কিনা আমার জানা নেই, যতটা করেছে আহলে হাদীসরা।"

আফসোস সেসব আহলে হাদীসদের উপর, যারা নিজেদের মুজাদ্দিদ সম্পর্কে জানে না। নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান ভুপালির একটি বিখ্যাত কিতাব হল, "আদ-দা ওয়াদ দাওয়াউ" । কিতাবটির স্ত্রিনশট:

কিতাবের ডাউনলোড লিংক:http://ia902205.us.archive.org/16/items/KitabuTaweezat-AdaaWadDawa/KitabuTaweezat.pdf

আনিসুর রহমান কুরআন অবমাননার কারণ হিসেবে যেসব উক্তি উল্লেখ করেছে, সেগুলো এই মহান মুজাদ্দিদের কিতাবের কোথায় আছে দেখে নেয়া যাক।

১. মহিলার বাম রানে কুরআনের আয়াত বাধার পরামর্শ।[আদ-দা ওয়াদ দাওয়াউ, পৃ. ১২৫]

২. স্বপ্নদোষ থেকে মুক্তির জন্য এক রানে আদম ও অপর রানে হাওয়া লিখবে। ঘুমের সময় ওয়াস সামাই ওয়াত ত্বারিক পড়বে। [আদ-দা ওয়াদ দাওয়াউ, পৃ.১৭৯]

সুতরাং প্রমাণিত হল যে, আনিসুর রহমান সাহেব আহলে হাদীসদের মত কুরআন অবমাননা করতে কোন নাস্তিককেও দেখেননি। আনিসুর রহমান তার পোস্টের শিরোনাম দিয়েছে, " দেওবন্দীদের পর্ণগ্রাফি ফতওয়া ও কুরআনের অবমাননাঃ " অথচ তার দাওয়াতী মিশন অনুযায়ী শিরোনাম হওয়া উচিৎ ছিল, " আহলে হাদীসদের পর্ণগ্রাফি ফতোয়া ও কুরআনের অবমাননা"

একেবারে সাদামাটাভাবে কিছু কথা লিখলাম। ইলমী কোন আলোচনা করা থেকে বিরত থেকেছি। চুনোপটিদের প্রতিক্রিয়ার উপর পরবর্তী আলোচনা নির্ভর করছে। বেশি বাড়লে ইনশাআল্লাহ এদের সালাফী শায়খ ইবনে উসাইমিন ও ইবনুল কাইয়্যিম থেকে এসব বিষয় প্রমাণ করা হবে। তখন ইনশাআল্লাহ বিস্তারিত ইলমী আলোচনা করব। আশা করি এদের জন্য এটুকু যথেষ্ট হবে।

থানবী রহ. এর চিকিৎসা পদ্ধতি: আহলে হাদীসদের মাথাব্যথা ও আমাদের কিছু কথা (পর্ব-১)
9 February 2015 at 17:54

হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী রহ. এর দিকে সম্পৃক্ত অতুলনীয় একটি কিতাব হল বেহেশতী জেওর। কিতাবটিতে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রয়োজনী প্রায় সকল বিষয় রয়েছে। শুধু শরীয়তের মাসআলা-মাসাইল নয়, দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনী জাগতিক বিষয়ের সমাধানও রয়েছে অসাধারণ এই কিতাবটিতে। একজন মানুষ কীভাবে কলমের কালি তৈরি করবে, সে পদ্ধতিও তিনি লিখে দিয়েছেন। এই কিতাবের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ হল, এতে বিভিন্ন রোগ ও এর চিকিৎসা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। থানবী রহ. এর সময়ে যেহেতু আধুনিক চিকিৎসার ততটা উন্নতি হয়নি, একারণে কিতাবের অধিকাংশ চিকিৎসা পদ্ধতি হেকিমি। ভেষজ উদ্ভিদ ও বিভিন্ন প্রাণির উপাদান থেকে কীভাবে একজন মানুষ আরোগ্য লাভ করবে, এর ব্যবস্থাপত্র দেয়া হয়েছে। সাধারণ রোগ থেকে শুরু করে বিভিন্ন দুরারোগ্য ব্যধি সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। উলামায়ে কেরামের প্রতি সাধারণ মানুষকে বীতশ্রদ্ধ করার জন্য ইংরেজ কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত তথাকথিত আহলে হাদিস এই কিতাবের উপর বিভিন্ন প্রপাগান্ডা চালিয়ে আসছে। এদের একজন সেদিন আমাকে বেহেশতী জেওর থেকে ধ্বজভঙ্গ রোগের একটি চিকিৎসা সম্পর্কে বলল, এটা সম্পর্কে আপনার মতামত কি? আমি বললাম, এটি ধ্বজভঙ্গ রোগের চিকিৎসা। এটা নিয়ে আপনার প্রশ্নের কারণ কী? এটা কুরআনের কোন আয়াতের বিরোধী বা কোন হাদীসের বিরোধী হয়েছে বলুন? তিনি একেবারে লা জওয়াব। কোন উত্তর দিলেন না। থানবী রহ. ধ্বজভঙ্গের যে চিকিৎসা দিয়েছেন, সেটা যদি শরীয়ত বিরোধী না হয়, তাহলে এটা নিয়ে মিথ্যাচার কেন করছেন?আরব শায়খরা ভায়াগ্রা ব্যবহার করলে আপনারা অভিযোগ করেন না, কিন্তু সাধারণ মানুষের ধ্বজভঙ্গের চিকিৎসা দেয়াটা আপনাদের কাছে অপরাধ?

প্রবৃত্তিপূজারী তথাকথিত আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের মুখোশ উন্মোচনে দু'টি নোট লিখেছিলাম। "তথাকথিত আহলে হাদীসদের যৌন সমাচার" ও " এ মূর্খতার শেষ কোথায়"। আহলে হাদীসরা এর উত্তর না দিয়ে নতুনভাবে মিথ্যাচার শুরু করেছে। তাদের প্রতিক্রিয়া থেকে স্পষ্ট, নিজে ষোল আনা অপরাধ করে সেটা অন্যের ঘাড়ে চাপাতে এরা সিদ্ধহস্ত। চোর নিজে চুরি করে যদি অন্যকে দোষারোপ করে আত্মতৃপ্তি লাভ করতে চাইলে ব্যক্তিগতভাবে করতে পারে, কিন্তু তার এই আত্মতৃপ্তি পাবলিকের হাত থেকে তাকে বাচাতে পারবে না। সাধারণ মানুষের কাছে, আহলে হাদীসদের বাস্তবতা স্পষ্ট হয়েছে এবং মুসলিম উম্মাহকে বিভক্ত করার ক্ষেত্রে এদের গভীর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অনেকেই অবগত। ইনশাআল্লাহ আজকের আলোচনায় এদের বাস্তবতা আরেকটু স্পষ্ট হবে বলে আশা রাখি।

আশরাফ আলী থানবী রহ. এর মত জগৎ বিখ্যাত আলেম ও বুজুর্গকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য আনিসুর রহমান মারাত্মক মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়েছে। আনিসুরের পোস্টের লিংক:https://www.facebook.com/permalink.php? story_fbid=638529129608443&id=100003540851590&substory_index=0

প্রথমত: আশরাফ থানবী রহ. যৌন বিষয়ে যা কিছু লিখেছেন, এগুলো মূলত: ধ্বজভঙ্গ রোগের চিকিৎসা হিসেবে লিখেছেন। ইসলামী শরীয়তে স্বামীর জন্য স্ত্রীর যৌন অধিকার রক্ষা করা ফরজ। স্বামী যদি ধ্বজভঙ্গ হয়, তাহলে উক্ত স্বামীকে চিকিৎসার সুযোগ দেয়া হবে। চিকিৎসায় ধ্বজভঙ্গ রোগ না সারলে স্ত্রীকে তালাক দিতে হবে। এই মাসআলাটি যে কোন ফিকহের কিতাবে রয়েছে। একারণে ধ্বজভঙ্গ রোগের চিকিৎসা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বরং স্বামীর জন্য এ রোগের চিকিৎসা করা ফরজ। ধ্বজভঙ্গ রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে ইউনানী, হোমিউপ্যাথি, আয়ুর্বেদী যে কোন চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারে। বেহেশতী জেওরে কিছু হেকিমি চিকিৎসা পদ্ধতি লেখা হয়েছে। এই পদ্ধতির কোনটাই থানবী রহ. এর নিজস্ব নয়। অধিকাংশ পদ্ধতি উপমহাদেশের হেকিমি চিকিৎসকদের। যে কোন হাকিমের লেখা বইয়ে এধরনের চিকিৎসা পাওয়া যাবে। ধ্বজভঙ্গ রোগের চিকিৎসায় থানবী রহ. যেসব শব্দ ব্যবহার করেছেন, এগুলো চিকিৎসার ক্ষেত্রে খুবই কমন বিষয়। বর্তমানে মেডিলের যে কোন বইয়ে এধরনের শব্দ থাকতে বাধ্য। চিকিৎসা বিষয়ক যে কোন বই খুলুন, এধরনের শব্দ রয়েছে।

বর্তমানে উন্নত বইগুলোতে চিত্রসহ রোগের বিবরণ থাকে। চিকিৎসার প্রয়োজনে যৌন বিষয়ক শব্দ ব্যবহারের কারণে এগুলো যদি রগরগে যৌণ বর্ণনা হয়, তাহলে পৃথিবীর সকল চিকিৎসার বই রগরগে চটি বই। আনিসুর রহমানের সবচেয়ে বড় শয়তানি হল, সে একটিবারও একথা বলেনি যে, এটি যৌন রোগের চিকিৎসা হিসেবে লেখা হয়েছে। আনিসুর রহমানের নোংরা মানসিকতা থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট, চিকিৎসা বিষয়ক বই থেকেও তিনি রগরগে যৌন স্বাদ পেয়ে কুকড়ে যান। চিকিৎসা বিষয়ক পথ্য থেকে যারা এধরনের রগরগে যৌন স্বাদের গন্ধ পায়, তাদের রুচিবোধ সম্পর্কে আর কিছু বলার আছে বলে মনে করি না। আমি এই প্রথম এত নীচু মানসিকতার লোক দেখেছি, যে যৌন চিকিৎসার আলোচনায় রগরগে যৌন স্বাদের গন্ধ পায়। বাংলাদেশে হোমিও প্যাথির উপর লেখা অসংখ্য বইয়ে এধরনের বর্ণনা আছে, হামদর্দের ঔষধগুলোতে এধরনের বর্ণনা থাকে, ভেষজ উদ্ভিদের বইয়ে এধরণের বর্ণনা থাকে, কিন্তু এ পর্যন্ত কোন নোংরা

মানসিকতার লোক পাইনি যে এসব বই থেকে যৌন স্বাদ পায়। এসব বই কে চটি হিসেবে গণ্য করার মত এত নীচ মানসিকতা কীভাবে তৈরি হয়, সেটাই বিস্ময়।

আশরাফ থানবী রহ. এর সম্পূর্ণ আলোচনার স্ক্রিনশট দেখুন:

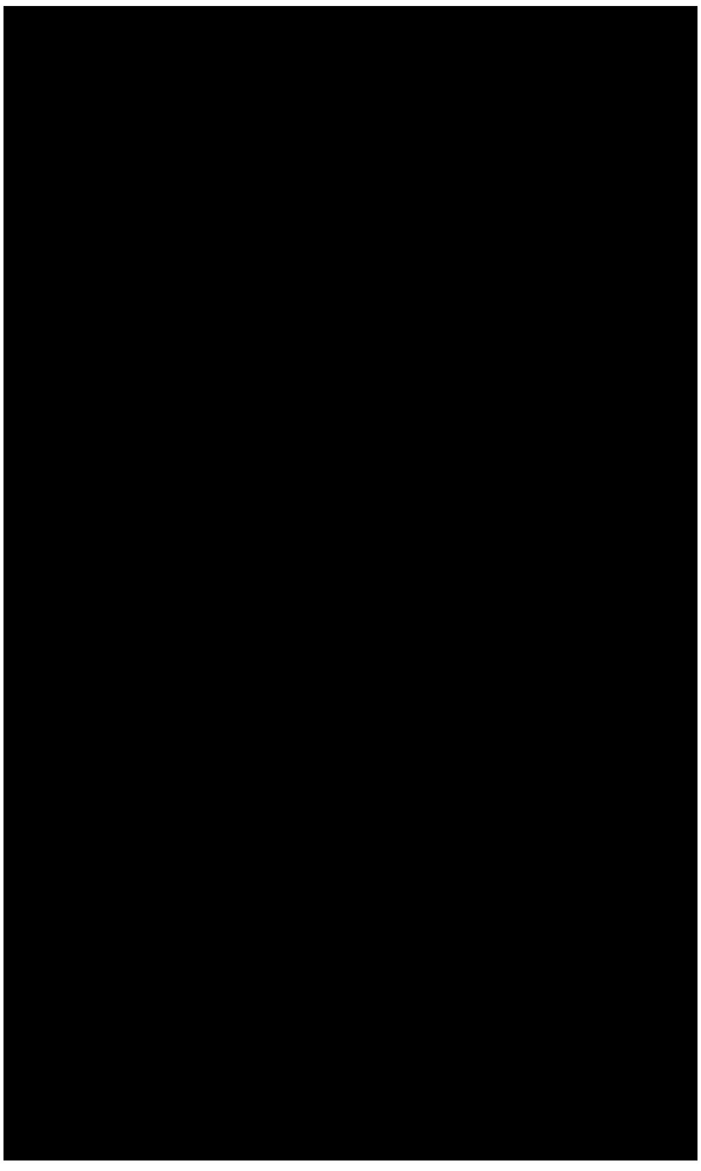

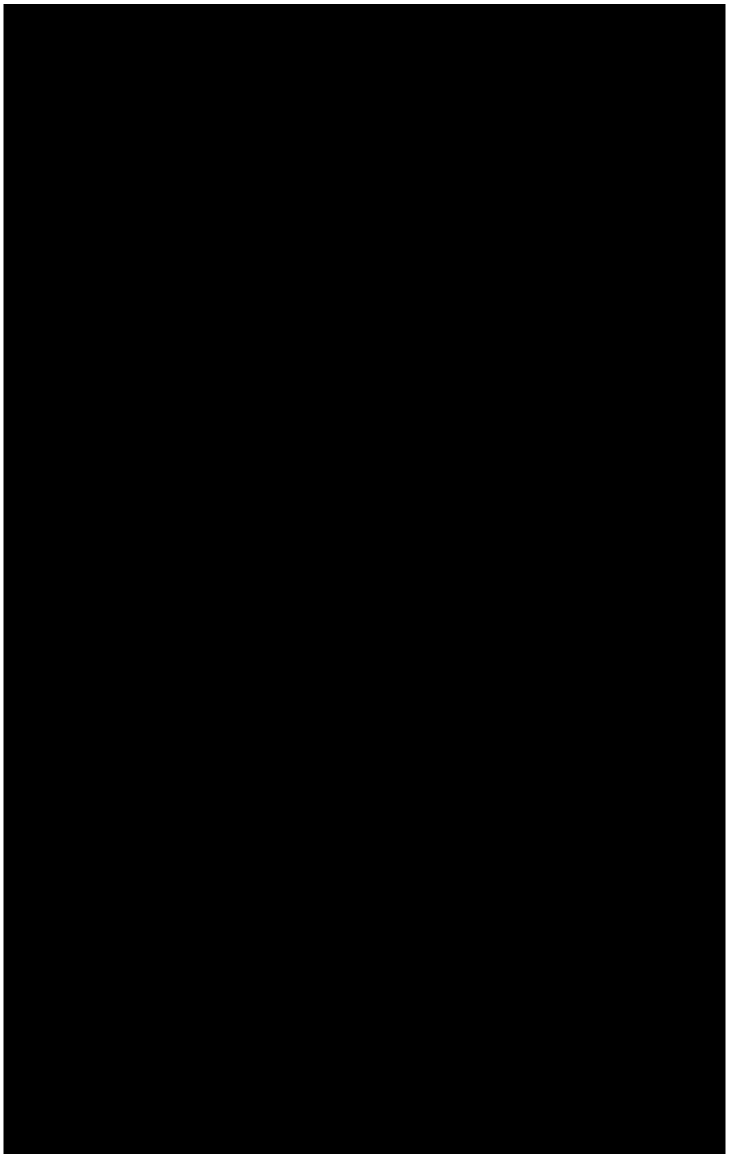

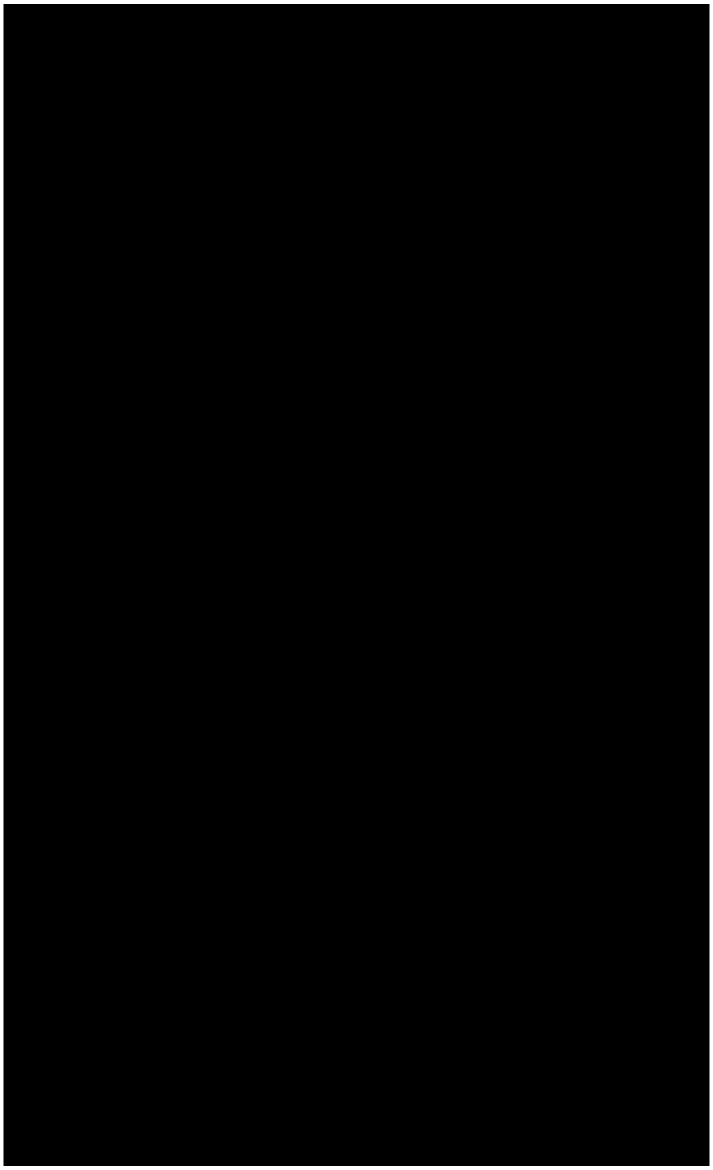

আনিসুর রহমানের নোংরা মানসিকতাসম্পন্ন বক্তব্যগুলো দেখুন,"আমরা অত্র কিতাব অধ্যায়ন করে দেখেছি যে, এই কিতাবে এমন কিছু বিষয়ের অবতারনা করা হয়েছে যে, কোনো নারী তো দূরে থাক সর্বসাধারনও এগুলো পাঠ করতে লজ্জায় কুঁকড়ে যাবে। যৌনতার রগরগে বর্ণনা, পুরুষের যৌনাঙ্গ লৌহ দণ্ডের ন্যায় মোটা-তাজাকরনের অদ্ভুত পদ্বতি, মহিলাদের লজ্জাস্থান ছোট-টাইট করনের আজগুবি পদ্বতি বর্ণনা ইত্যাদি দ্বারা কিতাবটি ভরপুর। যৌনতার এমন রগরগে বর্ণনা ইসলামী শিক্ষার নামেই চালানো হচ্ছে।"

অর্থাৎ আনিসুর রহমানের অধ্যয়নে যৌন রোগের চিকিৎসার জন্য লিখিত পথ্য হল যৌনতার রগরগে বর্ণনা। চিকিৎসা বিষয়ক লিখিত পথ্য থেকে আনিসুর রহমানের এধরনের নোংরা মানসিকতা প্রমাণ করে সকল মেডিকেল বই আনিসুর রহমান গংদের নিকট রগরগে যৌন বর্ণনা। বাংলাদেশের অন্যান্য ডাক্তারদের লেখা বইও আনিসুর রহমান সাহেবদের নিকট চটি বই। আমরা আনিসুর রহমানের পরবর্তী স্ট্যাটাসের অপেক্ষায় আছি, কবে তিনি চিকিৎসা বিষয়ক অন্যান্য বই অধ্যয়ন করে এধরনের স্ট্যাটাস দিয়ে তার নোংরা মানসিকতার বহিপ্রকাশ ঘটাবেন।

পাঠকদের সামনে নমুনা হিসেবে ডা. বশির মাহমুদ ইলিয়াসের লেখা "ইমার্জেন্সী হোমিও প্যাথিক চিকিৎসা " বই থেকে ধ্বজভঙ্গ রোগের চিকিৎসা পেশ করছি। এটি পড়ে দয়া করে বলুন, থানবী রহ. এর আলোচনার সাথে ডা. বশির মাহমুদের আলোচনার পার্থক্য কোথায়?

আনিসুর রহমানের মিথ্যাচার :আনিসুর রহমান থানবী রহ . কে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য তার নামে মিথ্যাচার করে লিখেছে , "যৌনতার এমন রগরগে বর্ণনা ইসলামী শিক্ষার নামেই চালানো হচ্ছে। "আমরা আনিসুর রহমানকে চ্যালেঞ্জ করছি , ধ্বজভঙ্গের চিকিৎসাকে থানবী রহ . কোথায় ইসলামী শিক্ষা বলে উল্লেখ করেছেন ? যদি বিন্দুমাত্র আল্লাহর ভয় থাকে , তাহলে আপনি থানবী রহ . এর নামে যে মিথ্যাচার করেছেন তার প্রমাণ দিন , নতুবা সবার সামনে তৌবা করুন। এই অপবাদের কারণে থানবী রহ . আপনাকে মাফ করবে কি না আমরা জানি না। যৌন চিকিৎসাকে 'যৌনতার রগরগে বর্ণনা ' উল্লেখ করে আনিসুর রহমান যে নোংরামির পরিচয় দিয়েছে , এটি আনিসুর রহমানের মতো আহলে হাদীসের পক্ষেই কেবল সম্ভব।

আনিসুর রহমানের কাছে একটি অনুরোধ :

আনিসুর রহমানের যেই রাষ্ট্রের মতবাদ প্রচারে এধরনের নোংরামির আশ্রয় নিয়েছে , সেই রাষ্ট্রেরই একটি প্রথম সারির পত্রিকা হল , আর রিয়াদ।

আর রিয়াদ পত্রিকায় ২০০৩ সালের অক্টোবর মাসে একটি আর্টিকেল প্রকাশিত হয়।

আর্টিকেলের শিরোনাম , التداوي بالمشتقات الحيوانية" প্রাণি থেকে আহরিত উপাদানের মাধ্যমে চিকিৎসা " ।আর্টিকেলের লিংক:http://www.alriyadh.com/Contents/08-10-2003/Mainpage/SAHA_1808.php

এই আর্টিকেলে সৌদির কোন অঞ্চলে কী ধরনের চিকিৎসা প্রচলিত সেগুলোর বিবরণও রয়েছে। আনিসুর রহমান সাহেব নিজে যদি আরবী পড়তে না পারেন , তাহলে আপনাদের আরবী জানা শায়খদের কাছ থেকে সহায়তা নিতে পারেন। আপনারা যেহেতু সৌদি আরবের মতবাদ প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছেন, এজন্য সৌদি আরব এসকল চিকিৎসা পদ্ধতিও আপনাদের 'অধ্যয়নের পদ্ধতি ' অনুযায়ী প্রচার করবেন। প্রচারের শিরোনাম হবে , " সৌদি শেইখদের রগরগে যৌন বর্ণনা " ।

ভেড়ার অন্ডকোষ :

আর রিয়াদের উক্ত আর্টিকেলে ভেড়ার উপকারিতা সম্পর্ক লেখা হয়েছে ,

الماعز: لحمه غذاء جيد وتؤكل خصية التيس لزيادة الباءة

অর্থাৎ ভেড়ার গোশত একটি সুস্বাদু খাবার। যৌন শক্তি বৃদ্ধির জন্য এর অন্ডকোষ খাওয়া হয়।মন্তব্য : আশরাফ আলী থানবী রহ. ধ্বজভঙ্গ রোগের চিকিৎসায় বিভিন্ন পথ্য লিখেছেন। অথচ আপনাদের শেইখ তো সাধারণ যৌন শক্তি বৃদ্ধির জন্য এটি খেতে বলেছেন। থানবী রহ . ছাগলের অন্ডকোষ খাওয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক করে দিয়েছেন , ধ্বজভঙ্গের চিকিৎসায় অন্য কোন ঔষধ যদি কাজ না করে তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী এটি খেতে পারে। অথচ আপনাদের শেইখরা সাধারণ যৌন শক্তি বৃদ্ধির জন্য এটি খাওয়ার কথা বলেছেন। আরেকটি ফতোয়া দেখুন।

সালাফীদের পরিচিত শায়খ সালেহ আল -মুনাজ্জিদকে অন্ডকোষ খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি লিখেন ,

يجوز أكل خصية الذبيحة ؛ حيث لا دليل على عدم الجواز ، والأصل الإباحة .

" জবাইকৃত পশুর অন্ডকোষ খাওয়া বৈধ। এটি অবৈধ হওয়ার কোন দলিল নেই। প্রত্যেক বিষয়ে মূল হল মুবাহ হওয়া "

[http://islamqa.info/ar/126343]

যাদের কাছে সাধারণভাবে অন্ডকোষ খাওয়া বৈধ , তারা ছাগল বা গরুর অন্ডকোষ নিয়ে নাক সিটকায় কী হিসেবে ? আমরা তো চিকিৎসার প্রয়োজনে কাউকে সাময়িক খাওয়ার অনুমতি দিয়েছে , অথচ সালাফী শায়খরা তো সব সময় এটি খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। আর রিয়াদ পত্রিকায় যৌন শক্তি বৃদ্ধির জন্য এটি খাওয়ার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। আনিসুর রহমান সাহেবের কাছে

অনুরোধ, শায়খদের এসব ফতোয়ার উপর আমল করতে বিলম্ব করবেন কেন? আপনার ধ্বজভঙ্গ না থাকলেও শায়খদের ফতোয়া অনুযায়ী এগুলো খাওয়া উচিৎ। সেই সাথে সকল সালাফী-আহলে হাদীস ভাইদেরকে এগুলো খাওয়ার দাওয়াত দিন।

সালাফী শায়খদের নিকট যেহেতু অন্ডকোষ খাওয়া বৈধ, সুতরাং একটি বৈধ জিনিসকে অবৈধ বানাবার চেষ্টা, বৈধ জিনিস নিয়ে উপহাস করার কোন হাদীসে আছে? আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, আমি যে জিনিস হালাল করেছি, তুমি সেটি হারাম করো কেন? আপনাদের নিকট যখন অন্ডকোষ খাওয়া বৈধ, তখন এটি নিয়ে তামাশা করে কীসের প্রমাণ দিলেন?

যৌনাঙ্গে সিংহের তেল মালিশ:

আনিসুর রহমান লিখেছে," ’কুকুরের সঙ্গমকালে যখন মজবুতভাবে লাগিয়া যায় তখন সাবধানতার সহিত কুকুরের লেজ জড় থেকে কাটিয়া লইবে। ৪০ দিন (অর্থাৎ এক চিল্লা!) উহা মাটির নীচে গাড়িয়া রাখিবে। অতঃপর মাটি হইতে বাহির করিবে এবং সুতায় গাঁথিয়া কোমরে ধারন করিবে। যতক্ষণ উহা কোমরে থাকিবে ততক্ষন বীর্যপাত হইবে না’’ বেহেশতী জেওর পৃষ্ঠা নঃ ৩৭৮# আমাদের বক্তব্যঃ এখানে আর চুপ থাকতে পারলাম না। হে সম্মানিত পাঠক! চিন্তা করে দেখুন, একটি জীবিত কুকুরকে তার সঙ্গমকালীন অবস্থায় একদম গোঁড়া হতে লেজ কেটে নেয়া!!! অতঃপর সেটাকে এক চিল্লা অর্থাৎ চল্লিশ দিন মাটির নীচে দাফন করে রাখা! অতঃপর তাবিজের মতো কোমরে ধারন করে...............!আমাদের ভাগ্য ভালো যে, থানভী সাহেব কুকুরের লেজের কথা বলেছেন, বাঘের লেজের কথা বলেননি!!! "

আনিসুর রহমান যেই বক্তব্যে চুপ থাকতে পারেননি, আনিসুর রহমানদের গুরু ও মুজাদ্দিদ নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান ভুপালী তার আদ-দা ওয়াদ দাওয়া বইয়ে হুবহু সেই কথাগুলো লিখেছে। গতকালের আলোচনায় আমরা মূল বইয়ের ছবিসহ উল্লেখ করেছি।

সুতরাং আনিসুর রহমানের সুরে সুর মিলিয়ে বলতে হয় , ” আহলে হাদীসদের মুজাদ্দিদ ও মহান সংস্কারকের কুকুরের লেজ সংক্রান্ত পথ্যে আর চুপ থাকতে পারলাম না। হে সম্মানিত পাঠক ! চিন্তা করে দেখুন , একটি জীবিত কুকুরকে তার সঙ্গমকালীন অবস্থায় একদম গোঁড়া হতে লেজ কেটে নেয়া *!!!* অতঃপর সেটাকে এক চিল্লা অর্থাৎ চল্লিশ দিন মাটির নীচে দাফন করে রাখা ! অতঃপর তাবিজের মতো কোমরে ধারন করে*...............!*আমাদের ভাগ্য ভালো যে , থানভী সাহেব কুকুরের লেজের কথা বলেছেন , বাঘের লেজের কথা বলেননি *!!! ”*

আনিসুর রহমানদের মহান মুজাদ্দিদ বাঘের লেজের কথা না বলায় তারা যে খুশি প্রকাশ করেছে এটি সাময়িক। কারণ এই খুশি তাদের আরেক শায়খ ভন্ডুল করে দিয়েছেন। তিনি যৌন শক্তি বৃদ্ধির জন্য সিংহের চর্বি বা তেল দিয়ে যৌনাঙ্গ মালিশ করতে বলেছেন।

"আর রিয়াদ " পত্রিকায় প্রকাশিত আর্টিকেলে বলা হযেছে ,

الأسد: يستعمل دهنه في التدليك لإزالة آلام الظهر، وإذا دلك به العضو التناسلي والخصيات نفع مقوياً للباءة

অর্থাৎ সিংহের চর্বি ও তেল দিয়ে যৌনাঙ্গ ও অন্ডকোষ মালিশ করলে সঙ্গমের জন্য এটি শক্তিশালী হবে। আনিসুর রহমান সাহেবদের কাছে অনুরোধ , আপনাদের মুজাদ্দিদ সাহেব যেই অপূর্ণতা রেখেছিলেন , আর রিয়াদ পত্রিকায় সেটি পূর্ণ করা হয়েছে , সুতরাং নতুনভাবে প্রচার করুন , যৌন চিকিৎসায় আহলে হাদীস ও সালাফী শায়খদের রগরগে বর্ণনা।আনিসুর রহমানরা এখন আর কুকুরের লেজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নন , তারা যৌন শক্তির বৃদ্ধির জন্য সিংহের চর্বিও ব্যবহার করেন !!!।

আনিসুর রহমান সাহেব লিখেছে , "কুকুরের লিঙ্গ কাটিয়া লইবে। সঙ্গমের পূর্বে উরুতে বাধিবে। ইহাতে রতিশক্তি বৃদ্ধি পায়। উহা উরুতে বাঁধা থাকাকালীন লিঙ্গ নিস্তেজ হইবে না , কামাগ্নি প্রজ্জলিত থাকিবে ’’ বেহেশতী জেওর পৃষ্ঠা নঃ ৩৭৭ # আমাদের বক্তব্যঃ কুকুরের লিঙ্গ উরুতে বাঁধার সাথে এগুলোর কি সম্পর্ক ! এছাড়া আর কিছুই বলার নেই !"

আনিসুর রহমান সাহেব উভয়ের তাৎপর্য খুজে পাননি। আমি আনিসুর রহমানদের মাথার তাজ সালাফীদের মহান ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এর বিশিষ্ট ছাত্র ইবনুল কাইয়্যিম রহ. এর কিতাবে হয়ত এর একটি তাৎপর্য পেয়েছি। আশা করি, এই তাৎপর্যটি আনিসুর রহমান সাহেবকে চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে সালাফী শায়খদের অবস্থান বুঝতে সহযোগিতা করবে। "বিভিন্ন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত সত্য হল, মানুষের চোখের কু-দৃষ্টির কারণে বিভিন্ন ক্ষতি হয়ে থাকে। অনেক সময় নজর লাগার কারণে ছেলে-মেয়েদের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। বিভিন্ন হাদীসে নজর লাগার চিকিৎসাও বর্ণনা করা হয়েছে। ইবনুল কাইয়্যিম রহ. তার বিখ্যাত কিতাব আত-তিব্বুন নববীতে নজর লাগার একটি চিকিৎসা উল্লেখ করেছেন। আসুন পদ্ধতিটা দেখে নেয়া যাক,"যার কু-দৃষ্টির কারণে নজর লেগেছে তাকে আদেশ দেয়া হবে, সে যেন তার উরুসন্ধি ও পাশের জায়গা ও পায়জামার নীচের অংশ ধৌত করে। পায়জামার নীচের অংশ দু'টি উদ্দেশ্য হতে পারে। ১. যৌনাঙ্গ ধৌত করবে। ২.পায়জামার নীচে শরীরের ডান দিকের অংশ ধৌত করবে। অত:পর, যার নজর লেগেছে, তার পেছন থেকে হঠাৎ সেই পানি তার উপর ঢেলে দিবে। এটি ডাক্তার পদ্ধতি থেকে ভিন্ন। কেউ যদি এটি অস্বীকার করে, কিংবা এটি নিযে উপহাস করে, বা সন্দেহ করে অথবা পরীক্ষা করে দেখার জন্য এটি করে তাহলে তার উপকার হবে না। "[আত-তিব্বুন নববী, পৃ.১৩৪, ইবনুল কায়্যিম রহ]

স্ক্রিনশট:

[illegible] [illegible]:http://ia600407.us.archive.org/11/items/waq0033/tbnbk.pdf

আনিসুর রহমানের জন্য এগুলো যথেষ্ট নয়। আনিসুর রহমান সাহেবের আরও কিছু বিষয় ও উপাদান প্রয়োজন। যেগুলো পড়ে সে রগরগে যৌনতার স্বাদ আস্বাদন করতে পারবে। বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে এর চেয়ে বেশি লিখতে পারলাম না। আগামী পর্বে আরও কিছু খোরাক আনিসুর রহমান সাহেবকে দিব। আলবানী সাহেবের পরনারীর স্তন চোষার ফতোয়া, ভালবাসা থেকে মুক্তির জন্য ইবনুল কাইয়্যিম রহ. এর পরনারীকে চুমু ও আলিঙ্গনের পথ্য নিয়েও কথা হবে। থানবী রহ. এর ধ্বজভঙ্গের চিকিৎসা থেকে আনিসুর রহমান যদি এত কিছুর গন্ধ পায়, তাহলে তাদের শায়খদের লিখিত এসব ফতোয়া থেকে কত কিছুই না অর্জন করবে!!! ।

থানবী রহ. এর চিকিৎসা পদ্ধতি: আহলে হাদীসদের মাথাব্যথা ও আমাদের কিছু কথা (পর্ব-২)
11 February 2015 at 08:21

ছোটকাল থেকেই বিভিন্ন ফার্মেসীতে থানবী রহ. দন্ত-শেফা নামে একটা সাইনবোর্ড দেখে আসছি। এখনও ঢাকা শহরের বিভিন্ন ফার্মেসীতে এটি দেখা যায়। আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি তথা রসায়ন নির্ভর চিকিৎসা পদ্ধতির আগে পৃথিবীতে ভেষজ চিকিৎসা পদ্ধতি ছিল। ইউনানী, আয়ূর্বেদীসহ বিভিন্ন হেকিমি চিকিৎসা পদ্ধতিতে মানুষ তাদের রোগ নিরাময়ের চেষ্টা করত। বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে মানুষ যান্ত্রিক সভ্যতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি থেকে দূরে সরে এসেছে। বাহ্য দৃষ্টিতে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি ক্যামিস্ট্রি নির্ভর হলেও চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রাণী ও গাছ-গাছড়ার ব্যবহার থেকে মুক্ত হতে পারে নি। আমরা হয়ত ফার্মেসী থেকে এক বোতল সিরাপ, কিংবা এক পাতা ক্যাপসুল কিনে খেয়ে নেই, কিন্তু এই সিরাপ বা ক্যাপসুল কীসের থেকে তৈরি সেটি খেয়াল করি না। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানেও গাছ-পালা ও প্রাণীদের বিভিন্ন উপাদান থেকে হাজারও ঔষুধ তৈরি হচ্ছে। বর্তমানে আমরা সম্পূর্ণ ডাক্তার নির্ভর হওয়ার কারণে কোন প্রাণী থেকে আহরিত ওষুধ সেবন করছি সেটি হয়ত খেয়াল করি না। বর্তমানের সাথে প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতির একটি মৌলিক পার্থক্য হল, প্রাচীন যুগে মানুষ সরারসি গাছপালা ও প্রাণীর বিভিন্ন উপাদান ব্যবহার করত, আধুনিক যুগে আমরা সেগুলোই ল্যাব থেকে প্রক্রিয়াজাত করে ব্যবহার করছি। নতুবা আধুনিক যুগেও প্রায় সত্তর ভাগ ওষুধ প্রকৃতি থেকে আহরণ করা হয়।

যেমন, ২০০৭ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী, দীর্ঘ ২৫ বছর যাবৎ আমেরিকায় যে ঔষধ তৈরি হয়েছে এর সত্তরভাগ প্রাকৃতিক উপাদান থেকে নেয়া হয়েছে।

"Around 70 percent of all new drugs introduced in the United States in the past 25 years have been derived from natural products, reports a study published in the March 23 issue of the Journal of Natural Products. The findings show that despite increasingly sophisticated techniques to design medications in the lab, Mother Nature is still the best drug designer.

"Read more at

http://news.mongabay.com/2007/0320-drugs.html#tgVzbhQ7OoBmMSqQ.99

আমাদের চোখের আড়ালে ল্যাবে যে ওষুধ তৈরি হয়ে লিকুইড বা ট্যাবলেট হয়ে আমাদের কাছে আসছে, সেগুলো বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী ও গাছ -পালা থেকে তৈরি হচ্ছে। মুসলিম হিসেবে আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল , নিত্যদিন আমরা যেসকল ঔষধ ব্যবহার করছি , এর কতগুলো হালাল? ঔষধের উপাদান হিসেবে যেসব উপাদান ব্যবহার করছে সেগুলো কতটুকু হালাল ? বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী ও গাছপালা থেকে ওষুধ তৈরি হচ্ছে , এর সবগুলোই কি হালাল ?এর সহজ উত্তর হল , অবশ্যই না। ঔষধে অ্যালকোহলের ব্যবহার একটি সাধারণ বিষয়। অ্যালকোহল হারাম এটি সবারই জানা। এছাড়াও শুকর থেকে বর্তমানে বহু ঔষধ তৈরি হয়। শুকর ছাড়াও অনেক হারাম প্রাণি থেকে ঔষধ তৈরি হয়। বিভিন্ন ঔষধ কোম্পানি বর্তমানে যে ঔষধ সরবরাহ করে , অধিকাংশ ঔষধে উপাদান লেখা থাকলেও উপাদানগুলো কোন প্রাণী থেকে আহরিত সেগুলো লেখা থাকে না। এটি মুসলমানদের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য সমস্যা । বৃটিশ মেডিকেল জার্নাল এর রিপোর্ট অনুযায়ী ,"বর্তমানে প্রায় চারটি মেডিসিনের তিনটিতে বিভিন্ন প্রাণী থেকে আহরিত উপাদান ব্যবহৃত হয়। "ইংল্যান্ডে একশজন ডাক্তারের উপর জরিপ করে দেখা গেছে , ৭৪ জনের প্রেসক্রিপশনে প্রাণী থেকে আহরতি উপাদান রয়েছে। এর মধ্যে শুকর , গরু থেকে আহরিত উপাদান রয়েছে।

The claim: Nearly three out of four common medications include animal-derived ingredients, according to a new study in the British Medical Journal. Bad news, if you’re a vegetarian.The research: One hundred commonly prescribed drugs in the UK were studied, and 74 of them had lactose, gelatin, or magnesium stearate—ingredients that come from cows, pigs, and fish. Gelatin is often used in capsules or coatings, and lactose and magnesium stearate are often mixed with the active ingredients of the

drugs. What it means: The researchers say doctors and patients often aren’t aware that prescription drugs are made with animal by-products. Reading labels does not always help since they found many are unclear or inconsistent.

[বিস্তারিত, http://www.prevention.com/health/healthy-living/medications-contain-animal-products]

সবচেয়ে দু:খজনক বিষয় হল, বর্তমানে ডায়বেটিস রোগের ঔষধ হিসেবে ইনসুলিন ব্যবহৃত হয়। অধিকাংশ ইনসুলিন শুকরের পরিপাকতন্ত্র থেকে তৈরি হয়।

[বিস্তারিত, http://blogs.discovery.com/dfh-sara-novak/2013/03/10-common-pharmaceuticals-you-didnt-know-were-derived-from-animals.html]

নীচে বিভিন্ন প্রাণী থেকে আহরতি উপাদানের একটি তালিকা রয়েছে। এটা দেখলে ঔষধে বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণির ব্যবহার সম্পর্কে সামান্য ধারণা সৃষ্টি হবে। http://www.peta.org/living/beauty/animal-ingredients-list/

প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতিতে শুধু ভেষজ উদ্ভিদই ব্যবহৃত হত না, সেই সাথে বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী থেকে আহরিত বহু উপাদান ব্যবহৃত হত। এমনকি এখনও চিকিৎসা হিসেবে এগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে। বিশেষভাবে যৌন রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে এখনও অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার চেয়ে হেকিমি চিকিৎসা জনপ্রিয়। হেকিমি চিকিৎসার উদাহরণ হিসেবে ইউনানী, আয়ুর্বেদী চিকিৎসা বিখ্যাত। যান্ত্রিক সভ্যতায় অভ্যস্ত হওয়ার কারণে আমাদের নিত্যদিনের পথ্যে কী কী উপাদান ব্যবহৃত হচ্ছে, সেগুলো সম্পর্কে আমরা বেখবর। চিকিৎসার ক্ষেত্রে কোন গাছ-গাছড়া বা প্রাণীর কথা শুনলেই বিষয়টি আমাদের কাছে অপরিচিত মনে হয়। পর্দার আড়ালে আসলে কী হচ্ছে, সেটা না জানার কারণেই আমাদের মাঝে এধরনের মানসিকতা তৈরি হয়েছে। নতুবা সকল চিকিৎসা পদ্ধতিই গাছ-গাছড়া ও বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণির উপর নির্ভরশীল।

আধুনিক বায়োকেমিস্ট্রির উন্নতির পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষগণ চিকিৎসার জন্য হেকিমি চিকিৎসার উপর নির্ভরশীল ছিলেন। সেই সাথে মুসলিম হিসেবে আমরা তিব্বে নববীর ব্যবহারও করে আসছি। বিভিন্ন সময় রাসূল স. যেসব চিকিৎসা পদ্ধতির কথা বলেছেন, সেগুলোই তিব্বে নববী হিসেবে পরিচিত। এর সাথে পরবর্তীতে যোগ হয়েছে শরীয়ত সম্মত রুকিয়া বা তা'বীজ ব্যবস্থা। সালাফে-সালেহীন থেকে বিভিন্ন রোগের ক্ষেত্রে বহু রুকিয়া বা তা'বীজের কথা বর্ণিত হয়েছে। এগুলো এক দিকে যেমন উপকারী, সেই সাথে সম্পূর্ণ শরিয়ত সম্মত। কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী তা'বীজের বিধান ভিন্ন । এগুলোর ব্যবহার জায়েজ নয়। কিন্তু কুরআন-সুন্নাহ সম্মত রুকিয়া বা তা'বীজের ব্যবহার সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে - সালেহীনের গুরুত্বপূর্ণ একটি চিকিৎসা পদ্ধতি। যেসব সালাফী আলেম তা'বীজকে শিরক বলার চেষ্টা করেন, তারাও রুকিয়ার পক্ষে বহু ফতোয়া দিয়েছেন।

http://ruqya.net/ সাইটে রুকিয়া সম্পর্কে সালাফী আলেমদের অসংখ্য ফতোয়া রয়েছে। শায়খ ইবনে উসাইমিন সহজে বাচ্চা প্রসব সহজ হওয়ার রুকিয়া বলে দিয়েছেন। এবং নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ রুকিয়ার কথাও আলোচনা করেছেন। বিশেষভাবে ইবনুল কাইয়্যিম রহ. তার 'আত-তিব্বুন নববী" কিতাবে ইসলামী চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। রাসূল স. এর দেয়া ব্যবস্থাপত্রের পাশাপাশি বিভিন্ন রুকিয়া সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহারের পাশাপাশি রাসূল স. এর দেয়া বিভিন্ন ব্যবস্থাপত্র, বিভিন্ন দুয়া, রুকিয়া বা তা'বীজ ইসলামী চিকিৎসার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞানে অধিকহারে হারাম জিনিসের ব্যবহার একটি সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। হারাম প্রাণি থেকে আহরিত উপাদান ও অ্যালকোহলের ব্যবহার খুবই সাধারণ বিষয়। এজন্য উলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে নতুনভাবে ভাবতে শুরু করেছেন। বিভিন্ন হাদীসে হারাম জিনিস দ্বারা চিকিৎসা করতে নিষেধ করা হয়েছে। এসব হাদীসের উপর ভিত্তি করে অধিকাংশ ফকীহ হারাম জিনিস দ্বারা চিকিৎসাকে নাজায়েজ বলেছেন। কিছু কিছু হাদীস দ্বারা হারাম জিনিস দ্বারা চিকিৎসার বৈধতারও প্রমাণ দেয়া যায়। এসব হাদীসের প্রতি দৃষ্টি রেখে কিছু কিছু উলামায়ে কেরাম তাদাবী বিল মুহাররম বা হারাম জিনিস দ্বারা চিকিৎসাকে জায়েজ বলেছেন। উভয় মতের সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, কেউ যদি হারাম জিনিস দ্বারা চিকিৎসা করতে একান্ত বাধ্য হয় এবং হারাম জিনিস ছাড়া অন্য কোন চিকিৎসা না থাকে, তাহলে তার জন্য প্রয়োজন অনুপাতে হারাম জিনিস দ্বারা চিকিৎসার অনুমতি দেয়া হবে। কারণ পবিত্র কুরআনে জীবন সংকটাপন্ন হলে হারাম জিনিস ভক্ষণের অনুমতি দেয়া

হয়েছে। দুররুল মুখতারে হারাম জিনিস দ্বারা চিকিৎসার একটি সুস্পষ্ট মূলনীতি উল্লেখ করা হয়েছে।

এ মূলনীতির আলোকে বিষয়গুলোকে যাচাই করতে হবে। يرخص (أي التداوي بالمحرم) إذا علم فيه شفاء ولم يعلم دواء غيره (الدرالمختار1:210" হারাম জিনিসের মাঝে চিকিৎসা সুনিশ্চিত হয় এবং এটি ছাড়া অন্য কোন চিকিৎসা না থাকে, তাহলে হারাম জিনিস দ্বারা চিকিৎসার অনুমতি দেয়া হবে "[আদ-দুররুল মুখতার, খ.১, পৃ .২১০]

হানাফী মাজহাবের কোন ফিকহের কিতাবে কিংবা কোন আলেমের লেখায় বাহ্যিক দৃষ্টিতে হারাম বা শরীয়তবিরোধী কোন চিকিৎসা যদি লেখা থাকে, তাহলে এটি সুনিশ্চিত যে, একান্ত বাধ্য হয়ে হারাম জিনিস দ্বারা চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট। এধরনের চিকিৎসা সম্পর্কে বাস্তব অবস্থা স্পষ্ট না করে এই অপপ্রচার চালান যে, হানাফী মাজহাবে অমুক হারাম জিনিস ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়েছে, তাহলে এটি সুস্পষ্ট মিথ্যা অপবাদ। একান্ত বাধ্য হয়ে কোন হারাম জিনিস দ্বারা চিকিৎসা আর সাধারণভাবে হারাম জিনিস ব্যবহারের মাঝে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে।

মাজহাবের প্রতি বিদ্বেষ ছড়ানো এবং উলামায়ে কেরামের প্রতি সাধারণ মানুষকে বীতশ্রদ্ধ করার কাজে নিয়োজিত কিছু লোক এধরনের নোংরা প্রপাগান্ডা চালিয়ে থাকে। এরা কখনই মাসআলার প্রেক্ষাপট উল্লেখ করে না। কোন ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য সেটিও উল্লেখ করে না। মাসআলার খন্ডিত একটি অংশ নিয়ে ফেকাহ ও ইমামগণের উপর অপবাদ দিয়ে থাকে। দু'টি বক্তব্য লক্ষ্য করুন, ১. "কুরআনে মৃত প্রাণীর গোশত খাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে" ২. "একান্ত বাধ্য হয়ে মৃত গোশত খাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে"। উভয়ের মাঝে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। যারা কুরআনের উপর মিথ্যাচার করতে চায়, তারাই কেবল প্রথম বক্তব্য প্রচার করবে। কিন্তু দ্বিতীয় বক্তব্যে বাস্তব অবস্থাও উঠে এসেছে।মাজহাব ও ইমামগণের প্রতি বিদ্বেষ ছড়াতে আহলে হাদীসদের এধরনের প্রপাগান্ডা সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এরা ফতোয়ায়ে আলমগীরের বিরুদ্ধে বই লিখেছে। খোজ নিলে দেখবেন, এদের সবগুলো দাবী হয়ত প্রপাগান্ডা নতুবা নিজেদের ভুল অন্যের উপর চাপিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা। অনেকক্ষেত্রে এদের সালাফী -আহলে হাদীস আলেমরাও একই ফতোয়া দিলেও তারা এগুলো আলোচনা না করে হানাফী মাজহাবের বিরুদ্ধে মিথ্যার বেসাতি তৈরি করে। মোটকথা, আশরাফ আলী থানবী রহ. এর আমালে কুরআনী কিতাবে কিংবা থানবী রহ. এর মুরীদ আহমাদ আলী রহ. এর লেখা বেহেশতী জেওরে যদি বাহ্য দৃষ্টিতে কোন হারাম চিকিৎসা পদ্ধতি থাকে, তাহলে এটি উপর্যুক্ত মূলনীতির

আলোকেই লেখা হয়েছে। অর্থাৎ একান্ত বাধ্য অবস্থায় প্রয়োজন অনুপাতে হারাম জিনিস দ্বারা চিকিৎসা সংক্রান্ত মূলনীতি।

আপনি সালাফী আলেমদের ফতোয়াগুলো যাচাই করেন, তাহলে এধরনের অসংখ্য অনুমতি দেখতে পাবেন। বিশেষভাবে islam Q&A তে এধরনের বহু ফতোয়া দেখতে পাবেন। মদ অল্প হোক কিংবা বেশি এটি হারাম। কিন্তু চিকিৎসার প্রয়োজনে ড.সালেহ আল-মুনাজ্জিদ প্রয়োজনীয় অ্যালকোহল ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন। বর্তমানে এধরনের ফতোয়া প্রত্যেক আলেমই দিয়েছেন। সুতরাং চিকিৎসার প্রয়োজনে একান্ত বাধ্য অবস্থায় যেসকল মাসআলা বেহেশতী জেওরে লেখা হয়েছে, সেগুলো নিয়ে যারা অভিযোগ করে, তারা তাদের আলেমদের এসকল ফতোয়ার উপর কখনো অভিযোগ করে না। তাদের এই দ্বিমুখী আচরণ থেকে তাদের মূল উদ্দেশ্য আমাদের কাছে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট।

বিভিন্ন জরিপ থেকে স্পষ্ট, আমাদের দৈনন্দিন চিকিৎসায় যেসকল ঔষধ ব্যবহার করা হয় সেখানেও প্রচুর হারাম জিনিস থাকে। শুকর থেকে কী পরিমাণ ঔষধ আহরণ করা হয়, সেটা দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন। আমাদের আহলে হাদীস-সালাফী ভাইয়েরা যাচাই-বাছাই ছাড়া এগুলো ব্যবহার করছেন, কিন্তু আঙ্গুল তুলছেন হানাফী মাজহাবের আলেমদের প্রতি। ইনসুলিনের বিষয়টি ধরা যাক। ইনসুলিন উৎপাদনের অনেক পদ্ধতি রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ ইনসুলিন শুকরের পরিপাকতন্ত্র তৈরি হয়। ডায়বেটিস রোগে আক্রান্ত আহলে হাদীস ভাইয়েরা কি কখনও এটি যাচাই করে ব্যবহার করেন যে, এটি কীসের থেকে আহরিত? কোন মুসলমান যদি আমেরিকায় থাকে, আর সেখানে শুধু শুকর থেকে তৈরি ইনসুলিন পাওয়া যায়, তাহলে সেখানকার মুসলমানদের জন্য করণীয় কী? আমাদের আহলে হাদীস ভাইয়েরা এর সমাধান দিলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব। ইসলাম শুধু জোরে আমীন, আর রফয়ে ইয়াদাইনের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়, মানব জীবনে প্রত্যেকটি সমস্যার সমাধানও ইসলাম দিয়েছে। এসকল সমস্যা সমাধানের জন্যই ফিকহের প্রয়োজন। আল্লাহর কসম, ফিকহ ছাড়া আধুনিক যুগের একটি মাসআলাও এসব আহলে হাদীসরা সমাধান করতে পারবে না। আর এসব সমস্যার সমাধান যদি না করা হয়, তাহলে পদে পদে বিভিন্ন হারামে লিপ্ত হয়ে জাহান্নামী হতে হবে। যেসব আহলে হাদীসরা ফেকাহ ও ফকীহ ইমামগণের বিরোধীতা করে, এদের কাছে আধুনিক যে কোন একটি জটিল মাসআলা দিয়ে শুধু কুরআন ও হাদীস থেকে সমাধান আনতে বলুন। যেমন, ইন্সুরেন্স বৈধ কি না, এজাতীয় যে কোন একটি মাসআলা দিলেই হবে। নিমিষেই সকল দম্ভ বের হয়ে অকল্পনীয় নমনীয়তা দেখতে পাবেন। সমালোচনা করা অনেক সহজ, কিন্তু সমাধান করা অনেক কঠিন। পেশাব একটি নাপাক বস্তু। পেশাব থেকে পবিত্র না হওয়ার কারণে কবরে শাস্তি হবে। অথচ বোখারী শরীফে রয়েছে, রাসূল স. উরাইনা গোত্রের লোকদেরকে চিকিৎসার প্রয়োজনে উটের পেশাব খাওয়ার আদেশ দিয়েছেন। এই হাদীস থেকে কিছু কিছু ফকীহ হালাল প্রাণির পেশাবকে পাক বলেছেন। কিন্তু গ্রহণযোগ্য ফতোওয়া হল, এটি

নাপাক। হালাল প্রাণির পেশাব পাক ধরা হলেও পেশাব খাওয়ার বিষয়টি কেবল চিকিৎসার প্রয়োজনেই হতে পারে। রাসূল স. চিকিৎসার প্রয়োজনে উরাইনা গোত্রের লোকদেরকে পেশাব খাওয়ার আদেশ দিয়েছেন। চিকিৎসার প্রয়োজনে হারাম জিনিসের ব্যবহারের উপর যারা অভিযোগ করেন, তাদের এই হাদীসের উপরও অভিযোগ করা উচিৎ।

প্রেমের চিকিৎসায় ইবনুল কাইয়্যিম রহ. :

আহলে হাদীস -সালাফী ভাইয়েরা অন্যায়ভাবে হানাফী মাজহাব ও দেওবন্দী উলামায়ে কেরামের দিকে আঙ্গুল তুলতে অভ্যস্ত। যত বড় ইমামই হন না কেন, তাকে মিথ্যা অপবাদে জর্জরিত করতে সামান্য কুন্ঠিত হয় না। বড় বড় ইমামদেরকে নিয়ে তামাশা এদের কাছে খুব সাধারণ বিষয়। অন্যের দোষ খুজতে যারা অভ্যস্ত, তাদের চোখে নিজেদের দোষ কখনও ধরা পড়ে না। এসব আহলে হাদীস-সালাফী ভাইদের খেদমতে ইবনুল কাইয়্যিম রহ. এর একটি ফতোয়া পেশ করছি। এ বিষয়ে তাদের লিখিত প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষায় থাকব ইনশাআল্লাহ।

ইবনে তাইমিয়া রহ. এর বিশিষ্ট ছাত্র সালাফীদের মহান ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহ. তার "রওজাতুল মুহিব্বীন" কিতাবে লিখেছেন, " হযরত উমর রা. রাতে মদিনার রাস্তায় হাটাহাটি করতেন। এক রাতে তিনি এক মহিলাকে গান গাইতে শুনলেন, "মদ পানের কোন কি কোন উপায় আছে? নসর ইবনে হাজ্জাজের সান্নিধ্যে যাওয়ার কি কোন উপায় আছে?"হযরত উমর রা. বললেন, উমর যতক্ষণ জীবিত আছে, ততক্ষণ সম্ভব নয়। হযরত উমর রা. সকালে নসর ইবনে হাজ্জাজের নিকট লোক পাঠালেন। নসর ইবনে হাজ্জাজ ছিল খুবই সুদর্শন পুরুষ। উমর রা. তাকে বললেন, তুমি বের হয়ে যাও। মদিনায় তুমি বসবাস করতে পারবে না। নসর ইবনে হাজ্জাজ মদিনা থেকে বের হয়ে বসরায় এল। এখানে সে মুশাজি ইবনে মাসউদের বাড়ীতে আসা-যাওয়া করত। মুশাজি ইবনে মাসউদের অতি সুন্দরী একটি স্ত্রী ছিল। নসর ইবনে হাজ্জাজ তার প্রেমে পড়ে গেল। মুশাজি' এর স্ত্রীও নসর ইবনে হাজ্জাজকে পছন্দ করল। মুশাজি ও নসর এক সঙ্গে গল্প করত। তাদের সাথে তার স্ত্রীও থাকত। একদিন নসর তার প্রেমিকার জন্য মাটিতে একটি চিঠি লিখল। মুশাজির স্ত্রী দেখে বলল, "আমিও"। মুশাজি বুঝল, এটি কোন কথার উত্তর। মুশাজি লেখা-পড়া জানত না। কিন্তু তার স্ত্রী পড়া-লেখা জানত। মুশাজি একটি পাত্র এনে উক্ত লেখা ঢেকে রাখল। একজন লেখককে ডেকে আনে লেখাটি পড়তে বলল। সেখানে লেখা ছিল," আমি তোমাকে এতটা ভালবাসি যে, তোমার উপরে ছায়া হয়ে থাকব, তোমার নীচে থাকলে তোমাকে বহন করব।"মুশাজির এই লেখা উদ্ধারের কথা নসর ইবনে হাজ্জাজের কানে পৌছল। এতে তারা উভয়ে খুবই লজ্জিত হল। নসর তার ঘর থেকে বের হওয়া বন্ধ করে দিল। আস্তে আস্তে তার শরীর শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছিল।

মুশাজি তার স্ত্রীকে বলল, "তুমি তার কাছে যাও। তাকে তোমার বুকে আলিঙ্গন কর। নিজ হাতে তার মুখে খাবার তুলে দাও।" মুশাজির স্ত্রী এটি করতে অস্বীকার করল। কিন্তু মুশাজির চাপাচাপিতে সে নসরের কাছে গেল। তাকে আলিঙ্গন করল, নিজ হাতে খাবার খাইয়ে দিল। নসর যখন সুস্থ হয়ে উঠল, সে একটি কবিতা আবৃত্তি করতে করতে বসরা শরহ ত্যাগ করল।"

এই ঘটনার পরে ইবনুল কাইয়্যিম রহ. লিখেছেন,

فإن قيل: فهل تبيح الشريعة مثل ذلك، قيل: إذا تعين طريقا للدواء، ونجاة العبد من الهلكة، لم يكن بأعظم من مداواة المرأة للرجل الأجنبي ومداواته لها، ونظر الطبيب إلى بدن المريض ومسه بيده للحاجة، وأما التداوي بالجماع فلا يبيحه الشرع بوجه ما، وأما التداوي بالضم والقبلة فإن تحقق الشفاء به كان نظير التداوي بالخمر عند من يبيحه، بل هذا أسهل من التداوي بالخمر، فإن شربه من الكبائر، وهذا الفعل من الصغائر، والمقصود أن الشفاعة للعشاق فيما يجوز من الوصال والتلاق سنة ماضية وسعي مشكور"

কেউ যদি প্রশ্ন করে, এভাবে শরীয়তের হারামকে হালাল করছেন? তাকে উত্তর দেয়া হবে, এটি যদি চিকিৎসা হিসেবে সুনিশ্চিত হয় এবং কোন মানুষ ধ্বংস থেকে বেচে যায়, তাহলে পরপুরুষ দ্বারা মহিলার চিকিৎসা কিংবা পরনারী দ্বারা পুরুষের চিকিৎসা, ডাক্তার রোগীর শরীরের গোপন জায়গা দেখা, প্রয়োজনে স্পর্শ করার চেয়ে এটি বড় কিছু নয়। তবে সহবাস দ্বারা চিকিৎসা শরীয়তে বৈধ নয়। নারীকে আলিঙ্গন ও চুম্বনের দ্বারা যদি কারও চিকিৎসা সুনিশ্চিত হয়, তাহলে এটি মদের দ্বারা চিকিৎসার অনুরূপ হবে। বরং এটি মদের দ্বারা চিকিৎসার চেয়ে সহজ ও লঘু। কেননা মদ পান অনেক বড় গোনাহ, সেই তুলনায় এগুলো ছোট। মোটকথা, প্রেমিকদের চিকিৎসা হিসেবে প্রেমিকার সাথে দেখা-সাক্ষাৎ এটি পুরনো নিয়ম এবং একটি প্রশংসনীয় কাজ"।

[রওজাতুল মুহিব্বীন, পৃ.৫১৬-৫১৭, তাহকীক, মুহাম্মাদ উজাইর শামস]

ডাউনলোড লিংক:http://waqfeya.com/book.php?bid=7002

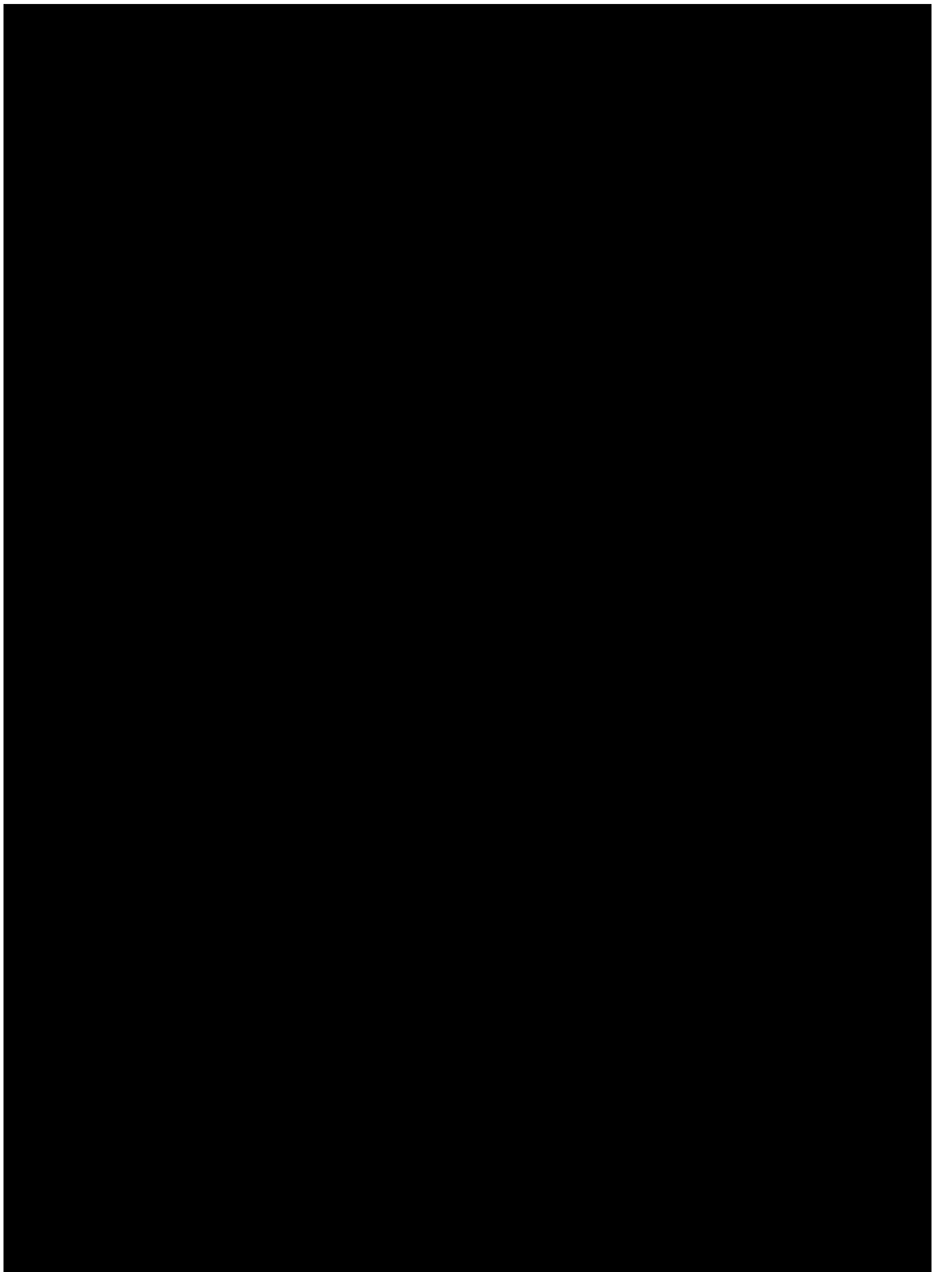

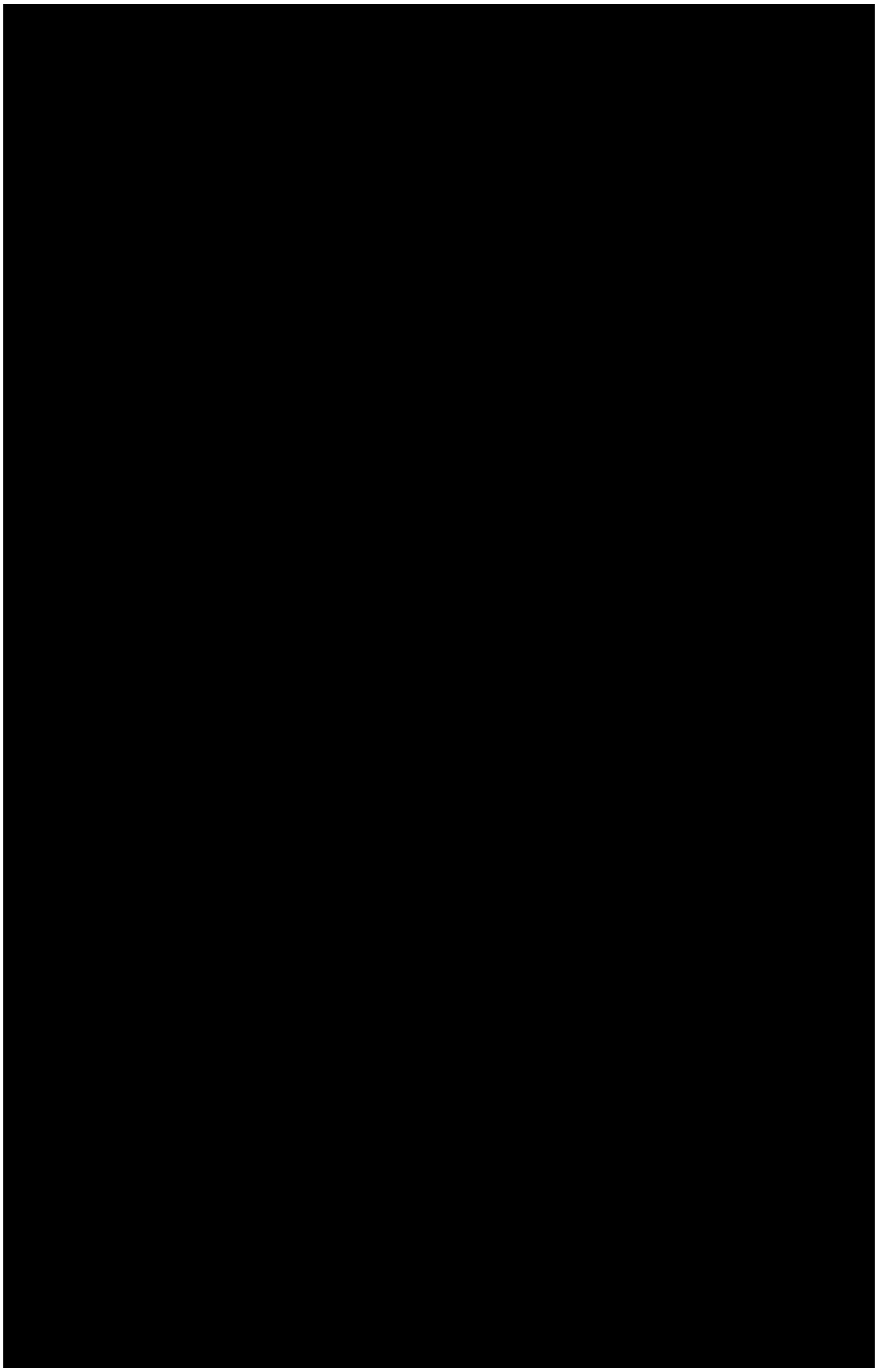

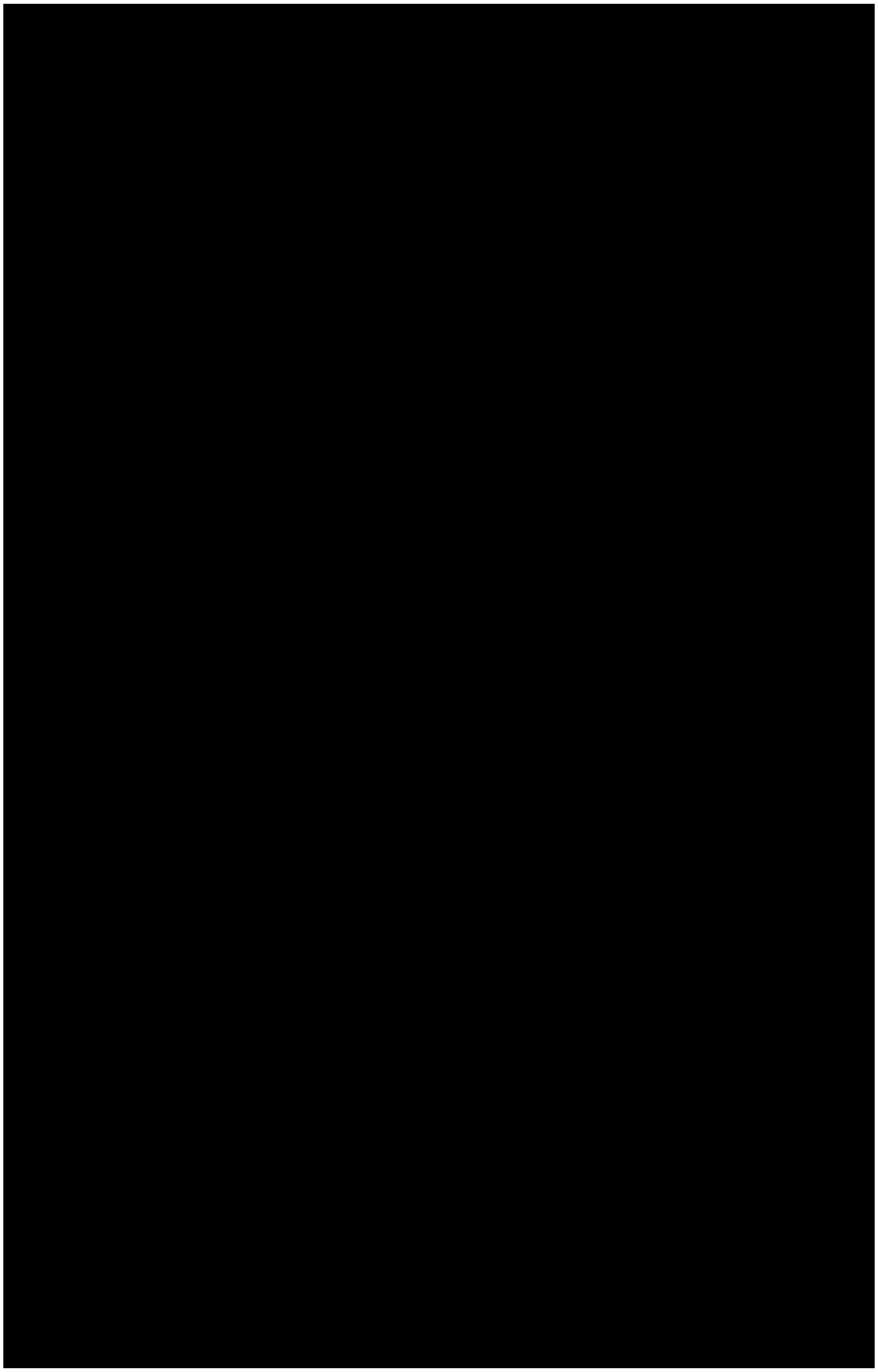

মন্তব্য:ইবনুল কায়্যিমর রহ. এর বক্তব্যের আমরা কোন মন্তব্য করছি না। বরং সালাফী ও আহলে হাদীস ভাইদের মন্তব্য জানতে চাইছি। তবে একটি কথা অবশ্যই বলব, প্রেমের চিকিৎসা হিসেবে ইবনুল কায়্যিম রহ. যা লিখেছেন, এটিকে জায়েজ বললে সমাজে প্রেম-ভালবাসা ও ব্যভিচার ছড়াবে। এটি না জায়েজ হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত। ইবনুল কাইয়্যিম রহ. এটিকে কীভাবে জায়েজ বললেন,সেটাই বিস্ময়।

আকিদাতুত ত্বহাবীর ব্যাখ্যাকার ইবনে আবিল ইয: হানাফী না কি হাশাবী?
18 February 2015 at 04:40

[বর্তমানে ইবনে আবিল ইযের আকিদাতুত ত্বহাবীর ব্যাখ্যাগ্রন্থটি ব্যাপকভাবে প্রচারের চেষ্টা করা হচ্ছে। যেমন, সালাফী আলেম আব্দুল্লাহ শাহেদ মাদানী এর বাংলা অনুবাদ করে অনলাইনে প্রচার করছেন। সুতরাং এই কিতাবের বাস্তবতা ও এর লেখক সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাগুলো সুস্পষ্ট করা আবশ্যক। আকিদাতুত ত্বহাবীর উপর দরসের নিয়ত ব্যক্ত করেছিলাম কিছু দিন আগে। উক্ত দরসের প্রয়োজনে আজকের আলোচনাটি লেখা। যারা উক্ত দরস দেখবেন, আশা করি বিষয়টি তাদের উপকারে আসবে।]

সৌদি আরবের কল্যাণে কাররামিয়াদের ভ্রান্ত দেহবাদী আকিদাগুলো সালাফী মতবাদের মোড়কে ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। পেট্র-ডলারের সহায়তায় তারা এক্ষেত্রে অনেকটা অগ্রসর। সালাফীদের ভ্রান্ত আকিদা সম্পর্কে বেশ কিছু প্রবন্ধ লেখার সুযোগ হয়েছে আল-হামদুলিল্লাহ। আমাদের আইডিয়ার ওয়েবসাইটে লেখাগুলো পাবেন। সালাফী মতবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে থাকে। এর মধ্যে একটি বিশেষ কৌশল হল, বিভিন্ন ইমামের আকিদার কিতাব ব্যাখ্যার নামে নিজেদের ভ্রান্ত আকিদা ছড়িয়ে দেয়া। উদাহরণ হিসেবে ইমাম ত্বহাবীর আকিদাতুত ত্বহাবীর কথা বলা যায়। একটু খোজ নিলে দেখবেন, প্রায় প্রত্যেক সালাফী শায়খই আকিদাতুত ত্বহাবীর ব্যাখ্যা করেছেন। কেউ ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন, কেউ অডিও বা ভিডিও লেকচার দিয়েছেন। অন্তত বিশ-পজিশজন বা এর চেয়ে বেশি সালাফী শায়খের ব্যাখ্যা পাবেন। একটি মৌলিক প্রশ্ন হল, এসব সালাফী আলেমরা কি ইমাম ত্বহাবীর আকিদা পোষণ করেন? ধ্রুব সত্য হল, ইমাম ত্বহাবীর আকিদার সাথে এদের আকিদার দূরতম কোন সম্পর্ক নেই। ইমাম ত্বহাবী রহ. এর আকিদার ও এদের আকিদার মাঝে আসমান-জমিনের ফারাক। আরেকটি প্রশ্ন মনে উকি দেয়, এরা যেহেতু ইমাম ত্বাহাবীর আকিদা পোষণ করে না, তাহলে এর ব্যাখ্যা করে কেন? সহজ উত্তর হল, ইমাম ত্বহাবীর আকিদা প্রচারের ছদ্মাবরণে নিজেদের ভ্রান্ত আকিদা প্রচার। এদের যে কোন একটা ব্যাখ্য পড়লেই এই বাস্তবতা উপলব্ধি করবেন।

সৌদি সরকারের পক্ষ থেকে ইমাম ত্বহাবী রহ . এর আকিদাকে বিকৃত করার লক্ষ্যে লিখিত একটি বেনামী ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৩৪৯ হিজরীতে। বে -নামী ব্যাখ্যা এজন্য বললাম , উক্ত ব্যাখ্যার উপর লেখকের নাম ছিল না। আর প্রশাকগণ নিশ্চিত ছিলেন না যে , ব্যাখ্যাগ্রন্থটি মূলত : কার। পরবর্তীতে তারা তত্ব -তালাশ করে উদ্ধার করেন , এটি ইবনে আবিল ইয আল-হানাফীর লেখা। বর্তমানে এটি ইবনে আবিল ইযের ব্যাখ্যা হিসেবে প্রচার করা হয়। আমাদের আলোচ্য বিষয় শিরোনাম থেকে কিছুটা স্পষ্ট। তবে দু 'টি বিষয়ে সামান্য আলোকপাত করার চেষ্টা করব। ১ . ইবনে আবিল ইযের নামে প্রচারিত আকিদা কি আসলেই ইবনে আবিল ইযের লেখা ?২. ইবনে আবিল ইযকে হানাফী হিসেবে প্রচার করা হয়। তিনি কি হানাফী ছিলেন না কি দেহবাদী আকিদায় বিশ্বাসী হাশাবী ছিলেন ?

প্রচলিত আকিদাতুত ত্বাহাবীর ব্যাখ্যা কি ইবনে আবিল ইযের *?*

বিষয়টি বোঝার জন্য ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রকাশের ইতিহাসের দিকে ফিরে যেতে হবে। আকিদাতুত ত্বাহাবীর ব্যাখ্যাগ্রন্থটি ১৩৪৯ হিজরীতে মক্কায় সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।

এই প্রকাশনায় কিতাবের উপর লেখকের কোন নাম ছিল না। বরং প্রকাশকরা লেখেন ,

راجعنا ما في أيدينا من كتب التراجم والفنون، فلم نجد ما يمكننا معه الجزم بنسبته لشخص بعينه، وإنا نثبت هنا أسماء شارحي هذه العقيدة الذين عدهم صاحب كشف الظنون وهم سبعة ......ـ ومنهم صدر الدين علي بن محمد بن أبي العز الأذرعي الدمشقي الحنفي المتوفى سنة 746هـ وهو الذي يترجح الظن أنه الشارح"

আমাদের কাছে বিদ্যমান বিভিন্ন জীবনীগ্রন্থ ও রিজালের কিতাবে আমরা অনুসন্ধান চালিয়েছি। আমরা এমন কোন তথ্য পাইনি , যার আলোকে সুনিশ্চিতভাবে ব্যাখ্যাগ্রন্থটিকে সুনির্দিষ্ট কোন লেখকের দিকে সম্পৃক্ত করা সম্ভব । কাশফুজ জুনুন এর লেখকের বক্তব্য অনুযায়ী আমরা এখানে আকিদাত্ব ত্বহাবীর সমস্ত ব্যাখ্যাকারের নাম উল্লেখ করছি। তারা হলেন সাতজন.......। এদের মাঝে একজন ব্যাখ্যাকার হলেন , সদরুদ্দিন আলী ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবিল ইয হানাফী (মৃত :৭৪৬ হি :)। আমাদের বিশেষ ধারণা হল , সাতজন ব্যাখ্যাকারের মাঝে ” তিনি হলেন আকিদাতুত ত্বহাবীর ব্যাখ্যাকার ।

এখানে প্রবল ধারণা হিসেবে সদরুদ্দিন আলী ইবনে মুহাম্মাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যার মৃত্যু তারিখ হল, ৭৪৬ হিজরী। আর বর্তমানে প্রচারিত ব্যাখ্যাকার হলেন, আলী ইবনে আলী ইবনে আবিল ইয। যার মৃত্যু তারিখ হল, ৭৯২ হিজরী। এখানে প্রবল ধারণা হিসেবে যার কথা বলা হয়েছে, তিনি হলেন বর্তমানে প্রচারিত লেখকের পিতা। ছেলে আর পিতা কখনও এক হতে পারে না। উভয়ের মৃত্যু তারিখ থেকেও বিষয়টি স্পষ্ট। মোটকথা, ব্যাখ্যাগ্রন্থটি কার সেটা সুনিশ্চিতভাবে বলার মত কোন তথ্য তখনকার উলামায়ে কেরাম পাননি। পরবর্তীতে সৌদি আরবের শায়খগণ বিখ্যাত আলেম আহমাদ শাকেরকে এটি তাহকীক করার অনুরোধ করেন। শায়খ আহমাদ শাকের পরবর্তীতে এটি তাহকীক করে প্রকাশ করেন।

তিনি এর ভূমিকায় লেখেন, " এ কিতাবের যে মাখতুতা বা হস্তলিপি আমি পেয়েছি, সেখানে মূল লেখকের নেই। সুতরাং কিতাবের লেখক আসলে কে সেটা জানা সম্ভব হয়নি। "

শায়খ আহমাদ শাকের তার ভূমিকায় কয়েকবার বলেছেন যে, তিনি এই কিতাবের নির্ভরযোগ্য কোন মাখতুতা বা হস্তলিপি পাননি।

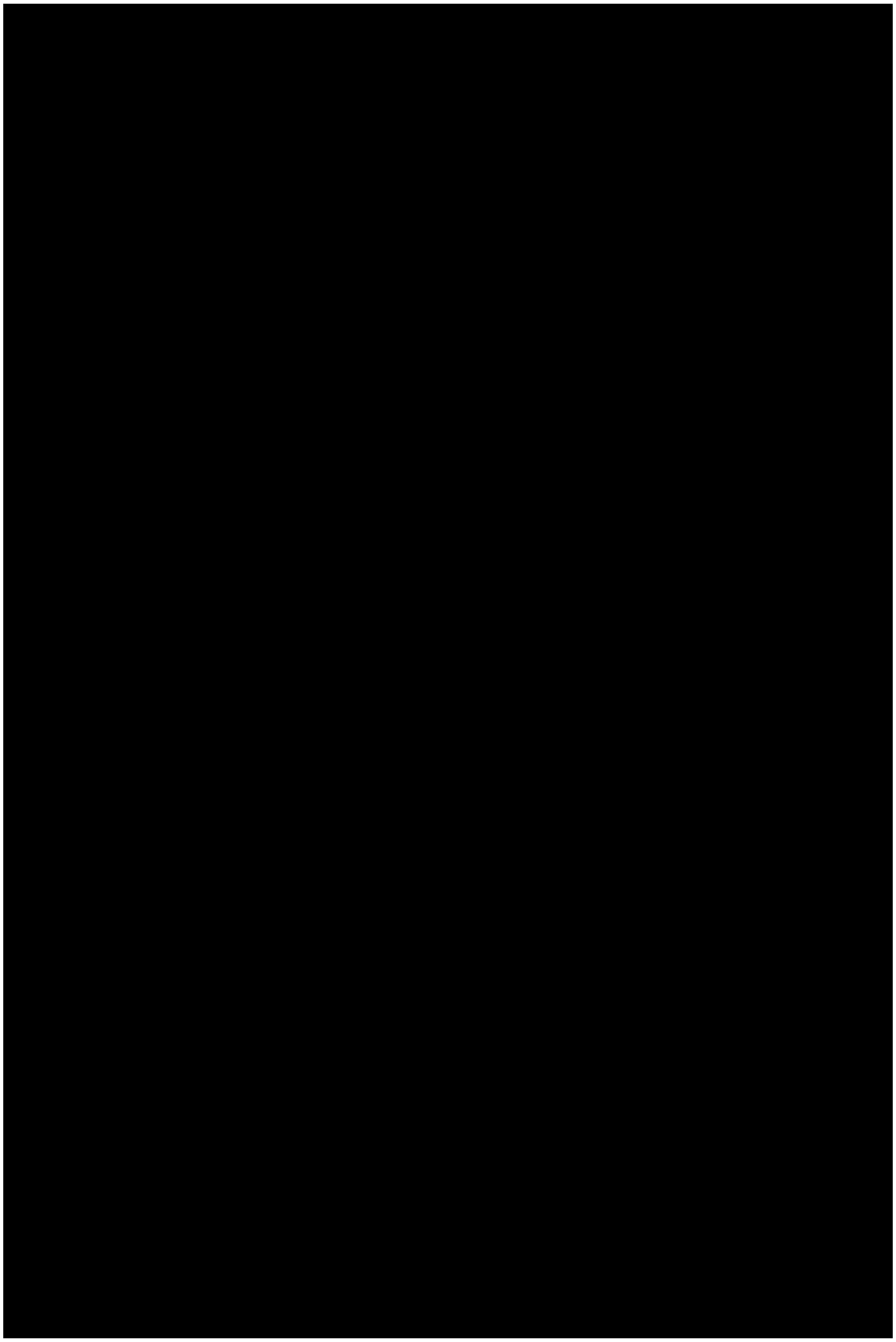

তিনি তার সাধ্য অনুযায়ী এটি তাহকীক করার চেষ্টা করেছেন। শায়খ আহমাদ শাকের আশা ব্যক্ত করেছেন, তিনি যদি নির্ভরযোগ্য কোন হস্তলিপি পান, তাহলে পরবর্তীতে এটি সংশোধনের চেষ্টা করবেন।

শায়খ আহমাদ শাকের বলেন,

ولكني لا أزال أرى هذه الطبعة مؤقتة أيضا، حتى يوفقنا الله إلى أصل محفوظ للشرح صحيح، يكون عمدة في التصحيح فنعيد طبعه

"আমি এখনও মনে করি, এই সংস্করণ অস্থায়ী। আল্লাহ তায়ালা যদি নির্ভরযোগ্য বিশুদ্ধ কোন হস্তলিপি মিলিয়ে দেন, তাহলে এটি সংশোধন করে নতুনভাবে প্রকাশ করার করব। শায়খ আহমাদ শাকের আল্লামা মোর্তজা যাবিদি রহ. [মৃত : ১২০৫ হি :] এর একটি বক্তব্য পান ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিনে। সেখানে মোর্তজা যাবিদি রহ. ব্যাখ্যাকারের নাম লিখেছেন, আলী ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মাদ আল-গাজ্জী আল-হানাফী। মোর্তজা যাবিদি রহ. এর উদ্ধৃতিতে লেখকের সঠিক পরিচয় উল্লেখ করা হয়নি।

শায়খ আহমাদ শাকের বলেন, মোর্তজা যাবিদি রহ. লেখকের নামের নিসবতে ভুল করেছেন। তিনি লিখেছেন, আলী ইবনে আলী আল-গাজ্জী, বাস্তবে হওয়ার কথা ছিল, আলী ইবনে আলী ইবনে আবিল ইয আল-হানাফী। মোটকথা, শায়খ আহমাদ শাকেরের সামনে মোর্তজা যাবিদি রহ. এর উদ্ধৃতি ছিল, বেশ কয়েকটি মাখতুতা ছিল এরপরেও ব্যাখ্যাকার সম্পর্কে সুনিশ্চিতভাবে বলেননিন যে, অকাট্যভাবে প্রমাণিত যে, উক্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থের লেখক ইবনে আবিল ইয আল-হানাফী। শায়খ আহমাদ শাকের মোর্তজা যাবিদি রহ. এর বক্তব্যের আলোকে তার ধারণা অনুযায়ী কিতাবে লেখকের নাম লিখেছেন, আলী ইবনে আলী ইবনে আবিল ইয আল-হানাফী। পরবর্তীতে মাকতাবাতুল ইসলামী থেকে শায়খ আলবানীর তাহকীকে ব্যাখ্যাগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। সেখানে কিছু মাখতুতা বা হস্তলিপি এর চিত্র দেয়া হয়েছে। এসকল হস্তলিপিতে স্পষ্টভাবে লেখকের নাম লেখা হয়েছে, আলী ইবনে মুহাম্মাদ। যার মৃত্যু তারিখ, ৭৪৬ হি :। সুতরাং মোর্তজা যাবিদি রহ. এর বক্তব্য অনুযায়ী, লেখকের নাম হওয়ার কথা ছিল, আলী ইবনে আলী আল-গাজ্জী। মাকতাবাতুল ইসলামী এর মাখতুতা অনুযায়ী, লেখকের নাম আলী ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবিল ইয। সুতরাং একথা সুনিশ্চিতভাবে বলার অবকাশ নেই যে, উক্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থের প্রকৃত লেখক কে। এরপরেও শায়খ আলবানী ও যুহাইর আশ-শাবীশ দাবী করেন, সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হল, উক্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থের লেখক ইবনে আবিল ইয আল-হানাফী।

শায়খ যুহাইর আশ-শাবীস নবম সংস্করণের ভূমিকায় (পৃ .৯) লিখেছেন,

وأما نسختنا فقد كان اسم مؤلفها مثبتا على الورقة الأولى منها، إلا أن بعض الأيدي قد لعبت فيه بالمحو والكتابة أكثر من مرة، وأخيرا أثبت عليه ما أثبته الشيخ أحمد شاكر

□□□□: আমাদের মূল হস্তলিপিতে লেখকের নাম প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা ছিল। তবে অজ্ঞাত কেউ উক্ত নাম কয়েকবার ঘষা-মাজা করে নতুনভাবে লিখেছে। অবশেষে আমি শায়খ আহমাদ শাকেরের তথ্য অনুযায়ী লেখকের নাম উল্লেখ করেছি।মোটকথা, এই ব্যাখ্যাগ্রন্থের মূল হস্তলিপিতে লেখকের নাম উল্লেখ নেই। পরবর্তীতে বিভিন্ন ঘষা-মাজার মাধ্যমে অজ্ঞাত কেউ হস্তলিপিতে লেখকের নাম সংযুক্ত করেছে। ঘষা-মাজা করে নাম সংযুক্ত করার পরও বর্তমানে প্রচলিত লেখকের নাম উক্ত হস্তলিপিতে নেই। বরং প্রচলিত লেখকের পিতার নাম ও তার মৃত্যু তারিখ দেয়া রয়েছে।

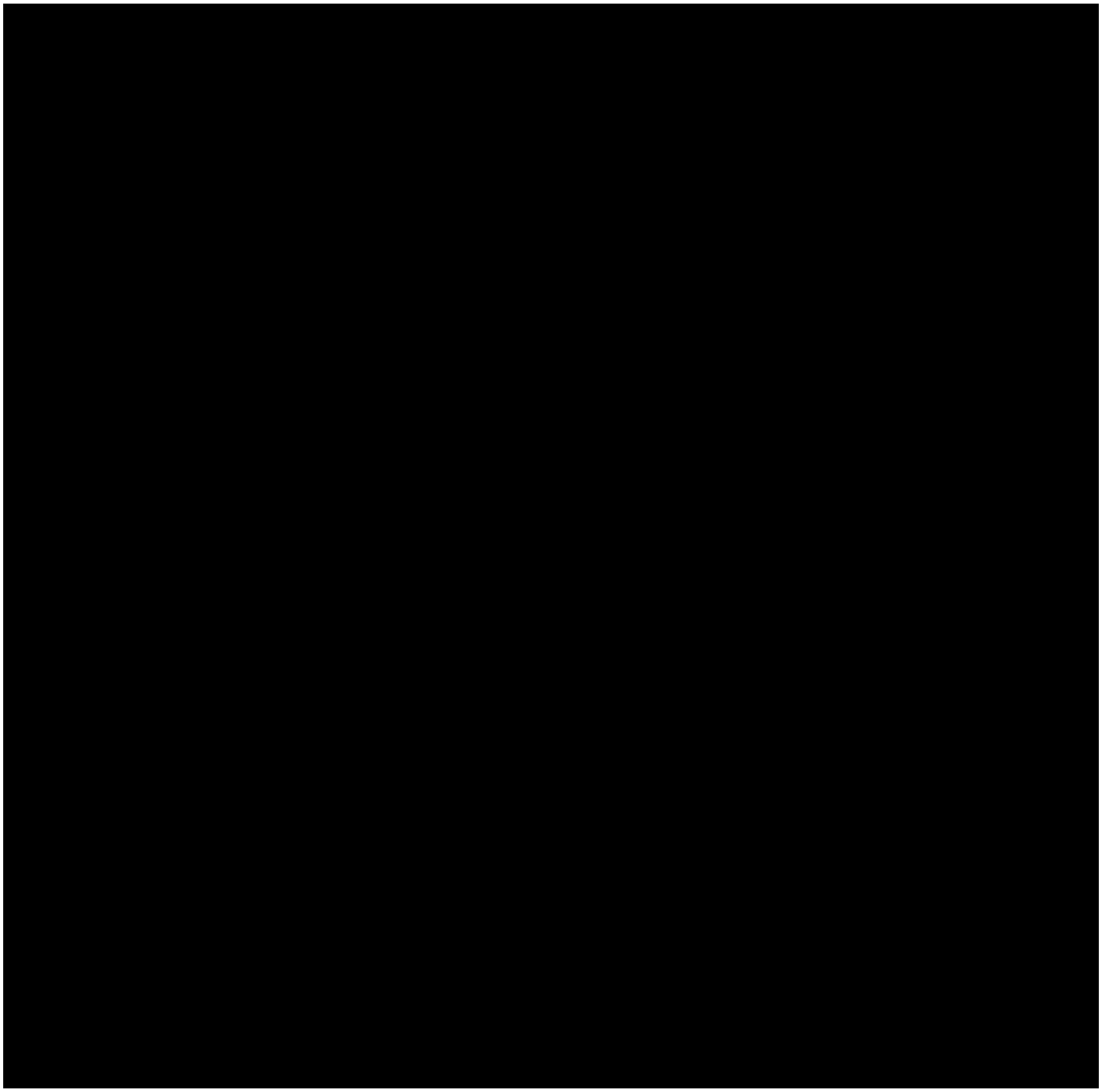

চূড়ান্ত কথা:

ইবনে আবিল ইয এধরণের ব্যাখ্যাগ্রন্থ লেখাটা অসম্ভব নয়। প্রবল ধারণা মতে হয়ত তিনি এটি লিখেছেন। কিন্তু ইবনে ইয এর লেখক হওয়ার ব্যাপারে অকাট্য কোন প্রমাণ কারও কাছে নেই, যার আলোকে নি:সন্দেহে বলা যাবে, এটি ইবনে আবিল ইয আল-হানাফী লিখেছেন। ইবনে আবিল ইয আল-হানাফীর জীবনী থেকে একটা ধারণা সৃষ্টি হয়, হয়ত তিনি এটি লিখেছেন। আল্লামা মোর্তজা যাবিদি রহ. এর উদ্ধৃতি থেকে হয়ত ধারণাটি আরেকটু মজবুত হয়। কিন্তু এটা সুনিশ্চিত বা অকাট্য কোন প্রমাণ বলার সুযোগ নেই। উক্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থের লেখক ইবনে আবিল ইয হলেও আমাদের কোন আপত্তি নেই। না হলেও এ নিয়ে মাথাব্যথা নেই। কিতাবটি ছেলে লিখেছে না কি তার পিতা লিখেছে সেটাও মৌলিক কোন বিষয় নয়।

আমাদের নিকট মূল বিবেচ্য বিষয় হল, ইবনে আবিল ইযকে হানাফী হিসেবে প্রচার করা হয়। সেই সাথে এটাও বোঝানো হয় যে, তিনি হানাফীদের আকিদার প্রতিনিধত্ব করেন। অন্যান্য হানাফীগণ তার বিরোধীতা করে মূলত: হানাফীদের মৌলিক আকিদার বিরোধিতা করে থাকে।

আমাদের সামনে মৌলিক কয়েকটি প্রশ্ন দেখা দিয়েছে,

১. ইবনে আবিল ইয বাস্তবেই কি হানাফী ছিলেন?

২. তিনি আদৌ কি হানাফী মাজহাবের সুপ্রতিষ্ঠিত আকিদার অনুসারী ছিলেন?৩. তার লেখা ব্যাখ্যাগ্রন্থ ইমাম ত্বহাবী বা হানাফী মাজহাবের মৌলিক আকিদার প্রতিনিধিত্ব করে কি?৪. ইবনে আবিল ইযের আকিদা হানাফী মাজহাবের বিখ্যাত আলেমদের নিকট নির্ভরযোগ্য কি?

৫. ইবনে আবিল ইযকে হানাফী মাজহাবের বিখ্যাত আলেমগণ নির্ভরযোগ্য আলেম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন কি?

৬. হানাফী মাজহাবের বিখ্যাত আলেমগণ ইবনে আবিল ইযের আকিদার সাথে সহমত পোষণ করেন না কি তার প্রবল বিরোধীতা করেন?

৭. হানাফী মাজহাবের উলামায়ে কেরামের জীবনীর উপর বিভিন্ন গ্রন্থ লেখা হয়েছে। এসকল কিতাবে হানাফী আলেম হিসেবে তার জীবনী বা নির্ভরযোগ্য আলেম হিসেবে কোথাও তস্বীকৃতি দেয়া হয়েছে কি?আমরা ইনশাআল্লাহ প্রত্যেকটি বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব।

ইবনে আবিল ইযের মাজহাব:

শরহে আকিদাতু ত্বহাবীর তাহকীক করেছেন, শায়খ শুয়াইব আরনাউত ও শায়খ আব্দুল্লাহ তুরকী। তারা উক্ত তাহকীকে ইবনে আবিল ইযের জীবনী আলোচনা করেছেন। তার জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে তারা লিখেছেন, ইবনে আবিল ইযকে হানাফী মাজহাবের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়। তবে বাস্তবে তিনি নিজের গর্দানকে তাকলীদের (মাজহাব অনুসরণ) বন্ধন থেকে মুক্ত করেন। শায়খ শুয়াইব আরনাউত ও শায়খ আব্দুল্লাহ তুরকীর বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ইবনে আবিল ইয একজন গাইরে মুকাল্লিদ, লা-মাজহাবী বা যাহেরী ছিল।

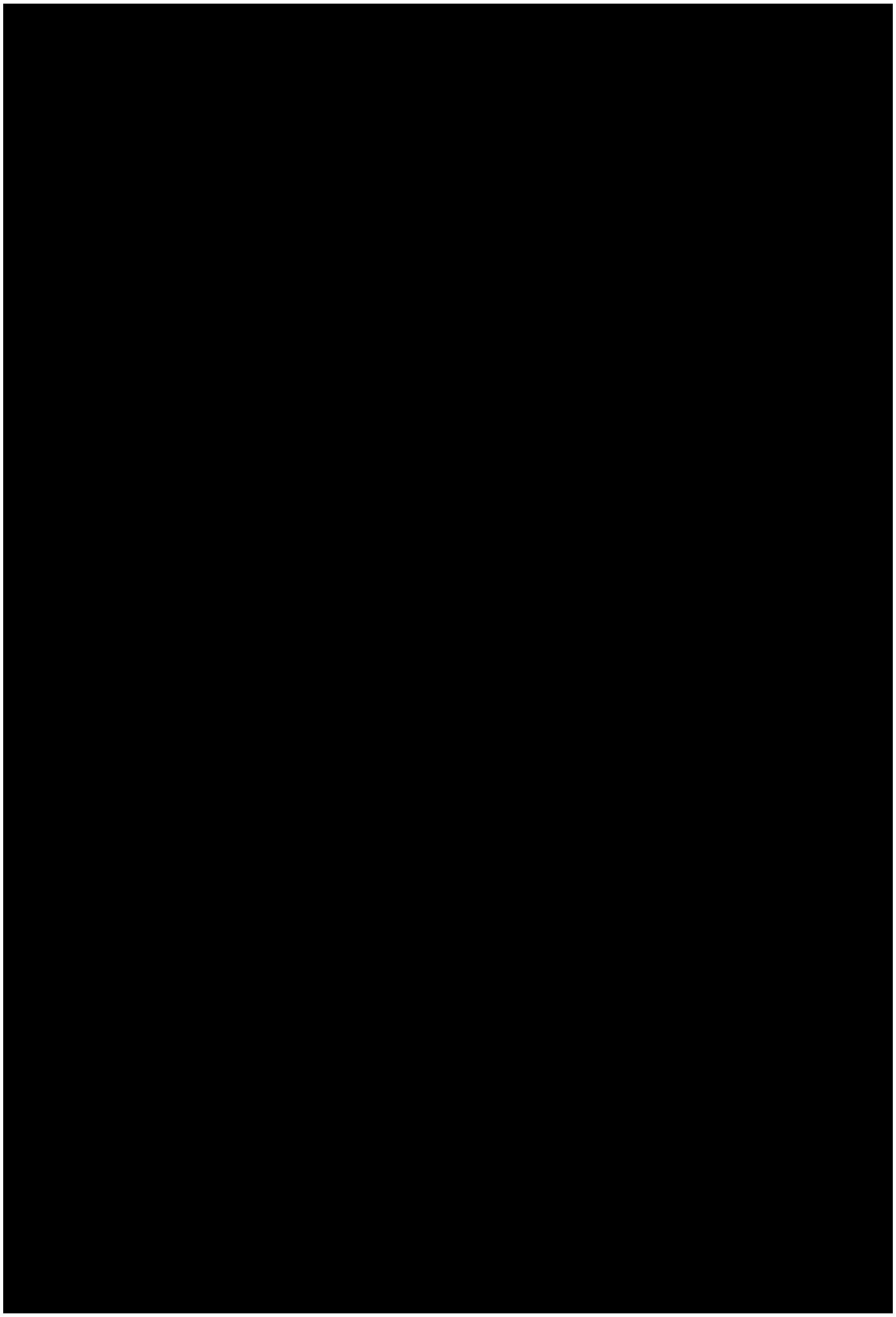

জন্মগ্রহণ করলেও তারা গাইরে মুকাল্লিদ। একইভাবে বর্তমানে আহলে হাদীসদের অধিকাংশ শায়খ হানাফী মাজহাবের মাদ্রাসায় পড়া-লেখা করেছে, কিন্তু তারা হানাফী নয়। সুতরাং কারও হানাফী হওয়াটা তার পরিবার, পিতা-মাতা বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করে না। ইবনে আবিল ইয জন্মগতভাবে হানাফী হলেও বাস্তবে সে হানাফী নয়। বরং ইবনে আবিল ইয একজন গাইরে মুকাল্লিদ বা লা-মাজহাবী।সুতরাং তাকে হানাফী হিসেবে প্রচার করে তাকে হানাফী মাজহাব বা আকিদার প্রতিনিধি হিসেবে প্রকাশ করা একটি মারাত্মক ভুল।

যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেই যে, ইবনে আবিল ইয হানাফী ফিকহের অনুসারী ছিল, কারণ সে হানাফী মাজহাবের মাদ্রাসায় শিক্ষতা করেছে, তাহলে এটি কখনও বলা সম্ভব নয় যে, সে আকিদার দিক থেকেও হানাফী ছিলা। মু'তাজিলা সম্প্রদায়ের অনেকেই হানাফী মাজহাবের অনুসারী ছিল, কিন্তু তাদের কাউকে হানাফী বলা হয় না। একইভাবে কাররামিয়াদের অনেকেই হানাফী মাজহাব অনুসরণ করত। কিন্তু তাদেরকেও হানাফী বলা হয় না। ফিকহের দিক থেকে কেউ হানাফী ফিকহ অনুসরণ করলেই তাকে হানাফী হিসেবে পরিচয় দেয়া হয় না। কারণ হানাফী হিসেবে কারও পরিচিতি এটা প্রমাণ করে যে, সে আকিদা ও ফিকহ উভয় ক্ষেত্রে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভূক্ত। কেউ যদি ফিকহের ক্ষেত্রে হানাফী মাজহাব অনুসরণ করে, কিন্তু আকিদার ক্ষেত্রে আহলে সু্ন্নত ওয়াল জামাত বহির্ভূত আকিদা পোষণ করে তাকে হানাফী বলা হয় না। বরং আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত বহির্ভূত আকিদার দিকে তাকে সম্পৃক্ত করা হয়। কাররামিয়া মতবাদের অনুসারী কারও নামের শেষে হানাফী লাগিয়ে দিয়ে আকিদা ও ফিকহে তাকে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভূক্ত করার অপচেষ্টা কেউ করলে সেটি অবশ্যই বাস্তবতা বিরোধী। সুতরাং ফিকহ ও আকিদা উভয় ক্ষেত্রে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত বহির্ভূত ইবনে আবিল ইযকে কীভাবে হানাফী হিসেবে পরিচয় দেয়া হয়? তার বাহ্যিক অবস্থা বিবেচনা করে হানাফী লিখলেও তাকে যদি কেউ হানাফী ফিকহ বা আকিদার প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থাপন করে, তাহলে অবশ্যই আমরা বলব, প্রকৃতপক্ষে ইবনে আবিল ইয ফিকহ ও আকিদা কোন ক্ষেত্রেই হানাফী ছিল না। বরং সে কাররামিয়াদের অনুসারী হাশাবী বা দেহবাদী আকিদায় বিশ্বাসী ছিল। ইবনে আবিল ইযের যেসকল কিতাব তার দিকে সম্পৃক্ত করা হয়, তার প্রত্যেকটি সে হানাফী মাজহাবের বিরুদ্ধে লিখেছে। হানাফী মাজহাবের পক্ষে তার বিশেষ কোন খেদমত নেই।

ইবনে আবিল ইযের গাইরে মুকাল্লিদ হওয়ার আরেকটি প্রমাণ হল, তার একটি কিতাব বর্তমানের আহলে লা-মাজহাবীরা প্রচার করে থাকে। আহলে হাদীস আলেম আতাউল্লাহ হানীফ ইবনে আবিল ইযের "আল-ইত্তেবা" কিতাবটি তাহকীক করে প্রকাশ করেছে। পরবর্তীতে আবু সুহাইব আসিম ইবনে আব্দুল্লাহ আল-কারইউতী এটি তাহকীক করেছে। আবু সুহাইব এই কিতাবের ভূমিকায় হানাফী মাজহাবের বিখ্যাত আলেম আল্লামা যাহেদ আল-কাউসারী রহ. ও আল্লামা যফর আহমাদ উসমানী রহ. এর বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছে এবং এসমস্ত বিখ্যাত আলেমদের বিরুদ্ধে ইবনে

আবিল ইযের বক্তব্য উপস্থাপন করেছে। যেখানে ইবনে আবিল ইয সুনিদিষ্ট একটি মাজহাবের অনুসারীকে শিয়াদের সাথে তুলনা করেছে। নাউযুবিল্লাহ। ইবনে আবিল ইযের অবস্থা থেকে বাংলা ভাষার প্রসিদ্ধ একটি প্রবাদবাক্য মনে পড়ে গেল। "মার চেয়ে মাসির দরদ বেশি" । ইবনে আবিল ইযের প্রতি সালাফী ও আহলে হাদীসদের অতিশয় আগ্রহ এটিই প্রমাণ করে। বর্তমানের সালাফীরা হানাফী মাজহাবের উলামায়ে কেরামকে তাদের আকিদার বিরোধী হওয়ার কারণে কাফের , বিদযাতী , জাহমী , মুয়াত্তিলা ইত্যাদি আখ্যায়িত করে। এ বিষয়ে অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। হানাফী মাজহাবের অধিকাংশ আলেম যাদের কাছে কাফের ও বিদয়াতী, তারাই ইবনে আবিল ইযের আকিদা প্রচার করছে। আবার উপমহাদেশের লা-মাজহাবীরা মাজহাবের অনুসারীদেরকে মুশরিক বলে বিশ্বাস করে, অথচ তারাই আবার ইবনে আবিল ইযের কিতাব প্রকাশ ও প্রচার করছে। ইবনে আবিল ইয আসলেই যদি হানাফী হত, তাহলে হানাফীদেরকে যারা কাফের-মুশরিক আখ্যা দিচ্ছে, তারা কেন তার কিতাব নিয়ে এত মাতামাতি করে?

ইবনে আবিল ইয সম্পর্কে হানাফী মাজহাবের বিখ্যাত আলেমগণের বক্তব্য :

মোল্লা আলী কারী রহ. এর বক্তব্য :

মোল্লা আলী কারী রহ. শরহে ফিকহুল আকবারে আকিদাতুত ত্বাহাবীর ব্যাখ্যাকার সম্পর্কে লিখেছেন ,

والحاصل ان الشارح يقول بعلو المكان مع نفي التشبيه وتبع فيه طائفة من أهل البدعة

মোটকথা, আকিদাতুত ত্বাহাবীর ব্যাখ্যাকার তাশবীহমুক্ত অবস্থায় আল্লাহ তায়ালা স্থানগতভাবে উপরের দিকে রয়েছেন বলে বিশ্বাস করে। এক্ষেত্রে সে একদল বিদয়াতীর অনুসরণ করেছে। তিনি আরও বলেন ,

و من الغريب أنه إستدل على مذهبه الباطل برفع الأيدي في الدعاء إلى السماء

অর্থ : আশ্চর্যের বিষয় হল, সে তার ভ্রান্ত মতবাদ প্রমাণ করতে গিয়ে দুয়ার সময় হাত উপরের দিকে উঠানোর দলিল দিয়েছে। (শরহুল ফিকহিল আকবার, পৃ .১৭২. আল-ইলিময়া)মোল্লা আলী

কারী রহ . এর বক্তব্য থেকে দু 'টি বিষয় স্পষ্ট। তিনি ইবনে আবিল ইযকে বিদয়াতীদের অনুসারী বলেছেন। এবং তার মতবাদকে বাতিল বা ভ্রান্ত মতবাদ আখ্যায়িত করেছেন।

আল্লামা মোর্তজা যাবিদি রহ . এর বক্তব্য :

আল্লামা মোর্তজা যাবিদি রহ . ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিনে ইবনে আবিল ইয সম্পর্কে লিখেছেন ,

"ولما تأملته حق التأمل؛ وجدته كلامًا مخالفًا لأصول مذهب إمامه!! وهو في الحقيقة كالرد على أئمة السنة، كأنه تكلم بلسان المخالفين، وجازف وتجاوز عن الحدود، حتى شبه قول أهل السنة بقول النصارى! فليتنبه لذلك".

অর্থ : আমি তার (ইবনে আবিল ইযের) বক্তব্য সম্পর্কে পরিপূর্ণ চিন্তা -ভাবনা করে দেখেছি , তার বক্তব্য তার ইমামের মাজহাবের মৌলিক নীতিমালার সম্পূর্ণ বিরোধী। বরং প্রকৃতপক্ষে তার বক্তব্য যেন আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের ইমামগণের বক্তব্য খন্ডনে লিখিত। তার বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় , সে যেন আহলে সুন্নতের ইমামগণের সাথে প্রতিপক্ষ হিসেবে কথা বলেছে। সে মারাত্মক বিকৃতির শিকার হয়েছে এবং সীমা অতিক্রম করেছে। এমনকি সে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের ইমামগণের বক্তব্যকে খ্রিষ্টানদের বক্তব্যের সাথে তুলনা করেছে। সুতরাং এ বিষয় সতর্ক থেক। [ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন , খ.২, পৃ .১৪৬]

আল্লামা মোর্তজা যাবিদি রহ . এর বক্তব্য থেকে যেসকল বিষয় স্পষ্ট :

১. ইবনে আবিল ইয হানাফী মাজহাবের মৌলিক নীতিমালা অনুসরণ করত না।

২. তার লেখনী মূলত : হানাফী মাজহাব ও আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের বক্তব্য খন্ডনের উদ্দেশ্যে লিখিত।৩ . হানাফী মাজহাব ও আহলে সুন্নতের উলামায়ে কেরামের সাথে যেন সে প্রতিপক্ষ হিসেবে কথা বলেছে।

৪.সে মারাত্মক প্রগলভতার শিকার হয়ে সীমা অতিক্রম করেছে।

৫. আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের উলামায়ে কেরামের বক্তব্যকে খ্রিষ্টানদের বক্তব্যের সাথে তুলনা করেছে।

৬. আল্লামা যাবিদি রহ . তার এসব বক্তব্যের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে বলেছেন।

আল্লামা যাহেদ আল -কাউসারী রহ . এর বক্তব্য :

হানাফী মাজহাবের বিখ্যাত ইমাম আল্লামা যাহেদ আল -কাউসারী রহ . আকিদাতুত ত্বহাবীর ব্যাখ্যাকার সম্পর্কে বলেন ,

وطبع شرح لمجهول ينسب إلى المذهب الحنفي زورا ينادي صنع يده بأنه جاهل بهذا الفن وأنه حشوي مختل العيار

"আকিদাতুত ত্বহাবীর ব্যাখ্যা হিসেবে একজন অজ্ঞাত ব্যক্তির একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। যাকে বানোয়াটী করে হানাফী মাজহাবের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এ লোকের লেখনী দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করে যে সে আকিদা সম্পর্কে অজ্ঞ। সে একজন হাশাবী বা দেহবাদী এবং মারাত্মক বিচ্যুতির শিকার। "[আল-হাবী ফি সিরাতিল ইমামিত ত্বহাবী , পৃ . ৩৮]আল্লামা যাহেদ আল -কাউসারী রহ . এর বক্তব্য থেকে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট। প্রথমত : ইবনে আবিল ইযকে হানাফী মাজহাবের দিকে সম্পৃক্ত করা একটি বানোয়াট বা মিথ্যা। বাস্তবে সে হানাফী ছিল না। দ্বিতীয়ত : ইবনে আবিল ইয আকিদা বিষয়ে জাহেল বা অজ্ঞ ছিল এবং সে একজন মুজাসসিমা বা দেহবাদী আকিদার অনুসারী হাশাবী ছিল। আল্লামা যাহেদ আল -কাউসারী রহ . এর বক্তব্য অনুযায়ী আমরা ইবনে আবিল ইযকে হানাফী না বলে দেহবাদী আকিদার অনুসারী হাশাবী বলতে পারি।

ইবনে আবিল ইযের সম-সাময়িক আলেমগণের বিরোধীতা :ইবনে আবিল ইযের ভ্রান্ত কিছু বক্তব্য প্রকাশিত হওয়ার তখনকার বিখ্যাত আলেমগণ তার প্রতিবাদ করেন। বিশেষভাবে অন্যান্য তিন মাজহাবের বিখ্যাত আলেমগণের সাথে হানাফী মাজহাবের আলেমগণও তার প্রতিবাদ করেন।

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রহ . তার 'ইম্বাউল গুমর বি আবনায়িল উমর ' কিতাবে লিখেছেন ,

وأن العلماء بالديار المصرية خصوصا أهل مذهبة من الحنفية أنكرواذلك عليه

অর্থ : মিশরের আলেমগণ বিশেষভাবে তার মাজহাব তথা হানাফী মাজহাবের উলামায়ে কেরাম তার বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন। [ইমবাউল গুমর , খ.২, পৃ .৯৬]

যেসব উলামায়ে কেরাম ইবনে আবিল ইযের বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন , এদের মাঝে বিখ্যাত কিছু আলেমের নাম উল্লেখ করেছেন ইবনে হাজার আসকালানী রহ .। যেমন , যাইনুদ্দীন ইবনে রজব রহ, তকীউদ্দীন ইবনে মুফলিহ রহ . শরফুদ্দীন ইবনে গাজ্জী রহ . ।

বর্তমানে সালাফীরা ইবনে আবিল ইযের আরেকটি কিতাব প্রকাশ করেছে। কিতাবের নাম হল , আত-তাম্বীহ আলা মুশকিলাতিল হিদায়াহ। সালাফী আলেমরা ইবনে আবিল ইযের রচনা হিসেবে এটি প্রকাশ করেছে। যদিও কিতাবটি ইবনে আবিল ইযের নাকি তার দাদার এটি নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। সালাফীদের বক্তব্য অনুযায়ী কিতাবটি যদি ইবনে আবিল ইযের হয় , তাহলে তার সম্পর্কে হানাফী মাজহাবের আরও কিছু উলামায়ে কেরামের বক্তব্য শুনুন।

ইমাম সাখাবী রহ . তার আজ-জাওউল লামে কিতাবে লিখেছেন , হানাফী মাজহাবের বিখ্যাত ইমাম কাসেম ইবনে কুতলুবুগা ইবনে হেদায়া কিতাবের উপর ইবনুল ইযের অভিযোগ খন্ডন করে কিতাব লিখেছেন । ”صنّف "أجوبةً عن اعتراضات ابن العزّ على الهداية"[আজ-জাওউল লামে, খ.৬, [illegible].১৮৭]

সালাফীরা ইবনে আবিল ইযের উক্ত কিতাবকে হেদায়ার ব্যাখ্যা হিসেবে প্রচারের চেষ্টা করলেও এটি মূলত: হেদায়া কিতাবের উপর তার অভিযোগ সংকলন। একারণে আল্লামা কাসেম ইবনে কুতলুবুগা তার অভিযোগ খন্ডন করেছেন। একইভাবে আল -বাহরুর রায়েকে রয়েছে ফাতহুল কাদীরে আল্লামা ইবনুল হুমাম ইবনুল ইযের বক্তব্য খন্ডন করেছেন।

وَقَدْ أَطَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ فِي بَيَانِهِ إطَالَةً حَسَنَةً وَتَعَرَّضَ لِلرَّدِّ عَلَى ابْنِ الْعِزِّ، وَلَسْنَا بِصَدَدِ ذَلِكَ

[আল-বাহরুর রায়েক , বাবুল ইয়ামীন ফিল আকলি ওয়াশ শুরব]

সালাফীদের বক্তব্য অনুযায়ী আত -তাম্বীহ আলা শরহিল হেদায়া কিতাবটি যদি আকিদাতুত ত্বহাবীর ব্যাখ্যাকার ইবনে আবিল ইযের হয় , তাহলে তার বক্তব্য আল্লামা হাসকাফী ও আল্লামা ইবনে আবিদীন খন্ডন করেছেন। তার বক্তব্যকে গরীব (আশ্চর্যজনক) আখ্যা দিয়েছেন। বিস্তারিত ,

"قال (ابن العز!): فحينئذ ينقض الوضوء، وهو فرع غريب وتخريج ظاهر.قال المصنف: ولظهوره عوّلنا عليه.قلت: قال شيخنا الرملي حفظه الله تعالى: كيف يعول عليه وهو مع غرابته لا يشهد له رواية ولا دراية، أما الاولى فظاهر إذا لم يرو عن أحد ممن يعتمد عليه، وأما الثانية فلعدم تسليم المقدمة الاولى ويشهد لبطلانها مسألة الجدي إذا غذي بلبن الخنزير فقد عللوا حل أكله بصيرورته مستهلكا لا يبقى له أثر، فكذلك نقول في عرق مدمن الخمر، ويكفينا في ضعفه غرابته".[□□□□□□ মুহতার , খ.৬, পৃ .১৪৬-১৪৭]

আকিদার ক্ষেত্রে ইবনে আবিল ইযের বিচ্যুতি সুস্পষ্ট। অধিকাংশ বিষয়ে সে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত বহির্ভূত আকিদা পোষণ করে। এবং কাররামিয়া ও মুজাসসিমাদের ভ্রান্ত বক্তব্য প্রচার করেছে। আকিদাতুত ত্বহাবীর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ভিডিও আকারে প্রকাশের নিয়ত রয়েছে। আমাদের আলোচনায় ইবনে আবিল ইযের ভ্রান্ত মতবাদগুলি বিস্তারিত উল্লেখ করা হবে ইনশাআল্লাহ। এখানে সংক্ষেপে দু 'একটি বিষয় উল্লেখ করা মুনাসিব মনে করছি। এসকল বিষয়ের কয়েকটি কুফুরী পর্যায়ের। আল্লাহ আমাদের হেফাজত করেন।

১. কিছু সৃষ্টি কাদীম বা অবিনশ্বর। অনাদী থেকেই বিদ্যমান। এটি তাসালসুলুল হাওয়াদিস নামে পরিচিত। [শরহু আকিদাতিত ত্বহাবী , পৃ .১২৯, আল-মাকতাবাতুল ইসলামী , অষ্টম সংস্করণ]

২. আল্লাহ তায়ালার হদ বা সীমা রয়েছে। [শরহু আকিদাতিত ত্বহাবী , পৃ .২১৯, আল-মাকতাবাতুল ইসলামী , অষ্টম সংস্করণ]

৩. আল্লাহর সত্তার মাঝে নশ্বর বিষয় সৃষ্টি হয়। [শরহু আকিদাতিত ত্বহাবী , পৃ .১৭৭, আল-মাকতাবাতুল ইসলামী , অষ্টম সংস্করণ]

৪. আল্লাহর বক্তব্যের অক্ষর ও শব্দ রয়েছে। [শরহু আকিদাতিত ত্বহাবী , পৃ .১৬৯, আল-মাকতাবাতুল ইসলামী , অষ্টম সংস্করণ]

৫. আল্লাহ তায়ালা স্থানগতভাবে উপরের দিকে রয়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহর দিক রয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে দেহবাদী আকিদার ভ্রান্তি থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

শরয়ী আইনের উপযোগিতা (পর্ব -১)

5 March 2015 at 09:14

[২০১১ তে এটি লিখেছিলাম। নতুন আঙ্গিকে লেখার প্রয়োজন ছিল। সুযোগ হলে ইনশাআল্লাহ লিখব]

আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে নবী -রাসূলের মাধ্যমে পৃথিবীতে শাশ্বত বিধান অবতীর্ণ করেছেন। নবী রাসূলগণ ঐশীবাণী প্রাপ্ত হয়ে মানুষকে সৃষ্টির দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে স্রষ্টার দাসত্বের প্রতি আহ্বান করেছে। সবধসরণের অন্যায় , পাপাচার , জুলুম -নির্যাত ও গর্হিত কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখার চেষ্টা করেছেন। মানব সমাজকে ধ্বংস ও অবক্ষয় থেকে বাঁচিয়ে সুস্থ , সুন্দর ও স্থিতিশীল করতে তারা সর্বদা প্রয়াসী ছিলেন। সমাজ ও মানবতার শত্রু , সুবিধাভোগী শ্রেণী তাদের পাপাচার , জুলুম ও নির্যাতন ও সীমাহীন ভোগ -বিলাসিতাকে জিইয়ে রাখতে এই সত্য আহ্বানের বিরোধীতা করেছে। এটি একটি চিরন্তন সত্য বিষয়। সকল নবীর সাথেই এমনটি ঘটেছে।কিন্তু তাদের এ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সত্য টিকে আছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। যুগে যুগে ইসলামকে ধ্বংসের জন্য নানামুখী ষড়যন্ত্রের জাল বিছানো হয়েছে। কিন্তু সকল প্রতিকূলতা অতিক্রম করে , হাজার জুলুম -নির্যাতনের মুখে মুসলিম জাতি মাথা উঁচু করে তাদের স্বকীয়তা বজায় রেখেছে।

ইসলামের বিরুদ্ধে কুফুরী শক্তির এ ব্যর্থ চেষ্টা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের সূরা সাফ-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন ,

يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون

অর্থ: তারা আল্লাহর আলোকে তাদের মুখের ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তার নুরকে পূর্ণতা দান করবেন, যদিও কাফেররা তা ঘৃণা করে।সূরা সাফ, আয়াত নং৮ইসলামের বিরুদ্ধে নানামুখী ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে ইসলাম মধ্যযুগীয়, বর্বর, সন্ত্রাসী, গোঁড়া ইত্যাদি বিকৃত বিশেষণ ব্যবহার করে তারা তাদের আক্রোশ প্রকাশ করে থাকে।বিজ্ঞানের এই উৎকর্ষতার যুগে চৌদ্দশ বছরের ইসলাম অচল, ইত্যকার অভিযোগ তারা সর্বদাই করে থাকে। এগুলো হলো, ইসলামকে হেয় করার প্রকাশ্য কিছু পদ্ধতি।

বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে ইসলামকে হেয় করার জন্য যুগে যুগে পবিত্র কুরআনের ভুল, কুরআনী আইন বর্বর, কুরআন বিজ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক ইত্যাদি মিথ্যাচার করে থাকে। কিন্তু পবিত্র কুরআনের ক্ষেত্রে তাদের এই মিথ্যাচারের সর্বসাধারণের নিকট স্পষ্ট থাকায়, তারা এ পথে তেমন সফলকাম হতে পারেনি। ইসলামের বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক এই আক্রমণের জন্য তারা কিছু অমুসলিম ও নামধারী মুসলিমকে ইসলাম নিয়ে গবেষণার পিছে লাগিয়েছে। এদের মূল কাজ ছিলো, বিভিন্ন মিথ্যাচারের মাধ্যমে জনমনে ইসলামের বিরুদ্ধে সংশয় সৃষ্টি করা। এই শ্রেণী ওরিয়েন্টালিস্ট হিসেবে পরিচিত। আরবীতে এদরেকে মুসতাশরিক এবং বহুবচনে মুসতাশকিুন বলে। বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণের এদের মূল হাতিয়ার হলো ইসলামের উপর মিথ্যাচার। জ্ঞানপাপী এই শ্রেণীর ষড়যন্ত্র যুগে যুগে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে।এদের সূচনা মূলত: ইহুদী জন্মা আব্দুল্লাহ বিন সাবার দ্বারা সূচনা হয়েছে। মন-মানসে সম্পূর্ণ ইহুদী থেকেও সে নিজেকে মুসলিম হিসেবে প্রকাশ করে মুসলমানদের মারাত্মক ক্ষতি করেছে। উপর্যুক্ত সূরা সাফের আয়াত অনুযায়ী বর্তমানেও কুফূরী শক্তি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ইসলামকে আক্রমণ করে যাচ্ছে। একের পর এক নানা অজুহাতে ইসলামী রাষ্ট্রগুলোকে ধ্বংস করে চলেছে।মুসলমানদেরকে নাম সর্বস্ব একটি জাতিতে পরিণত করতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে মুসলমানদের উপর নিপীড়ন চালিয়ে তাদের সবকছিু ধ্বংস করেছে। এই শতাব্দীতে মুসলমানদের অস্তিত্বের লড়াই চলছে।আমাদের প্রশ্ন হলো, ইসলাম এমন কি অপরাধ করেছে, যার কারণে সকলের আক্রমণের শিকার?ইসলাম মানুষকে সত্যের আহ্বান করেছে, মানুষকে ন্যায়-ইনসাফের কথা বলেছে, অন্যায় থেকে বেঁচে থাকতে বলেছে, এটা এমনকি অপরাধ? হ্যাঁ, ইসলাম আপনাকে যথেচ্ছা যৌন নিপীড়ন, ধর্ষণ থেকে নিষেধ করেছে, সেটা বুঝি আপনার রুচি-বিরুদ্ধ বলেই ইসলামের বিরুদ্ধে এতো আক্রোশ?এই পৃথিবীতে জাতি হিসেবে তো শুধু মুসলমানরা বসবাস করে না? তবে, ইসলাম কেন সকলের চোখের কাটা?নীতি-নৈতিকতার কথা বললে এতটাই অপরাধ হয়,তবে আমরা কিভাবে বলব যে, আমরা মানুষের সমাজে বাস করছি।

অনেকের বক্তব্য হল ইসলাম প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা প্রদান করে নি এবং মানবাধিকারের আধুনিক ধ্যান-ধারণার সাথে তার মিলিয়ে চলতে অক্ষম। এটি একটি ইসলাম সম্পর্কে অন্যতম

প্রপাগান্ডা। প্রত্যেক মুসলিম এটা বিশ্বাস করে যে, ইসলামী আইন পূর্ণাঙ্গ এবং জীবনের প্রতিটি স্তরে সুসঙ্গতভাবে প্রযোজ্য। সর্ব যুগে, সর্ববস্থায় পৃথিবীর যে কোন প্রান্তো প্রযোজ্য। যে কোন যুগের যে কোন আবেদন ইসলাম পরিপূর্ণভাবে পালন করতে সক্ষম। পাঠকের কাছে প্রশ্ন করছি, আমরা জানি, স্বাধীন দেশের নাগরিকরা স্বাধীন। তাদের এই স্বাধীনতার অর্থ কি? তারা স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক সুতরাং তারা স্বাধীনভাবে যা খুশি তাই করতে পারবে? হত্যা,খুন,লুণ্ঠন,ধর্ষণ সব কিছুই করতে পারবে ? তবে পৃথিবীতে এমন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বর্তমানে আছে,অতীতে ছিল বা ভবিষ্যতে থাকবে এমন কোন রেকর্ড মানব ইতিহাসে নেই। নেই কেন? তারা তো স্বাধীন?

হয়ত আপনি বলবেন, স্বাধীন হওয়া অর্থ এই নয় যে, যা খুশি তাই করবে। অন্য একজন স্বাধীন নাগরিকের অধিকারে হস্তক্ষেপ করবে। স্বাধীন নাগরিকের স্বাধীনতা যদি এতটা উদার এবং শর্তহীন না হয় তবে আমরা কেন অন্যান্য ক্ষেত্রে শর্তহীন স্বাধীনতার কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করি । মুক্ত চিন্তার স্বাধীনতা, নারী স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়ে এসে আমরা এতটা উদার হয়ে পড়ি কেন? তাদের স্বাধীনতা কি একেবারে শর্তহীন। একজন চিন্তাবিদ, দার্শনিক, লেখক যা ইচ্ছা তাই লিখতে পারবেন? এক্ষেত্রে কেন আমরা অন্য একজন স্বাধীন নাগরিকের স্বাধীনতা খর্ব করার অধিকার আরেকজনকে দিচ্ছি? পশ্চিমা বিশ্বের সবচেয়ে বড় সাফল্য এই যে তারা তাদের মতবাদগুলো খুব আবেদনময় ও মানবতার রক্ষাকবচ হিসাবে উপস্থাপন করে। কিন্ত তাদের মতবাদের বাস্তবতা বড় করুণ। যেমন ধরুণ, পশ্চিমা বিশ্ব মানব প্রকৃতি (Human Nature) কে শ্রদ্ধার কথা বলে। বিষয়টি সর্বজন স্বীকৃত। মানব প্রকৃতি ও চাহিদাকে শ্রদ্ধা করা উচিৎ। কিন্ত তাদের এ মতবাদের ব্যখ্যাটা মজাদার । যেহেতু মানব প্রকৃতির চাহিদা হল, যৌন তৃপ্তি অর্জন করা আর এ জন্য তারা সমকামিতা বৈধ করেছে। তাদের ইচ্ছানুযায়ী সন্তান নেওয়ার অধিকারটাও চমৎকার । প্রথমে আপনাকে বোঝান হবে যে, বেশি সন্তান হলে মা ও শিশুর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়বে,তাদের লালন পালনে সমস্যা হবে । পৃথিবীতে জন সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে,খাদের অভাব দেখা দিবে........এ বিষয় গুলি স্পষ্ট । কিন্তু এর পর আপনা কে বলবে এজন্য আপনাকে যথেচ্ছা সন্তান নেওয়ার অধিকার থাকা কর্তব্য । আর এ জন্যই আপনি আপনার সন্তানের জন্মের ৩০ সেকেন্ড পূর্বেও তাকে মেরে ফেলতে পারবেন!যাই হোক, ইসলাম স্বাধীনতার নামে সেই সমস্ত বর্বরতাকে কখনই সমর্থন করে না, যার যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে বস্তুবাদী সমাজ ধ্বংসের দ্বার প্রান্তো উপনীত। ইসলাম সেই স্বাধীনতাকে কখনই অনুমোদন করে না, যার কারণে মানব সমাজ পশুত্বের স্তরে নেমে যাবে। একটা রাষ্ট্র তার প্রতিটি স্তরে ভারসাম্য রক্ষার জন্য হত্যা,লুণ্ঠন, চুরি,ধর্ষণ,মাদক ইত্যাদির স্বাধীনতা প্রদান করে না। পশ্চিমা বিশ্বেও এগুলোর প্রতিফলন দেখা যায়। পশ্চিমা বিশ্বের সেসব রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ করা উচিৎ । তারা কেন স্বাধীন নাগরিকের অধিকার হরণ করছে?

অমুসলিম এবং প্রাচ্যবিদদের আরেকটি প্রপাগান্ডা হল, ইসলাম আধুনিক যুগে অচল।ইসলাম আমাদের কে মধ্যযুগে নিয়ে যেতে চাই।মধ্যযুগের বর্বরতার পুনরাবৃত্তি করতে চাই .... এবার আসুন এ প্রশ্নের যথার্থতা নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক । পৃথিবীতে বতমানে মানুষ আছে প্রায় সাড়ে ছয়শত থেকে সাত শত কোটি। (৬.৫-৭ বিলিয়ন) এর মধ্যে বিভিন্ন ধমের্ বিশ্বাস করে ৮৬% মানুষ। পৃথিবীতে প্রধান প্রধান ধর্ম হল, ইসলাম, খ্রিষ্টান, ইহুদী,হিন্দু বৌদ্ধ ইত্যাদি। এবার নিচের তালিকাটি লক্ষ্য করুণ,

প্রধান ধর্মসমূহের উৎপত্তি ও ধর্মানুসারীদের সংখ্যা:

খ্রিষ্টান: বর্তমান সংখ্যা বর্তমান সংখ্যা ১.৯-২.১ বিলিয়ন

ইসলাম: ৬১০ খ্রিষ্টাব্দ, বর্তমান সংখ্যা ১.৫৭ বিলিয়ন

ইহুদী ধর্ম: উৎপত্তি, খ্রিষ্টপূর্ব ১৩০০ বছর, বর্তমান সংখ্যা, ১৪ মিলিয়ন

হিন্দু ধর্ম: খ্রিষ্টপূর্ব ১৭০০-১১০০(প্রায়) বর্তমান সংখ্যা ৯০০ মিলিয়ন

বৌদ্ধ ধর্ম: খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০ বছর বর্তমান সংখ্যা৩৬০ মিলিয়ন

প্রধান প্রধান ধর্মের উৎপত্তির দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, সর্বাধুনিক এবং সর্বশেষ ধর্ম হল ইসলাম। ইহুদী, বৌদ্ধ এবং হিন্দু ধর্ম যিশু খ্রিষ্টের জন্মের ৫০০-১০০০ বৎসর পূর্বের । একমাত্র ইসলাম ধর্মের উৎপ ত্তি ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে। সুতরাং পৃথিবীর অন্ততঃ ৮৬% মানুষকে মেনে নিতে হবে যে ইসলাম ধর্ম সর্বাধুনিক। বাকী ১৪% এর ১১.৯% অজ্ঞেয় বাদী (agnostic) এবং কোন ধর্ম মেনে চলে না। অবশিষ্ট ২.৩% ধর্ম বিরোধী এবং নাস্তিক । আর যারা বস্তবাদকে আকড়ে ধরে নিজেদেরকে আধুনিক হিসাবে পেশ করার চেষ্টা করছে,বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থ পাঠ করলে দেখা যায়, এমন বিশ্বাস প্রাচীন মানুষদেরও ছিল। মদ খেয়ে মাতলামি আর ধর্ষণকে যদি আধুনিকতা বলি,তবে এ আধুনিকতা প্রাচীন কালের মানুষগুলো বর্তমানের চেয়ে ভালভাবে লালন পালন করেছে ।তাদের হাজার বৎসরের মদ রাখার ঐতিহ্য ছিল। আর যদি নগ্নতা আর বেহায়াপনাকে আধুনিকতা বলি, তবে প্রাচীন গুহাবাসী

মানুষের পাথর খোদায়ের শিল্প এবং যুগে যুগে নগ্ন নারী –পুরুষদের যেভাবে শৈল্পিক বিকাশ ঘটেছিল ,তা দেখে আজকের মানুষও হতবাক। সুতরাং বস্তুবাদের মোহনীয় চক্রে ঘুরপাক খেয়ে আজকের মানুষ যতই সে আধুনিকতার দাবী করছে ,ততই সে জাহিলিয়্যাতের করাল গ্রাসে বন্দী হচ্ছে। আজকের সবচেয়ে আধুনিক ,সবচেয়ে বড় নাস্তিক যেসমস্ত কথা বলে , প্রতিটি কথা আপনি খুজে দেখুন ধর্মগ্রন্থগুলো বিশেষভাবে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইসলামের বাণী শাশ্বত ,চিরন্তান এবং সার্বজনীন। এটা যেমন বিশ্বের যে কোন প্রান্তো যে কোন জাতির জন্য সর্বযুগে সমভাবে প্রযোজ্য। এটা কোন নির্দিষ্ট গোত্র বা বংশের জন্য নয়। খ্রিষ্টানরা সার্বজনীনতার দাবী করলেও যিশু খ্রিষ্ট বলেছেন ,“I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. “To these twelve, Jesus sent forth, and commanded them, saying, go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter not. But go rather to the lost sheep of the house of Israel

অথচ রাসূল (স) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বানী , و ما ارسلناك الا رحمة للعالمين ২১:১০৭ আমি সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য তোমাকে রহমত স্বর ”প প্রেরণ করেছি।

ইসলামী শরিয়াহ বা আইনের দুটি দিক রয়েছে ,ক. যে সমস্ত বিধান বিশ্বাস এবং ইবাদাতের সাথে সম্পর্কিত । যেগুলো কোন যুগেই পরিবর্তন হবে না। কোন স্থানের পরিবর্র্তনেও যে বিধানে কোন শিথিলতা আসে না । যেমন , নামায ,যাকাত ,হজ্ব ইত্যাদিখ . যে সমস্ত বিধান ইসলামী আইন বা বিচার ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত। এ ক্ষেত্রে একজন মানুষ তার সমাজের সাথে ,তার অধীনস্থ মানুষের সাথে কিভাবে আচরণ করবে তার স্বর ”প বিশ্লেষণ করা হয়। এ সমস্ত বিধান যুগের চাহিদা অনুযায়ী পরিবর্তিত -পরিবর্ধিত হতে পারে। এ পরিবর্তন পরিবর্ধন ইসলামী আইন শাস্ত্রে পারদর্শী ,কেবল তারাই ইসলামী শরিয়ার মৌলিক উদ্দেশ্য সুচারুরূপে বুঝে তার আলোকে সিদ্ধান্তা পেশ করবে।

উদাহরণ হিসাবে বলা যায় , কুরআনে মৌলিকভাবে বলা হয়েছে ,

شاورهم في الامر....وامرهم شورى بينهم

হে আল্লাহর রাসূল , বিভিন্ন বিষয়ে আপনি সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শ করুন। অন্য আয়াতে রয়েছে , তারা নিজেদের মাঝে পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

এখানে শুধু মূলনীতি বলা হয়েছে । রাসূল (সঃ) এর হাদীসেও এধরনের নির্দেশনা রয়েছে। অতএব ইসলামী স্কোলারদের এ অধিকার আছে যে , তারা ইসলামের গন্ডির ভিতর থেকে যে কোন যুগে 'শুরা 'র বিবিন্ন রূপ দিতে পারবে।এভাবে অসংখ্য বিধান রয়েছে , যেগুলো ইসলামের মূলনীতি থেকে আহরিত। কুরআন-সুন্নাহে বর্ণিত মূলনীতিগুলো কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল সমস্যার সমাধানের জন্য যথেষ্ট। ইসলামী আইন বা ফিকহে পারদর্শী আলেমগণ এ বিষয়ে প্রত্যেক যুগে প্রয়োজনীয় সমাধান দিয়েছেন। মূলনীতি থেকে শাখাগত মাসআলা আহরণ করেছন। সুতরাং ইসলামকে স্থবির বলার অর্থ ইসলাম সম্পর্কে নিজের মহা অজ্ঞতার বহি :প্রকাশ।

২. দ্বিতীয় ভুল ধারণাঃ অনেক স্কোলার ,বুদ্ধিজীবি এবং প্রাচ্যবিদদের প্রচারণা হল , ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিমদের কোন মর্যাদা ইসলাম প্রদান করে না।ইসলাম সম্পর্কে স্বল্প জ্ঞানের কারণে এ ধরনের ধারণার উৎপত্তি। নতুবা চৌদ্দশত বৎসরের ইতিহাস সাক্ষী , বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত কীভাবে ইসলাম তার শৌর্য -বীর্য বজায় রেখে চলেছে। আজকের উপমহাদেশের হিন্দুরা মুহাম্মদ বিন কাসেমের সেনা অভিযানের পর শেষ মুঘল সম্রাটের পতন পর্যন্ত মুসলিম শাসনের অধীনে ছিল । আরব বিশ্বকে মুসলিমরা চৌদ্দশত বৎসর ধরে শাসন করছে। আরবে ১৪ মিলিয়ন খ্রিষ্টান এমন রয়েছে , যারা ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব থেকেই আরব বিশ্বে বসবাস করে আসছে। চৌদ্দশত বছর ইসলামী শাসনের অধীনে তারা ছিল। স্পেনে মুসলিমরা ৮০০ বছর শাসন করেছে ।এখন বলুন , ইসলাম যদি অমুসলিমদের অধিকার খর্ব করে থাকে ,তাদেরকে সঠিক মর্যাদা প্রদান না করে থাকে , তাহলে তো ইতিহাস স্পেনের ইতিহাসের মত হত । আটশত বৎসর ইসলামী শাসনের পর ক্রুসেডাররাএসে গোটা স্পেনে এমন ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে ,একজন মুসলিম আযান দিয়ে নামায আদায় করার মত অবস্থা রাখে নি। সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও শাসনের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। নাস্তিকতা প্রতিষ্ঠার জন্য যে পরিমাণ মানুষ হত্যা করা হয়েছে , পুরো মানব জাতির ইতিহাসে আস্তিকতার জন্য এত মানুষ নিহত হয়েছে কি না সন্দেহ । ইতিহাস মিথ্যা বলে না। চৌদ্দশ ' বছরের ইতিহাস মিথ্যা বলবে সেটাও অকল্পনীয়।ইসলাম কখনও অমুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করেনি। মদিনা সনদে যেভাবে অমুসলিমদেরকে তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছিল এভাবে কিয়ামত পযন্ত দেয়া হবে।

পবিত্র কুরআনের ঘোষণা ,

لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدىن و لم يخرجوكم من دياركم ان تبرُّوهم و تقسطوا اليهم ،ان الله يحب المقسطىن (৬০:৮) অর্থঃ ধর্মের ব্যপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিস্কার করেনি তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ

তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালবাসেন ।পরের আয়াতে ,বলেছেন

انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين و اخرجوكم من دياركم و ظاهروا على اخراجكم ان تولوهم،ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون

আল্লাহ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন , যারা ধর্মের ব্যপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে , তোমাদের বসতি থেকে তোমাদেরকে বহিস্কার করেছে অথবা বহিস্কারে সহায়তা করেছে। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে তারাই জালেম।

সুতরাং মুসলিম এবং অমুসলিমদের মধ্যে সাধারণ অবস্থায় অবশ্যই উত্তম আচরণ করতে হবে। কিন্তু কোন অমুসলিম যতি দেশ ও জাতির সাথে গাদ্দারি করার চেষ্টা করে , নিরপরাধ মানুষের অধিকার খর্ব করে তবে অবশ্যই তাকে তার শাস্তি পেতে হবে। এ বিধান মুসলিম অমুসলিম সকল দেশেই সমান।আর অমুসলিমদের সাথে যে কোন ধরণের বৈধ লেন -দেন করা যাবে। চাই সে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করুক কিংবা অমুসলিম রাষ্ট্রে। একজন মুসলমান ইহুদী এবং খ্রিষ্টানদের খাবার খেতে পারবে [মূল খাদ্য যদি হালাল হয়]। এভাবে ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদেরকে তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। বিষয়টি যদি এর উল্টো হত , ভারত উপমহাদেশে একটি মন্দির থাকত না। এসকল ধ্রুব সত্যকে যারা অভিযুক্ত করার অপচেষ্টা করে, তাদের মাঝে আর চামচিকার মাঝে তফাৎ কোথায়। চামচিকার কারণে কখনও সূর্য উঠা বন্ধ হয় না। সূর্য তার আলো দিয়ে -ই যায়। একইভাবে ইসলামও তার আলো বিকশিত করেছে। মানবতার সেবা করেছে। বস্তুপূজারীদের হাক -ডাকে ইসলামের আলো কখনও ম্লান হবে না।

ইসলামী দন্ডবিধি ও শরয়ী আইনের উপযোগিতা (২)

5 March 2015 at 10:12

অনেকের দাবী , ইসলামী দন্ডবিধি অমানবিক এবং বর্বর। এতে মানবাধিকার চরমভাবে লংঘিত হয়।

আমরা জানি, বিশ্বের সব সমাজে মারাত্বক মারাত্বক অপরাধের শাস্তির বিধান রয়েছে। আছে সুনির্দিষ্ট দন্ডবিধি। বিচারের আধুনিক সিস্টেমে অনেক রাষ্ট্র দীর্ঘ সময়ের জন্য বন্দীর রায় প্রদান করে থাকে। কিন্তু বিশ্বের অনেক খ্যাতনামা সমাজ বিজ্ঞানী এবং আইন বিশারদ মনে করেন যে, দীর্ঘ সময়ের জন্য বন্দী রাখা যথার্থ শাস্তি নয় । এবং বাদী পক্ষও একে যথেষ্ট মনে করে না। তা ছাড়া যাবৎ-জীবন কারাবাস দেয়ার ফলে প্রাচীন সেই দাস প্রথা নতুনভাবে চালু করা হয়। বন্দী অবস্থায় অধিকাংশ বন্দীদের মানবাধিকার লংঘিত হয়। অনেকে তো যৌন হয়রানিসহ বিভিন্ন ধরণের নির্যাতনের শিকার হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।ইসলামী দন্ডবিধির প্রধান উদ্দেশ্য হল, প্রত্যেকের জন্য ন্যায় বিচারের বিধান এবং সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা করা। সমাজ বা রাষ্ট্রের প্রত্যেক সদস্যের নিরাপত্তার বিধান এবং সমাজ বিধ্বংসী সব ধরণের কর্মকান্ড বন্ধ করা।

ইসলামে অপরাধ দু-শ্রেণীতে বিভক্ত,

১. যেসব অপরাধের শাস্তি সরাসরি ইসলামী শরীয়তে বর্ণিত হয়েছে। যেমন, হত্যা, ধর্ষণ বা ব্যভিচার, ইসলাম ধর্ম ত্যাগ [রিদ্দা], ডাকাতি, চুরি, মদ্যপান ও নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ, কাউকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া ইত্যাদি ।

২. যে সমস্ত অপরাধের শাস্তি ইসলামী শরীয়তে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি বরং ইসলামী সরকার নিজের পক্ষ থেকে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারে । এ ধরণের শাস্তিকে বলা হয় তা’জীর।যেসমস্ত অপরাধের সুনির্র্দিষ্ট শাস্তি ইসলামী শরীয়তে রয়েছে, তাদেরকে আবার দু-শ্রেণীতে ভাগ করা যায়,

১. যে অপরাধের শাস্তি অপরাধের শিকার ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমন, হত্যা, আঘাত, অপবাদ ইত্যাদি।এ ধরণের শাস্তির ক্ষেত্রে ব্যক্তি চাইলে অপরাধীকে মাফ করে দিতে পারে কিংবা তার শাস্তি লঘু করতে পারে। অথবা সে রক্তমূল্য দিয়ত নিতে পারবে।

২. সে সমস্ত অপরাধ যার শাস্তির বিধান দেওয়া হয়েছে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার আদেশ-নিষেধ লংঘণ করার কারণে। এ অপরাধে ব্যক্তির অধিকার সম্পৃক্ত থাকলেও ব্যক্তি চাইলে এ অপরাধের শাস্তি মাফ বা লঘু করতে পারবে না । যেমন, ব্যভিচার, চুরি,নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ। যদি ইসলামী আদালতে একবার বিচার উত্থাপন করা হয় এবং সাক্ষ্য প্রমাণের দ্বারা যথাযথভাবে তা প্রমাণিত হয়, তবে তা বাতিল বা মাফ করার ক্ষমতা কারও থাকে না।

ইসলামী শরীয়তে দন্ডবিধি কার্যকর করা হয় ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে; বিশেষভাবে পাঁচটি মৌলিক জিনিস যখন চরমভাবে লংঘিত হয়।

১. জীবন ।

২.আত্মা ।

৩.ধর্ম ।

৪। সম্মান ।

৫। সম্পদ

এ সমস্ত শাস্তির ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম শর্ত হল, তা ইসলামী বিচারক বা কাযির সম্মুখে মামলা হিসেবে উত্থাপন করতে হবে । দ্বিতীয়ত যথাযথ সাক্ষ্য-প্রমাণের দ্বারা তা প্রমাণিত হতে হবে। যদি সাক্ষ্য-প্রমাণে ন্যুনতম সন্দেহও থাকে তবে শাস্তি বাতিল হয়ে যাবে। কেননা ইসলামী বিচারের ক্ষেত্রে প্রচলিত একটি নীতি হল, “দলিল-প্রমাণে সন্দেহ থাকলে দন্ডবিধি বাতিল হবে"।

অতএব, কোন ক্ষেত্রে উল্লেখিত শর্ত সমূহের কোন একটি যদি না পাওয়া যায়, তাহলে কোনভাবেই দন্ড বিধি প্রয়োগ করা চলবে না । এগুলো সমষ্টিগত শর্ত ।স ব ধরণের দন্ডবিধির ক্ষেত্রে এ সমস্ত শর্ত আছে কি না সতর্কতার সাথে তা যাচাই করতে হবে।

সুতরাং সমষ্টিগত শর্ত হল,

১. শাসন বা সরকার ব্যবস্থা ইসলামী হতে হবে এবং মামলা ইসলামী আদালত তথা কাযীর সম্মূখে পেশ করতে হবে । অতএব ব্যক্তিগতভাবে কিংবা সমষ্টিগত ভাবে কোন সংগঠন হুদুদ বাস্তবায়নকরার অধিকার রাখে না। বর্তমান সমাজে মিডিয়াতে ইসলামের অবমাননার জন্য গ্রাম প্রধান,পঞ্চায়েত প্রধান এর বিচারকে ফতোয়া হিসাবে প্রচার করা হচ্ছে এবং রিপোর্ট দেয়া হচ্ছে অমুকের ছেলে বা মেয়ে ফতোয়াবাজীর শিকার। কিন্তু আশ্বর্যের বিষয় হল, এ সমস্ত বিচার বা রায়ের সাথে না ইসলামের কোন সম্পর্ক আছে না ইসলামী দন্ডবিধির । কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রামের মওলবী সাহেব বা হুজুরের নাম উল্লেখ করা হয়। যাই হোক পুরা শাসন ব্যবস্থা যতক্ষণ সরকারী না হবে কিংবা সরকার অনুমোদিত ইসলামী বিচার ব্যবস্থা না থাকবে ততক্ষণ কোন ব্যক্তি বা সংগঠন হুদুদ কায়েম করতে পারবে না।

২.প্রত্যেকটা দন্ডবিধির সুনির্দিষ্ট শর্ত এবং অবস্থা রয়েছে । এ সমস্ত শর্ত পুংখানুপুংখ রূপে পালনের সাথে সাথে সাক্ষ্য-প্রমাণে কোন সন্দেহ থাকতে পারবে না । যেমন-ব্যভিচারের শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে শর্ত হল চারজন প্রাপ্ত বয়স্ক,বুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষের সাক্ষ্য । এবং চারজন লোকই আদালতে বিশ্বস্থ হতে হবে। তারা একই সাথে একই সময়ে সরাসরি যৌন মিলন প্রত্যক্ষ্য করতে হবে। এখন যদি এ শর্তসমূহের কোন একটি না পাওয়া যায়, তাহলে এ অভিযোগ অপরাধ বলে গণ্য হবে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, যতদিন শাস্তি প্রয়োগ করা না হবে ততদিন ঐ চারজন তাদের সাক্ষের উপর অটল থাকবে। এর মধ্যে কোন একজন যদি সাক্ষ থেকে ফিরে আসে কিংবা তারা স্বীকার করে যে তাদের সাক্ষ্য মিথ্যা ছিল, তাহলে তাদেরকে অপবাদ দেয়ার শাস্তি প্রদান করা হবে এবং ভবিষ্যতে তাদের সাক্ষ্য আর গ্রহণ করা হবে না। আর যদি সাক্ষী তিনজন হয় কিংবা চারজনই সাক্ষ দিল কিন্তু তাদের চারজন একই সময়ে একই সাথে এ ঘটনা প্রত্যক্ষ্য করেনি, তবে তাদেরকে মিথ্যা অপবাদের শাস্তি প্রদান করা হবে। এ ধরণের কঠিন শর্ত পালন করে ব্যভিচারের দন্ডবিধি প্রয়োগ করা কতটা কঠিন তা সামান্য বুদ্ধিসম্পন্য ব্যক্তিও সহজে অনুধাবন করতে পারবে।

৩.প্রাপ্ত বয়স্ক

৪.বুদ্ধিসম্পন্ন [পাগল নয়]

৫. ঐ সময়ে সে শাস্তি প্রয়োগের যোগ্য হতে হবে। যেমন, ব্যভিচারের অভিযোগে কোন মহিলাকে যদি শাস্তি প্রদানের রায় প্রদান করা হয়, তবে দেখতে হবে সে ঐ সময়ে শাস্তি প্রয়োগের যোগ্য কি না? যদি তার গর্ভে সন্তান থাকে কিংবা তার উপর নির্ভরশীল দুগ্ধপোষ্য সন্তান থাকে তবে তাকে এ অবস্থা থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত শাস্তি প্রয়োগ করা হবে না

।৬.কেউ যদি নিজে তার অপরাধের সাক্ষ্য প্রদান করে তাহলে দেখতে হবে তার এ সাক্ষী স্বেচ্ছাপ্রণেদিত কি না? কেউ যদি স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য থাকে, যেমন বর্তমানে রিমান্ড বা নির্যাতনের মাধ্যমে স্বীকারোক্তি নেয়া হয় সে ক্ষেত্রেও দন্ডবিধি প্রযোজ্য হবে না। আবার কেউ এখন স্বীকারোক্তি প্রদান করল কিন্তা পরবর্তীতে সে তার স্বীকারোক্তি থেকে ফিরে আসল সে ক্ষেত্রেও কোন দন্ড বিধি প্রয়োগ করা হবে না। এবার

পাঠক, একটু ভেবে দেখুন ! বিষয়টি কতটা সুক্ষ্ম এবং জটিল। কিন্তু যাদের কাজ হল ইসলামের সমালোচনা করা তারা শুধু আপনাকে বলবে ইসলাম এতটা বর্বর যে কেউ যদি ব্যভিচার করে তবে তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হয়। কিংবা সিনেমা বানিয়ে আপনাকে দেখান হবে যে নির্দয় ভাবে কোন মেয়েকে পাথর মেরে হত্যা করা হচ্ছে।

পৃথিবীর সব সমাজে কিছু কুলাঙ্গার থাকে। অপরাধ করাটা যাদের নেশা । অনেকে আবার শখের বসে করে। এদেরকে দর্শন বুঝিয়ে , সদুপদেশ দিয়ে কিংবা ইবাদাত খানার বাসিন্দা বানিয়ে দিলেও তাদের অপরাধ প্রবণতা দূর হয় না। মন্দির থেকে মূর্তি চুরির ঘটনা যেমন নতুন নয় তেমনি গীর্জা বা মসজিদ থেকে বিভিন্ন জিনিস চুরির ঘটনাও অভিনব নয় ।সুতরাং এ কথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে , কিছু লোক এমন আছে যারা শখের বসে খুন করে ,ধর্ষণ করে। আবার কেউ এ সমস্ত অপরাধকে পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছে। পৃথিবীতে যতদিন মানুষ আছে ততদিন অপরাধ থাকবে । এখন যদি কেউ অপরাধীদের প্রতি সদয় হয়ে বলল , যে তাদের নির্দয়ভাবে শাস্তি দেয়ার মাধ্যমে তার মানবাধিকার লংঘিত হচ্ছে। এখন যদি তাকে কিছু দিন বন্দী রেখে কিংবা কিছু জরিমানা করে ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে সে যে ভাল হয়ে যাবে এর কোন নিশ্চয়তা আছে ? অবশ্যই নেই । আর এ ধরণের ঘটনা পৃথিবীতে খুবই কম । এ আলোচনা বোঝার আগে আমাদের কে বুঝতে হবে শাস্তি (عقوبة) কেন দেয়া হয় ?

প্রথমতঃ অপরাধ করার মাধ্যমে অপরাধী অন্য একজন নিরপরাধ মানুষের বিভিন্ন ধরণের অধিকার নষ্ট করে। হত্যার ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তির বেঁচে থাকার অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছে। কেউ যদি কোন মহিলাকে ধর্ষণ করে , তাহলে সে মহিলার ,মলির স্বামী এবং তার ছেলে সন্তানদের অধিকার নষ্ট করেছে। সকল ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে অন্যের মারাত্বক ক্ষতি সাধনের মাধ্যমে সে তার অভ্যন্তারীণ পশুত্বের চাহিদা পূরণ করছে। এখন সমাজ তাকে এ অপরাধের কারণে শাস্তি কেন দিবে ?

১.তার অভ্যন্তারীণ পশুটাকে হয় শেষ করে দেয়া কিংবা সীমাবদ্ধ গন্ডির মধ্যে তাকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা করা ।

২.যারা এ অপরাধের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তাদের জন্য ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা করা

৩.ভবিষ্যতে কেউ যেন এ ধরণের কর্মকান্ডে লিপ্ত না হয় এর নিশ্চয়তা প্রদান করা।

সমাজে বসবাসরত মানুষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সর্ব ক্ষেত্রে তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকা।এখন যদি কারও শাস্তির প্রতি মানবতা দেখিয়ে তার শাস্তি লঘু করা হয়, তাহলে এর অর্থ এই দাঁড়াল যে, ভবিষ্যতে সে কিংবা তার সমগোত্রীয় কেউ নির্দয়ভাবে অন্যের বেঁচে থাকার অধিকার কেড়ে নেয়ার সুযোগ করে দেয়া। আমরা তাদেরকে অন্যের নিরাপত্তা ছিনিয়ে নেয়ার পথ তৈরি করে দিচ্ছি ।সুতরাং অপরাধীকে দয়া করার অর্থ হল মজলুমের প্রতি আরও জুলুম করা।আমরা অপরাধের পরে এসে তার মানবাধিকার নিয়ে চিন্তা করছি, কিন্তু এই চিন্তা করি না যে, সে অন্য একজনের অধিকার কি নির্মমভাবে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। এখন যদি তার প্রতি দয়া করা হয়, তাহলে তাকে সমাজের আরও অনেক মানুষের নিরাপত্তা ছিনিয়ে নেওয়ার পথ তৈরি করে দেওয়া হল। আর যারা এখনও এ ধরণের কর্মকান্ডে লিপ্ত হয় নি, তারা যেন ভবিষ্যতে তা করতে পারে তার নিরাপত্তা পূবেই প্রদান করা হল। অতএব আমরা যদি ব্যক্তি অধিকার প্রতিষ্ঠার নামে এরকম হাজার মানুষের অধিকার লংঘনের ব্যবস্থা করে দেই তাহলে তাও যে মানবতার প্রতি নির্দয় আচরণ করা হবে তাতে কোন সন্দেহ থাকার কথা নয়।

যেমন ধরুন, ব্যভিচারের দন্ডবিধি হল, পাথর মেরে হত্যা করা। দশ বছরে একটা লোককে পাথর মেরে হত্যা করার কারণে যদি দশ হাজার নারী ধর্ষণ ও খুনের হাত থেকে বেঁচে যায়, কোনটা ভাল? আল্লাহর ওয়াস্তে, ইনসাফের সাথে বলুন। বর্তমানে অধিকাংশ ধর্ষণের সাথে খুনের ঘটনা জড়িত থাকে। ধর্ষণের সাথে সাথে খুন ও গুম হয়। একটা মেয়ের সর্বস্ব লুটে নিয়ে তাকে হত্যা করা কি মানবাধিকার? না কি এর পথ বন্ধ করে দেয়ার জন্য গুরুতর শাস্তির ব্যবস্থা করা মানবতা। আপনি যদি ধর্ষক না হোন, তাহলে কোনটি শ্রেয়, সেটা বোঝানোর প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

১৯৭৩ সালে Isaac Ehrlich একটি জরিপ করেন। এতে তিনি প্রত্যক্ষ করেন একজনকে মৃত্যুদন্ড প্রদান করলে সাতজনের জীবন বেচেঁ যায়। কেননা অন্যরা মৃত্যুদন্ডের কারণে আর হত্যা করতে উদ্যত হয় না। তিনি উপসংহারে বলেন,"In light of these observations, onecannot reject the hypothesis that punishment, in general, and execution, inparticular, exert a

unique deterrent effect on potential murderers."[illegible], [illegible], [illegible] The deterrent effect of capital punishment: A question of life or death," American EconomicReview June 1975, pp. 397-417

Fordham University [illegible] Ernest van den Haag [illegible]

We threaten punishments in order to deter crime. We impose them not only to make the threats credible but also as retribution (justice) for the crimes that were not deterred. Threats and punishments are necessary to deter and deterrence is a sufficient practical justification for them. Retribution is an independent moral justification. Although penalties can be unwise, repulsive, or inappropriate, and those punished can be pitiable, in a sense the infliction of legal punishment on a guilty person cannot be unjust. By committing the crime, the criminal volunteered to assume the risk of receiving a legal punishment that he could have avoided by not committing the crime. The punishment he suffers is the punishment he voluntarily risked suffering and, therefore, it is no more unjust to him than any other event for which one knowingly volunteers to assume the risk. Thus, the death penalty cannot be unjust to the guilty criminal.

[illegible] ([illegible]) [illegible], [illegible]-[illegible], [illegible], [illegible], [illegible]

শাস্তি দেয়াটা তার ইচ্ছাকৃত অপরাধ করার মাধ্যমে শাস্তির ঝুঁকি নেয়ার চেয়ে বড়
কিছু নয়। সুতরাং মৃত্যুদন্ড একজন অপরাধীর জন্য যথার্থ শাস্তি ।

http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/angel/procon/haagarticle.html

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে , যে কোন অপরাধে অপরাধী ইচ্ছাকৃতভাবে শাস্তি ভোগ করার জন্য প্রস্তুত থাকে। আর এ শাস্তির বিধান সব ধরণের অপরাধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
শুধু মাত্র মৃত্যদন্ডই নয় , ইসলামী শরীয়তের যে সমস্ত দন্ডবিধি আছে তার প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য।

ইসলামে শাস্তি বোঝাতে দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয় ,

১. عقوبة(□□□□□) ২. عقاب ইকাব১. عقوبة(□□□□□)

অর্থ হল সেই শাস্তি যা শরীয়ত মানুষ কে আদেশ -নিষেধ লংঘন করার কারণে দেওয়া হয়। আর

عقاب (ইকাব) হল আযাব। যা পরকালের শাস্তিন সাথে সংশ্লিষ্ট বলে অনেকে মনে করেন । পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ,

১. فحق عقاب (যথার্থ শাস্তি)

২.شديد العقاب (কঠিন আযাব বা শাস্তি)

৩.و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ৪.ومن عاقب بمثل ما عوقب به

এ আয়াত গুলোতে আযাব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ।

উকুবা বা শাস্তির বিধান শরীয়তে দেওয়া হয়েছে ,لمنع الناس من ارتكاب الجرائم (মানুষকে অপরাধে লিপ্ত হওয়া থেকে বাঁধা দেওয়ার জন্য) আর যদি সে অপরাধে লিপ্ত হয়ে যায় তাহলে তার উপর সে শাস্তি প্রয়োগ করা হবে ,ফলে দ্বিতীয়বার সে আর ঐ অপরাধে লিপ্ত হবে না।

এ জন্য বলা হয়ে থাকে إن العقوبات موانع قبل الفعل، زواجر بعده

"নিশ্চয় শাস্তির বিধান অপরাধ সংঘঠিত হওয়ার পূর্বে প্রতিরোধক , সংঘঠিত হওয়ার পর অপরাধ প্রবণতার প্রতিষেধক "

ইসলামে শাস্তির বিধান এতটা তাৎপর্যপূর্ণ যে ,অপরাধীকে তার অপরাধের শাস্তি ভোগ করতেই হবে। কেননা অপরাধী স্বেচ্ছায় শাস্তি ভোগ করার ঝুঁকি নিয়েছে। চাই সে শাস্তি দুনিয়াতে হোক কিংবা পরকালে। এমনকি ইসলামী স্কোলার এবং আইনবিদগণ এ ব্যাপারে মতনৈক্য করেছেন যে ,একজন অপরাধী উপর দন্ডবিধি প্রয়োগ করার পর পরকালেও কি সে শাস্তি ভোগ করবে? কিছু কিছু আইনবিদ মনে করেন যে , দুনিয়াতে শাস্তির বিধান দেয়ার কারণে সে পরকালের শাস্তি থেকে বেঁচে যাবে।অর্থাৎ অপরাধের শাস্তি তার অপরাধের জন্য প্রতিকার হিসেবে কাজ করবে। আল্লামা সামারকান্দী বলেছেন

إن المسلم إذا حد او أقتص منه في الدنيا لا يحد ولا يقتص منه فى الآخرة،لقوله علىه الصلوة و السلام (من أذنب ذنبا فعوقب به فى الدنا لم يعاقب به فى الآخرة). " যখন কোন মুসলমানকে দুনিয়াতে দন্ডবিধি কিংবা তার থেকে কিসাস নেওয়া হয় , পরকালে তার থেকে কোন হদ্দ বা কিসাস নেয়া হবে না। কেননা রাসূল (সঃ) বলেছেন - যে ব্যক্তি কোন অপরাধ করল এবঙ তার শাস্তি তাকে দুনিয়াতে প্রদান করা হলো তাহলে পরকালে তাকে তার শাস্তি দেওয়া হবে না।"

وفى رواية عن عبادة بن الصامت قال:(كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فى مجلس فقال:تبايعونى على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق؛ فمن وفى منكم فأجره على

الله ،ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فى الدنيا فهو كفارة له.ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه)

“হযরত উবাদা বিন সামেত রাঃ থেকে বর্র্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূল (সঃ) এর মজলিশে বসা ছিলাম তিনি আমাদেরকে বললেন, তোমরা আমার নিকট এ মর্মে বাইয়াত গ্রহণ কর যে, আল্লাহর সাথে শরীক করবে না, তোমরা ব্যভিচার করবে না, চুরি করবে না, এবং আল্লাহ তায়ালা যাদের হত্যা করতে নিষেধ করেছেন, তাদেরকে অন্যায় ভাবে হত্যা কর না। যে ব্যক্তি এ সমস্ত বিষয় পালন করল তার প্রতিদান আল্লাহ তায়ালা প্রদান করবেন। কেউ উক্ত অপরাধের কোন একটিতে লিপ্ত হয় এবং দুনিয়াতেই তাকে শাস্তি প্রদান করা হয়, তাহলে এই শাস্তি তার অপরাধের কাফফারা। আর কেউ যদি এগুলোতে লিপ্ত হওয়ার পর আল্লাহ তার অপরাধ গোপন রাখেন, তাহলে তার বিষয় আল্লাহর ইচ্ছাধীন। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাকে মাফ করতে পারেন, ইচ্ছা করলে শাস্তিও দিতে পারেন"

আবার অনেকে মনে করেন, হত্যার শাস্তি দুনিয়াতে প্রদান করলেও পরকালে তাকে তার শাস্তি ভোগ করতে হবে। কেননা যাকে হত্যা করা হয়েছে,যার প্রতি জুলুম করা হয়েছে, এতে তার তো কোন লাভ হচ্ছে না। আর হত্যার পরিবর্তে যে হত্যা করা হচ্ছে তা জীবিতদের উপকারের জন্য, ভবিষ্যতে কেউ যেন এ ধরণের কাজে লিপ্ত না হয়। সুতরাং পরকালেও তার শাস্তি হবে। তবে প্রসিদ্ধ কথা হল দন্ডবিধি প্রয়োগ করলে পরকালে তার শাস্তি হবে না। কেননা রাসূল (সঃ)

□□□□□□,((الحدود كفارات لأهلها“□□□□□□□□ তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত”।

ইসলামী দন্ডবিধির ক্ষেত্রে সবচেয়ে আক্রমণের শিকার হল ব্যভিচারের শাস্তি। ব্যভিচারের শাস্তি নিয়ে অনেকরে এলার্জি আছে। এই এলার্জি কেন সেটা স্পষ্ট হওয়া দরকার। এধরণের শাস্তি দিলে সিরিজ ধর্ষণে বাধা হবে, উলঙ্গ-পনা বেহাপনা, উদম নৃত্য ইত্যাদি করতে সমস্যা হবে? আমেরিকার মতো প্রতি মিনিটে ধর্ষণের সুযোগ হাত ছাড়া হয়ে যাবে, এজন্য বুঝি এতো হৈ চৈ? আমরা তাদেরকে বিনয়ের সঙ্গে বলবো, ভাই, আমরা মানুষের সমাজে বাস করি। নৈতিকতার দিক থেকে পশুর স্তরে নেমে গেলেও আকার-আকৃতিতে এখনও মানুষই দেখা যায়, সুতরাং এতো গোস্বার কি আছে? মানুষের সমাজে থাকলে একটু মানুষ হয়ে থাকুন

না। আর যদি বলেন, হত্যার পন্থাটা বর্বর, তবে বলবো, বোমা মেরে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়া হত্যার খুব সভ্য পদ্ধতি? গুলি করে মাথার খুলি উড়িয়ে দেয়া, এসিড দিয়ে পুরো শরীর ঝলসে দেয়া, সালফিউরিক এসিড ঢেলে ভস্ম করে দেয়া, স্ট্রাপেডো পদ্ধতিতে উল্টো ঝুলিয়ে মারা, শরীরের বিভিন্ন স্থানে পেরেক পুতে গাছে ঝুলিয়ে রাখা এগুলো খুব সভ্য পদ্ধতি? আপনি তো এগুলোকে কখনও বর্বর বললেন না, তো পাথর খুব সাধারণ জিনিস হওয়ার কারণে একে বর্বর বলছেন? আপনি তো একদিনও সমালোচনা করলেন না যে, কাউকে আগুনে জ্বালিয়ে মারা যাবে না। আধুনিক যুগে যেসমস্ত পদ্ধতিতে মানুষ হত্যা করা হচ্ছে, সেটা বুঝি খুব সভ্য পদ্ধতি? আপনাদের সমস্যা হত্যার পদ্ধতি নিয়ে নয়, মূল সমস্যা ধষর্ণের শাস্তি নিয়ে। আপনার চান শাস্তি ছাড়া পান্না মাস্টারের মতো ১৫০ মেয়েকে ধর্ষণ করতে। ইসলাম আপনাদেরকে নিষেধ করে। একারণে ইসলাম বর্বর, মধ্যযুগীয়। আমি বিনয়ের সঙ্গে বলব, ভাই ইসলাম আমাদেরকে মানুষ হতে বলেছে, মানুষের সমাজে বসবাস করতে বলেছে, কোন পশুর সমাজের জন্য ইসলাম না। আপনাদের পছন্দ না হলে, আপনারা গণ ধর্ষণ করে মেডিকেল ছাত্রীকে বাস থেকে ফেলে দিবেন, সমকামীতাকে বৈধতা দিবেন, পান্না মাস্টারের আদর্শকে লালন করবেন, সেটা আপনাদের ব্যাপার। আপনারা চাইলে সানি লিওনের পোশাক আপনাদের মেয়ে- বোনদের পোশাক বানাবেন, কিন্তু ইসলাম কখনও এতটা নিচে নেমে গিয়ে আপনাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করবে না, এটা নিশ্চিত।

ইমাম আবু হানিফা রহ. এর নামে ভিত্তিহীন বিকৃত আকিদা প্রচার (পর্ব-১)
13 March 2015 at 23:51

বাংলায় একটা সরল প্রবাদ রয়েছে, 'মার চেয়ে মাসীর দরদ বেশি'। যেখানে মার চেয়ে মাসী দরদ বেশি দেখায়, সেখানে বুঝতে হবে কোন দুর্ভিসন্ধি আছে। এটাই বাস্তব সত্য। আজ পাঠকের সামনে এমনই একটি বাস্তবতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব। ইতিহাসে অনেক বিখ্যাত ইমাম অন্যের আক্রমণের শিকার হয়েছে। কেউ ইমামগণের নামে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছে। কেউ তাদের মর্যাদাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের জাল বর্ণনা তৈরি করেছে। কেউ নিজেদের ভ্রান্ত আকিদা প্রমাণে নিজের ভ্রান্ত বক্তব্যগুলো ইমামগণের দিকে সম্পৃক্ত করেছে। এভাবেই ইমামগণ বিদয়াতীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন। বিশেষভাবে ইমাম আবু হানিফা রহ. সম্পর্কে বিদয়াতীদের মিথ্যাচারের অন্ত নেই। ইমাম আবু হানিফা রহ. কে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার উদ্দেশ্যে শত শত জাল বর্ণনা তৈরি করা হয়েছে। এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মহল এসব জাল বর্ণনা নির্দ্বিধায় প্রচার করে যাচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এর ছেলের নামে প্রচারিত আস-সুন্নাহ কিতাব। এই কিতাবে অসংখ্য জাল বর্ণনার মাধ্যমে ইমাম আবু হানিফাকে জঘন্য আক্রমণ করা হয়েছে। ভ্রান্ত সালাফী মতবাদের অনুসারীগণ এগুলো নির্দ্বিধায় প্রচার করে যাচ্ছেন। এসব জাল বর্ণনা প্রচারে কিতাবুস সুন্নাহ তাদের কাছে যথেষ্ট নয়, সালাফী শায়খ মুকবিল ইবনে হাদী আল-ওয়াদেয়ী নশরুস সহীফা নামে স্বতন্ত্র কিতাব লিখেছে।

আমাদের বাংলাদেশের তথাকথিত আহলে হাদীস সালাফী ভাইয়েরাও এদিক থেকে পিছিয়ে নেই। আহলে হাদীসদের পরিচিত আলেম খুলনার মুফতী আব্দুর রউফ "ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বনাম ইমাম আবু হানিফা " নামে বই লিখে ইমাম আবু হানিফা রহ. কুফুরী শিরকের অপবাদি দিয়েছে। এসকল বই আল-আমিন মসজিদসহ বিভিন্ন আহলে হাদীস মহল থেকে প্রচার করা হচ্ছে। এগুলো হল ইমাম আবু হানিফা রহ. এর ব্যক্তিত্বের উপর এসব সালাফী আহলে হাদীসদের জঘন্য আক্রমণের কিছু খন্ডিত চিত্র।

ইমাম আবু হানিফা রহ. এর ফিকহের সনদ নেই ইত্যকার হাস্যকর কথা বলে জনমনে হানাফী মাজহাব সম্পর্কে সন্দেহ সংশয়ের বীজ বপন করাও এদের অন্যতম একটি মিশন। আমরা যখন এদেরকে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর বিশিষ্ট ছাত্র ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর লিখিত গ্রন্থগুলো দেখায়, তখন তারা মুক-বধির হয়ে যায়। কোন জবাব তারা দেয় না। আবার মিথ্যা প্রচারণা থেকেও ক্ষ্যান্ত হয় না। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর ফিকহের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট হল, এটি তার বিশিষ্ট ছাত্রদের মাধ্যমে সংরক্ষিত । ধ্রুব সত্য হল, ইমাম আবু হানিফা রহ. এর জীবদ্দশায় ও তার মৃত্যুর কিছুকাল পরে প্রায় সমগ্র মুসলিম বিশ্বে তার ফিকহ অনুযায়ী ইসলামী বিচার ব্যবস্থা পরিচালিত হয়েছে। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর বিশিষ্ট ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ রহ. মুসলিম বিশ্বের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। যেই ইমামের মাসআলা কোটি কোটি মুসলমান তাদের প্রাত্যহিক জীবনে প্রতিনিয়ত পালন করে আসছে, সেই ইমামের মাসআলা সম্পর্কে জনমনে কীভাবে সন্দেহ তৈরি করা হয়? দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করলেও ফেতনাবাজরা নতুন আঙ্গিকে ফেতনা শুরু করে।

ফেতনাবাজদের এধরনের কুট-কৌশলের আবর্তন-বিবর্তন সম্পর্কে যাদের ধারণা রয়েছে, তাদের কাছে বিষয়টি স্পষ্ট। এদের নতুন একটি কৌশল হল, ইমাম আবু হানিফা রহ. এর প্রতি ভক্তি- শ্রদ্ধা প্রকাশ করে তার নামে মিথ্যাচার। প্রথমে তারা আপনাকে এ ব্যাপারে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করবে, সে ইমাম আবু হানিফা রহ. কে অনেক সম্মান করে। ইমাম আবু হানিফা রহ. ব্যক্তিত্ব ও মাজহাবকে শ্রদ্ধা করে। এরপর ইমাম আবু হানিফা রহ. এর নামে ভিত্তিহীন বিকৃত আকিদা প্রচার করে অত্যন্ত গর্বের সাথে দাবী করবে যে, সে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর প্রকৃত অনুসারী। হানাফী মাজহাবের অনুসারী ইমাম আবু হানিফা রহ. এর প্রকৃত অনুসারী নয়। এই কৌশলটি উপরে যাদের কথা বলা হয়েছে, তাদেরই নতুন আবিষ্কার। বিভিন্ন টিভি- চ্যানেল ও বই-পুস্তকে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর ভালবাসায় আপ্লুত একটা শ্রেণি খুঁজে পাবেন। এরাও ইমাম আবু হানিফা রহ. এর নামে মিথ্যাচার করে। তবে এরা ইমাম আবু হানিফা রহ. এর শুভাকাঙ্খী সেজে কাজটা করে। প্রথম শ্রেণির সাথে মৌলিক পার্থক্য এতটুকুই। এদের এই অতিভক্তির কারণে সাধারণ মানুষ ধোকায় পড়ে যায়, এরা বুঝি ইমাম আবু হানিফা রহ. এর অনুসারীদের চেয়েও তাকে বেশি মহব্বত করে । সুবহানাল্লাহ। বাস্তবে এরা হল 'মার চেয়ে

মাসীর দরদ বেশি' প্রবাদের আদর্শ নমুনা। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর নামে যারা মিথ্যাচার করে থাকে, এদের মাঝে দ্বিতীয় শ্রেণি খুবই ভয়ঙ্কর। বর্ণচোরা স্বভাবের কারণে সাধারণ মানুষ এদের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে সচেতন নয়। এধরনের বর্ণচোরাদের সম্পর্কে মুসলিম উম্মাহের সতর্ক হওয়া জরুরি।

মূল প্রসঙ্গে আসা যাক। ভ্রান্ত আকিদার অনুসারী সালাফী ভাইয়েরা ইমাম আবু হানিফা রহ. এর নামে কয়েকটি ভিত্তিহীন আকিদা প্রচার করে থাকে।

১. যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে আকাশে বিশ্বাস করল না সে কাফের।

২. যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে আরশের উপর বিশ্বাস করল না সে কাফের। আর আল্লাহর আরশ সাত আসমানের উপরে।

৩. যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে ইল্লিয়্যীনের (সপ্তম আকাশ) সর্বোচ্চ স্তরে বিশ্বাস করল না সে কাফের।

এই তিনটা বক্তব্যই সালাফীরা ইমাম আবু হানিফা রহ. এর নামে প্রচার করে থাকে। এই কথাগুলো যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও বানোয়াট, সেটার প্রমাণ একটু পরে আলোচনা করছি। উপর্যুক্ত তিনটি বক্তব্যের প্রতি লক্ষ্য করুন। প্রথমত: কেউ আল্লাহ তায়ালাকে আকাশে বিশ্বাস না করলে সে কাফের হয়ে যাবে। দ্বিতীয় বক্তব্য অনুযায়ী আল্লাহ তায়ালাকে আরশে বিশ্বাস না করলে কাফের হবে। তাহলে প্রথম ফতোয়া অনুযায়ী দ্বিতীয় ব্যক্তি কাফের। আবার দ্বিতীয় ফতোয়া অনুযায়ী প্রথম ব্যক্তি কাফের। অর্থাৎ কেউ আল্লাহ তায়ালাকে আরশে বিশ্বাস করলে সে কাফের হয়ে যাবে, কারণ সে আল্লাহকে আকাশে বিশ্বাস করেনি। আকাশ ও আরশ কখনও এক নয়। উক্ত বক্তব্যগুলি এতটা সাংঘর্ষিক যে, প্রত্যেকেই একে অপরকে কাফের বলছে। এবার আসুন তৃতীয় বক্তব্যের দিকে। তৃতীয় বক্তব্যে বলা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা ইল্লিয়্যীনের সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছেন। পবিত্র কুরআনে রয়েছে, নেককার ব্যক্তিগণ ইল্লিয়্যীনের থাকবে। আল্লাহ তায়ালা ইল্লিয়্যীনে আছেন, এটা কোথায় আছে? ইল্লিয়্যীন আর আরশ কি একই জিনিস? যদি এক হয়, তাহলে ইল্লিয়্যীনে যেহেতু নেককার লোক থাকবে, এর অর্থ হল, নেককার লোক আল্লাহর আরশে থাকে। আর যদি বলেন, ইল্লিয়্যীন আর আরশ এক নয়, তাহলে দ্বিতীয় ফতোয়া অনুযায়ী তৃতীয় ব্যক্তি কাফের । কারণ সে আল্লাহ তায়ালাকে আরশে বিশ্বাস করেনি। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মত এতো সূক্ষ্ম জ্ঞানের অধিকারী মহান ইমাম এধরনের হাস্যকর ফতোয়া দিবেন এটা এসব সালাফীরা কল্পনা করে কীভাবে সেটাই বিস্ময়।

ইমাম আবু হানিফা রহ . এমন একটি কথা বললেন, যার প্রত্যেকটি একে অপরকে কাফের বলছে। প্রকারান্তরে এসব সালাফীরা ইমাম আবু হানিফা রহ . কে এই জঘন্য অপবাদে অভিযুক্ত করতে চায় যে , ইমাম আবু হানিফা রহ . তিনবার নিজে নিজেকে কাফের বলেছেন। নাউযুবিল্লাহ।
দ্বিতীয় পর্বে সালাফীদের কোন আলেম কোন কিতাবে এগুলো প্রচার করেছে , বিস্তারিত প্রমাণসহ আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

ভ্রান্তির বেড়াজালে সালাফী মতবাদ

22 April 2015 at 14:19

বর্তমান সালাফীরা সম্পূর্ণভাবে দেহবাদী আকিদায় বিশ্বাসী। তারা মূলত : ভ্রান্ত ফেরকা কাররামিয়াদের ভ্রান্ত আকিদা বিশ্বাস লালন করে। এসব ভ্রান্ত আকিদাকেই তারা তথাকথিত সহীহ আকিদা হিসেবে প্রচার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। সালাফীদের অন্যতম একটি আকিদা হল, আল্লাহ তায়ালা আরশে বসে আছেন। শুধু তাই নয় , আল্লাহ তায়ালা রাসূল স . কে তার পাশে বসাবেন এটা তাদের মৌলিক আকিদা। এই ভ্রান্ত ইহুদী আকিদাটি সালাফীদের অনেক বিখ্যাত শায়খ তাদের কিতাবে উল্লেখ করেছেন। বিশেষভাবে তাদের মান্যবর ও অনুসরণীয় আলেম ইবনে তাইমিয়া রহ . ও ইবনুল কাইয়্যিম রহ . তাদের কিতাবে উল্লেখ করেছেন। আমরা ইতোপূর্বে এ বিষয়ে সালাফীদের নিকট অতীতের শায়খদের বক্তব্য আলোচনা করেছি। আজকের পর্বে পূর্ববর্তী শায়খদের বক্তব্য প্রমাণসহ উল্লেখ করবো ইনশাআল্লাহ।

ইবনে তাইমিয়া রহ . এর বক্তব্য *:*

১. ইবনে তাইমিয়া রহ . তার মাজমাতুল ফাতাওয়া (খ.৪, পৃ .২২৯) বলেছেন,

> إذا تبين هذا فقد حدث العلماء المرضيون وأولياؤه المقبولون أن محمدا رسول الله يجلسه ربه على العرش معه

" গ্রহণযোগ্য আলেমগণ ও আল্লাহর প্রিয় ওলীগণ বলেছেন , আল্লাহ তায়ালা আরশের উপর রাসূল স. কে তার পাশে বসাবেন।

তার মতে আরশের উপর আল্লাহর পাশে রাসূল স . এর উপবেশনের আকিদাটি সঠিক আকিদা। এটি জাহমিয়া ছাড়া কেউ অস্বীকার করে না। অর্থাৎ আল্লাহর আরশে উপবেশনের আকিদাটি অস্বীকার করলে ইবনে তাইমিয়া রহ . এর মতে সে জাহমিয়া ।

স্ক্রিনশট দ্রষ্টব্য:

২.ইমাম আবু হাইয়্যান উন্দুলুসী রহ. [মৃত:৭৫৪ হি:] বিখ্যাত মুফাসসির ছিলেন। আল-বাহরুল মুহীত তার অমর কীর্তি। ইমাম আবু হাইয়্যান উন্দুলুসী রহ. ইবনে তাইমিয়া রহ. এর সম-সাময়িক ছিলেন। আবু হাইয়্যান উন্দুলুসী রহ. তার তাফসীরে লিখেছেন,

" আমাদের সম-সাময়িক ইবনে তাইমিয়ার নিজ হাতে লেখা "আল-আরশ" নামক কিতাবে দেখেছি, আল্লাহ তায়ালা কুরসীর উপর উপবেশন করবেন। কুরসীর কিছু অংশ ফাকা থাকবে। যেখানে রাসূল স. উপবেশন করবেন"

[আল-বাহরুল মুহীত, খ.২, পৃ.২৫৪, আয়াতুল কুরসীর তাফসীর]

স্ক্রিনশট দ্রষ্টব্য:

৩. ইবনে তাইমিয়া রহ. বয়ানু তালবিসিল জাহমিয়া (খ.৩, পৃ.২৭৮) তে লিখেছেন, "আরশের শাব্দিক অর্থ হল, উপরের দিকের বিবেচনায় এটি খাট বা সিংহাসন এবং নীচের দিকের বিবেচনায় এটি ছাদ। কুরআনে যেহেতু আল্লাহর জন্য আরশ সাব্যস্ত করা হয়েছে, আল্লাহর ক্ষেত্রে যেহেতু এটি ছাদ নয়, সুতরাং আল্লাহর জন্য আরশ হল সিংহাসন। আরশ আল্লাহর সিংহাসন হওয়াটা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ আরশের উপর রয়েছেন।

স্ক্রিনশট দ্রষ্টব্য:

[redacted]

ইবনে তাইমিয়া রহ . এর আকিদা ছিল আল্লাহর ওজন বা ভার রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা আরশে উপবিষ্ট রয়েছেন। এ বিষয়ে তার অনেক বক্তব্য রয়েছে। সংক্ষেপে আলোচনার উদ্দেশ্যে সেগুলো উল্লেখ করা হল না। পরবর্তীতে ইনশাআল্লাহ বিস্তারিত লিখবো।

ইবনুল কাইয়্যিম রহ . এর বক্তব্য :

১. ইবনুল কাইয়্যিম রহ . তার আল-বাদাইউল ফাওয়াইদ (খ.৪, পৃ .১৩৮০) এ একটি কবিতা উল্লেখ করেছেন।

ولا تنكروا أنه قاعد ولا تنكروا أنه يقعده

অর্থ : তোমরা কখনও অস্বীকার করো না যে , আল্লাহ আরশে বসে আছেন। তোমরা এও অস্বীকার করো না যে , রাসূল স .কে আল্লাহ তায়ালা আরশে বসাবেন।

স্ক্রিনশট দ্রষ্টব্য :

২. মুখতাসারুস সাওয়াকিল মুরসালা (পৃ.১০৯৬) কিতাবে ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেন, আল্লাহ প্রকৃত অর্থে উপরের দিকে রয়েছেন। আল্লাহর উপরে থাকার বিভিন্ন ধরণ রয়েছে। এর একটি হল, আল্লাহ তায়ালা তার কুরসীর উপর উপবিষ্ট হন।

৩. খারিজা ইবনে মুসআব (পরিত্যক্ত বর্ণনাকারী) থেকে ভিত্তিহীন (বর্ণনাকারী সাইদ ইবনে সাখর অজ্ঞাত) একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন ইবনুল কাইয়্যিম রহ. তার সাওয়াইকুল মুরসালা কিতাবে। এই বর্ণনাটি শুধু ভিত্তিহীনই নয়, জঘন্য আকিদা প্রচার করা হয়েছে এর মাধ্যমে। এধরনের ভ্রান্ত আকিদা পোষণ না করলে কুফুরীর ফতোয়াও দেয়া হয়েছে। নাউযুবিল্লাহ। ইবনুল কাইয়্যিম রহ. লিখেছেন, "খারিজা ইবনে মুসআব থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, জাহমিয়াগণ কাফের। তোমরা তাদের সাথে তোমাদের কন্যাদের বিবাহ দিও না। তাদের কারও মেয়ে বিবাহ করো না। তাদের অসুস্থদেরকে দেখতে যাবে না। তাদের মৃত ব্যক্তির জানাযায় অংশগ্রহণ করবে না। তাদের স্ত্রীদেরকে জানিয়ে দাও, তাদের স্ত্রী তালাক। স্বামীর জন্য তাদের স্ত্রী হালাল নয়। এরপর তিনি সূরা ত্বহার পাচ নং আয়াত পর্যন্ত তেলাওয়াত করলেন। "আল্লাহ তায়ালা আরশের উপর ইস্তেওয়া করেছেন। ' এই আয়াত তেলাওয়াত করে বললেন, বসা ব্যতীত কখনও কি ইস্তেওয়া হয়?"

[আস-সাওয়াইকুল মুরসালা, খ.১, পৃ.১৩০৩]

৩. তাদের জানাযায় অংশগ্রহণ করা বৈধ না কি অবৈধ?

৪.এদের কেউ অসুস্থ হলে অন্যান্য সালাফীরা কি তাকে দেখতে যেতে পারবে?

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, শহীদুল্লাহ খান মাদানী এই আকিদাকে বিদয়াত বলেছে। সুতরাং খারিজা ইবনে মুসআবের সুত্রে ইবনুল কাইয়্যিম রহ. যেই ফতোয়া দিলেন, এর আলোকে আমরা কী বুঝতে পারি? শহীদুল্লাহ খান মাদানীর স্ত্রী তার জন্য হালাল না হারাম? সে মৃত্যুবরণ করলে তার জানাযায় অন্যান্য সালাফীরা কি অংশগ্রহণ করতে পারবে?

ইবনুল কাইয়্যিম রহ. যেহেতু তার কিতাবে এটি সুস্পষ্টভাবে লিখেছেন, সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের জানতে চাওয়াটা কখনও অযৌক্তিক হতে পারে না। এটির সমাধান হওয়া জরুরি। আশা করি সালাফী ভাইয়েরা অন্যদেরকে জাহমিয়া, মুয়াত্তিলা বলে গালি দেয়ার আগে নিজের অবস্থান যাচাই করবেন। তাদের মান্যবর শায়খদের ফতোয়া অনুযায়ী তারা নিজেরাই জাহমিয়া হয়ে আছে কি না সেটাও যাচাই করা জরুরি। তাদের স্ত্রী হালাল রয়েছে কি না সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য আলেমদেরকে কুফুরী-শিরকের অপবাদ দেয়ার আগে আপনাদের শায়খদের ফতোয়া অনুযায়ী আপনাদের ইমানটাও যাচাই করা আবশ্যক। আশা করি, সালাফী ভাইয়েরা বিশেষভাবে শহীদুল্লাহ খান মাদানী বিষয়টি স্পষ্ট করবেন।

আফগান মুজাহিদদের কারামত ও কারামত অস্বীকারকারীদের মনস্তত্ব (পর্ব-৩)
26 April 2015 at 09:47

জানবাজ মুজাহিদ শহীদ ড. আব্দুল্লাহ আজজাম রহ. এর বিখ্যাত কিতাব "আয়াতুর রহমান ফি জিহাদিল আফগান"(আফগান জিহাদে আল্লাহর নিদর্শনসমূহ)। আফগান মুজাহিদদের অলৌকিক কারামতসমূহের সংকলন। জিহাদের ময়দানে মুজাহিদরা কী পরিমাণ আল্লাহর রহমত ও আল্লাহর নিদর্শন অবলোকন করেন, তার জীবন্ত প্রতিচ্ছবি একেছেন শায়খ। ইমানের বলে বলীয়ান মুজাহিদদের কারামতগুলো দুর্বল ইমানের মুসলমানদেরকে অনুপ্রাণিত করে। তাদেরকে রহমত ও নুসরাতের আশায় উজ্জীবিত করে।

কিন্তু দু:কজনক হলেও সত্য, উম্মাহের মাঝে বিচ্ছিন্নতা ও বিভক্তি সৃষ্টিকারী একটি দল এসব কারামত নিয়ে তামাশা করতে ব্যস্ত। এগুলো তাদের কাছে শুধু তামাশাই নয়, নিয়মিত কুফুরী-শিরকীও। এগুলোকে তারা অবলীলায় শিরকের তকমা লাগান। আমরা পূর্বের দু'পর্বে তাদের মনস্তত্ব নিয়ে আলোচনা করেছি।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের একটি স্বীকৃত আকিদা হল, মৃত ব্যক্তি শুনতে পায়। কবরের কাছে গিয়ে সালাম দিলে শুনতে পায়। কবরের কাছে কথা বললে মৃত ব্যক্তি শুনতে পায়, এটা আহলে সুন্নতের সুস্পষ্ট আকিদা। কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এই স্বীকৃত আকিদাকে তথাকথিত সহীহ আকিদার ভাইয়েরা শিরক বলে থাকেন। তাদের মতে, মৃত ব্যক্তি জড়বস্তুর

ন্যায়। কোন কিছু শুনতে পায় না। এমনকি মৃত ব্যক্তি নড়া-চড়া করতে পারে, এধরনের বিশ্বাস রাখলে তার পিছনে নামায হবে না। অথচ তাদের এ বক্তব্য সুস্পষ্ট কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী। মৃত ব্যক্তির উপর কবরের আজাব হয়। মৃত ব্যক্তি ভালো হলে জান্নাতের নেয়ামত ভোগ করতে থাকে। মৃত ব্যক্তি যদি জড়বস্তুর ন্যায় হয়, তাহলে তার উপর আজাব হয় কীভাবে? সত্য কথা হল, যারা মৃত ব্যক্তিকে জড়বস্তুর মতো মনে করে, তারা মূলত: কবরের আজাবকেও অস্বীকার করে।

মৃত ব্যক্তির শ্রবণ সংক্রান্ত দু'টি কারামত ড. আব্দুল্লাহ আজজাম রহ. এর বই থেকে উদ্ধৃত করছি।

কারামত-১:

আমার নিকট যুবাইর মির আলম বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, "আমাদের সাথী মুজাহিদ মির আগা শহীদ হলেন। তার কাছে ক্লাশিন কভ ছিল। মুজাহিদগণ তার ক্লাশিনকভ নিতে এলে তিনি এটি দিতে অস্বীকার করলেন। শহীদ মির আগাকে যখন তার বাড়ীতে আনা হল, তার পিতা কাজী মীর সুলতান বললেন, " বৎস, ক্লাশিনকভটি তোমার নয়। এটি মুজাহিদদের "। এরপর সে ক্লাশিনকভটি ফেলে দিল।

[আয়াতুর রহমান ফি জিহাদিল আফগান, পৃ. ১২৬]

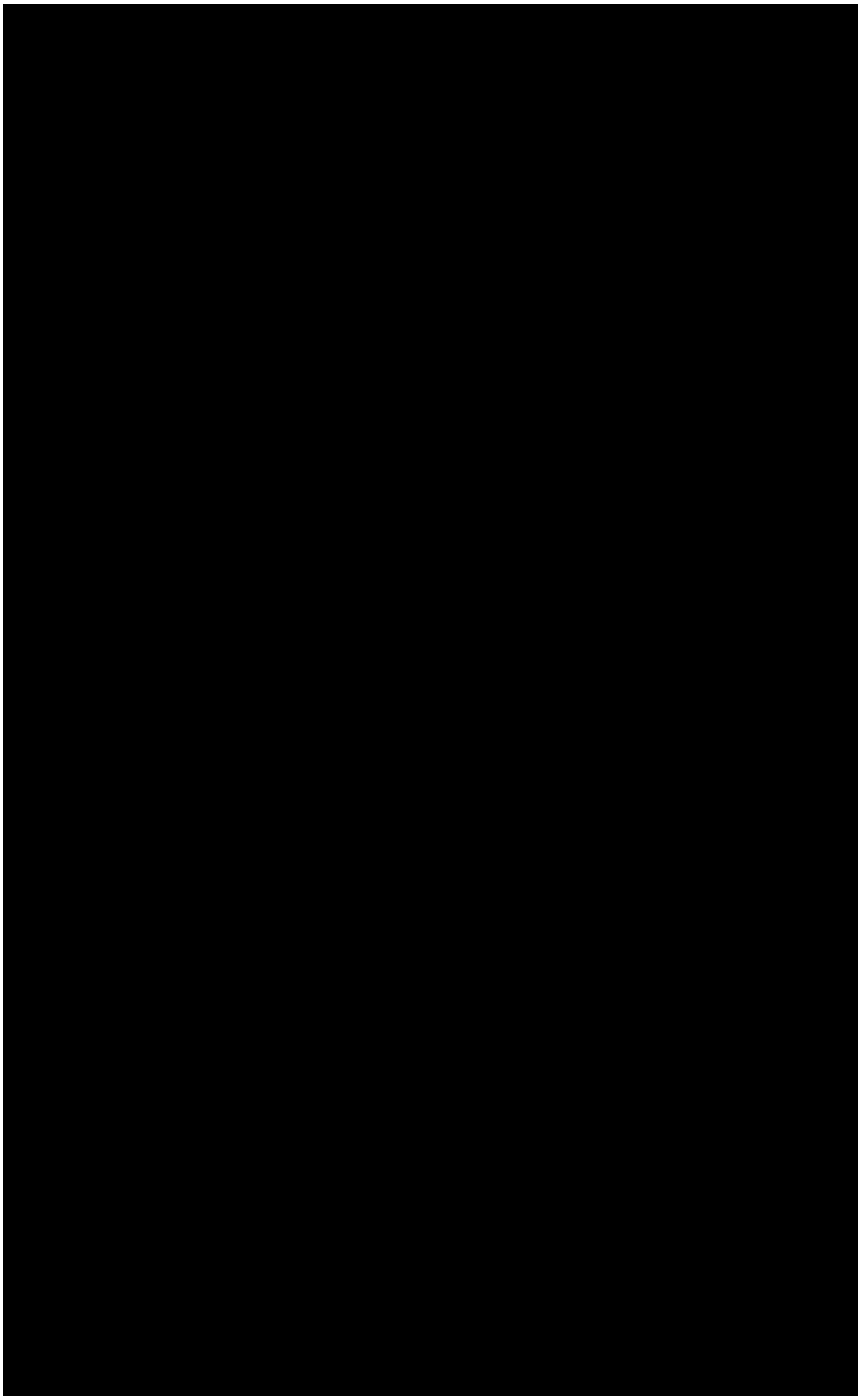

কীভাবে বুঝল, এটা তার পিতা? ....। সুতরাং এসব শিরক। কুরআন বিরোধী কথা।
নাউযুবিল্লাহ......।

আহলে সুন্নতের আকিদায় বিশ্বাসী বলবেন, এটি মৃত ব্যক্তির নিজস্ব ক্ষমতা নয়। এটা আল্লাহর দেয়া ক্ষমতা। আল্লাহ তায়ালার সাহায্যেই তার হাতে কারামত প্রকাশিত হয়েছে।
আল্লাহ তায়ালাই তাকে শ্রবণ ও অনুধাবনের ক্ষমতা দিয়েছেন। এটাতে শিরকের কিছুই নেই যে, আপনি এভাবে আতকে উঠবেন। তবে আপনি যদি পশ্চিমাদের বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণায় নিমগ্ন থাকেন, তাহলে আপনি মৃত ব্যক্তিকে জড়বস্তু বিশ্বাস করতে পারেন।

কারামত-২:

আমার নিকট মুজাহিদ উমর হানিফ বর্ণনা করেছেন, উমর ইয়াকুব নামক একজন মুজাহিদ জিহাদকে খুব মহব্বত করতেন। তিনি এক যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করলেন। আমরা তান নিকট উপস্থিত হলাম। তাকে তার আকড়ে থাকতে দেখলাম। আমরা তার কাছ থেকে বন্দুক নেয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমরা নিতে পারলাম না। কিছুক্ষণ পর আমরা তাকে উদ্দেশ্য করে বললাম, "ইয়াকুব, আমরা তোমার ভাই। " এই কথা শুনে হঠাৎ সে বন্দুকটি ছেড়ে দিল।

[আয়াতুর রহমান ফি জিহাদিল আফগান, পৃ.১০৩]

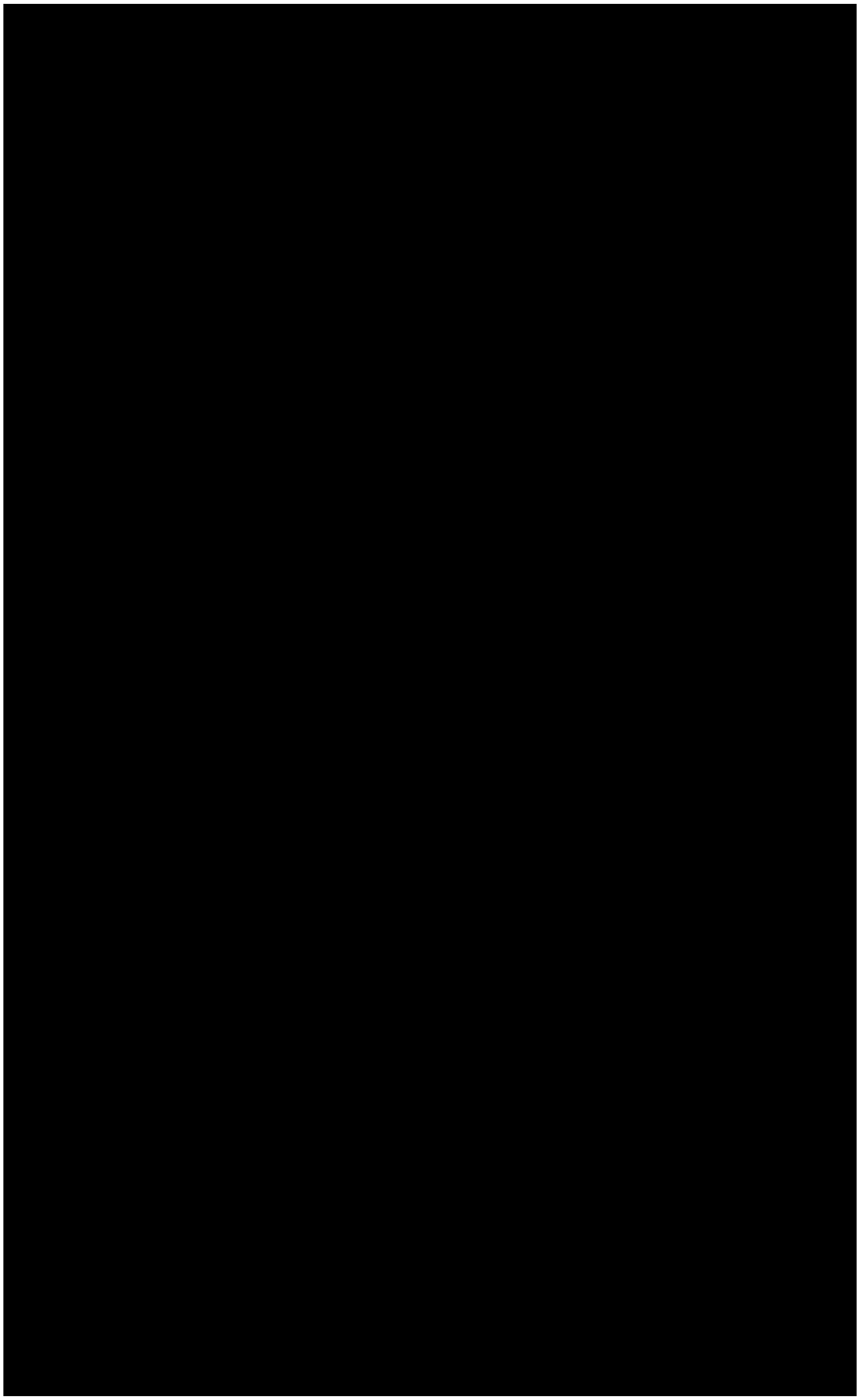

ব্যক্তি জড় বস্তুর ন্যায। সে কীভাবে শুনতে পায়? সুতরাং শায়খ আজ্জাম আমাদেরকে কবরপূজার দিক নিয়ে যাচ্ছেন.......।

সহীহ আকিদার ভাইটি যদি একটু মধ্যম পন্থার হন, তাহলে হয়তো বলবেন, এসব কুসংস্কার প্রচার না করাই ভালো। আমাদেরকে সহীহ আকিদা প্রচার করতে হবে। কুসংস্কার থেকে বেচে থাকতে হবে।

আমরা আহলে সুন্নতের অনুসারীগণ তাদেরকে বিনয়ের সঙ্গে বলব, ওলীগণের কারামত সত্য। এতে কুসংস্কারের কিছু নেই। মৃত ব্যক্তি শুনতে পায় এটি বিশুদ্ধ আকিদা। মৃত ব্যক্তি জড় বস্তুর ন্যায় নয়। বরং সে কবরে হয়তো আজাব ভোগ করে অথবা জান্নাতের নেয়ামত ভোগ করে। সে পাথর বা জড়পদার্থের মতো নির্জীব নয়। আল্লাহ সবাইকে দ্বীনের সহীহ বুঝ দান করুন। আমীন।

মৃত্যুপরবর্তী কারামত ও কারামত অস্বীকারকারীদের মনস্তত্ব (পর্ব-১)
7 May 2015 at 15:30

ভূমিকা:

আমরা বিশ্বাস করি, ওলীদের থেকে মৃত্যুর পূর্বে যেমন কারামত প্রকাশিত হতে পারে, তাদের মৃত্যুর পরেও কারামত প্রকাশিত হতে পারে। এটিই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা। মৃত্যুর পরে কারামত প্রকাশিত হবে না, বা হওয়া অসম্ভব, এজাতীয় ধ্যান-ধারণা রাখা কুরআন ও সুন্নাহের বড় একটি অংশ অস্বীকারের নামান্তর। একইভাবে নবীদের থেকে তাদের জীবদ্দশায় যেমন মু'জিযা প্রকাশিত হতে পারে, তাদের ইন্তেকালের পরেও প্রকাশিত হতে পারে।

কারণ কারামত একমাত্র আল্লাহর ক্ষমতা ও ইচ্ছায় সংঘঠিত হয়। এতে বান্দার ক্ষমতা ও ইচ্ছার কোন প্রভাব নেই। আল্লাহ কখন কার মাধ্যমে কোন কারামতের প্রকাশ ঘটাবেন তিনিই ভালো জানেন। এক্ষেত্রে বান্দা শুধুমাত্র উপলক্ষ। সুতরাং মৃত্যুর পূর্বেও যেমন আল্লাহর ক্ষমতা ও ইচ্ছায় কারামত প্রকাশিত হয়, তেমনি মৃত্যুর পরেও আল্লাহর ইচ্ছা ও ক্ষমতায় কারামত প্রকাশিত হতে পারে।

মূল আলোচনা শুরুর আগে একটি অভিযোগ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা জরুরি মনে করছি। প্রশ্নটি হল, অনেক ভন্ড লোকও তো কারামতের দাবী করে? সত্য ও ভন্ডদের কারামতের মাঝে পার্থক্য কীভাবে করব?

উত্তর: অস্বাভাবিক ঘটনা যে কারও হাতেই ঘটতে পারে। এমনকি দাজ্জালের হাতেও অনেক অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটবে। সে মৃতকে জীবিত করবে। একইভাবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান এদের হাতেও অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটতে পারে। অনেকেই জীন বশীভূত করে এধরনের ঘটনা ঘটিয়ে থাকে। অনেক ভন্ড যেমন, দেওয়ানবাগী, সুরেশ্বরী, আটরশি, চন্দ্রপাড়া, মাইজভান্ডারীরা অনেক করামাতের দাবী করে। কোনটি কারামত আর কোন ভেল্কিবাজী ও শয়তানের কর্মকান্ড, সেটা বোঝার মানদন্ড হল, যে ব্যক্তি থেকে কারামত প্রকাশিত হচ্ছে, সে কুরআন-সুন্নাহের অনুসারী কি না? সে যদি শরীয়তের পরিপূর্ণ অনুসারী হয়,তাহলে তার নিকট থেকে প্রকাশিত কারামতকে কারামত গণ্য করা হবে।

এ বিষয়ে ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন,

" خرق العادة قد يقع للزنديق بطريق الإملاء والإغواء ، كما يقع للصديق بطريق الكرامة والإكرام ، وإنما تحصل التفرقة بينهما باتباع الكتاب والسنة "

অর্থ: কখনও যিন্দিক বা ধর্মদ্রোহীদের থেকে ভেল্কিবাজীর মাধ্যমে বিভন্ন অপ্রাকৃতিক বিষয় প্রকাশিত হতে পারে। একইভাবে সত্যবাদী বুজুর্গদের থেকে কারামত প্রকাশিত হয়। তবে উভয়ের মাঝে পার্থক্য করা হয় কুরআন ও সুন্নাহের অনুসরণ দ্বারা। (অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহের অনুসারী হলে, সেটি কারামত, নতুবা সেটি পরিত্যাজ্য)

[ফাতহুল বারী, খ.১২, ৩৮৫]

ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

" تجد كثيرا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه وليا لله : أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور ، أو بعض التصرفات الخارقة للعادة ، مثل أن يشير إلى شخص فيموت ؛ أو يطير في الهواء إلى مكة ، أو غيرها ، أو يمشي على الماء أحيانا ؛ أو يملأ إبريقا من الهواء ؛ أو ينفق بعض الأوقات من الغيب ، أو أن يختفي أحيانا عن أعين الناس ؛ أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاءه فقضى حاجته ؛ أو يخبر الناس بما سرق لهم ؛ أو بحال غائب لهم ، أو مريض ، أو نحو ذلك من الأمور .

وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي لله . بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء ، أو مشى على الماء ، لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وموافقته لأمره ونهيه .

وكرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور ؛ وهذه الأمور الخارقة للعادة - وإن كان قد يكون صاحبها وليا لله - فقد يكون عدوا لله ؛ فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين ، وتكون لأهل البدع ، وتكون من الشياطين .

فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله ؛ بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة ، ويعرفون بنور الإيمان والقرآن ، وبحقائق الإيمان الباطنة ، وشرائع الإسلام الظاهرة " .

অর্থ : অনেককে দেখতে পাবে , তাদের নিকট কেউ ওলী বা বুজুর্গ হওয়ার মানদন্ড হল , তাদের কাছ থেকে কিছু কাশফ প্রকাশিত হওয়া। অস্বাভাবিক ও অপ্রাকৃতিক ঘটনা সংঘঠিত হওয়া। যেমন , কারও দিকে ইঙ্গিত করলে সাথে সাথে মৃত্যুবরণ করা। অথবা বাতাসে উড়ে মক্কায় বা অন্য কোথাও যাওয়া । অথবা কখনও পানির উপর হাটা। বাতাস থেকে পাত্র পানি দ্বারা পূর্ণ করা। অদৃশ্য থেকে টাকা -পয়সা এনে খরচ করা। অথবা হঠাৎ মানুষের চোখ থেকে অদৃশ্য হওয়া। অথাব তার অনুপস্থিতে কিংবা তার মৃত্যুর পরে তাকে কেউ ডাক দিলে উপস্থিত হওয়া এবং ঐ ব্যক্তির প্রয়োজন পুরণ করা। মানুষের চুরি হয়ে যাওয়া জিনিসের সংবাদ বলে দেয়া। অদৃশ্য কোন বিষয়ের বর্ণনা দেয়া। অসুস্থ কারও সম্পর্কে সংবাদ দেয়া। ইত্যাদি।

এগুলোর কোনটি সংগঠিত হওয়া কখনও এটা প্রমাণ করে না যে , এ ব্যক্তি আল্লাহর ওলী। বরং সমস্ত ওলী -বুজুর্গ এ বিষয়ে একমত যে , কেউ যদি বাতাসে উড়ে , পানির উপর চলে তাহলে দেখতে হবে , সে রাসূল স . এর প্রকৃত অনুসারী কি না ? শরীয়তের প্রকাশ্য বিধি -বিধান সে অনুসরণ করছে কি না ? যদি এগুলো না থাকে তাহলে তার মাধ্যমে ধোকায় পড়া যাবে না। ওলীদের কারামত এসব বিষয় থেকে অনেক বড়। এধরনের অস্বাভাবিক বিষয় যার থেকে প্রকাশিত হয় , সে কখনও আল্লাহর ওলী হতে পারে , আবার আল্লাহর শত্রুও হতে পারে। কেননা এধরনে বিষয় অনেক কাফের , মুশরিক , আহলে কিতাব ও মুনাফিক থেকে প্রকাশিত হয়ে থাকে। অনেক বিদয়াতী থেকে এগুলো প্রকাশিত হয়। কখনও এগুলো শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে।

সুতরাং এই ধারণা করা সমীচিন নয় যে , এধরনের কোন ঘটনা কারও থেকে প্রকাশিত হলেই সে আল্লাহর ওলী। বরং কোন ব্যক্তিকে তার গুণাবলী , কুরআন-সুন্নাহের অনুসরণের দ্বারা আল্লাহর ওলী গণ্য করা হবে। ইমানের নূর ও কুরআনের নূর দ্বারা তাদেরকে চেনা সম্ভব। এবং বাতেনী ইমানের হাকিকত দ্বারা তাদের বাস্তবতা অনুধাবন করা হয়। সেই সাথে প্রকাশ্য শরীয়তের বিধি -বিধান ওলী হওয়ার অপরিহার্য অংশ।

[মাজমুয়াতুল ফাতাওয়া , খ.১১, পৃ .২১৩]

ইবনে তাইমিয়া রহ . এর দীর্ঘ এ বক্তব্যটি দু 'টি উদ্দেশ্য এখানে উল্লেখ করেছি।

প্রথমত: ভন্ডদের কারামতের দাবীর বাস্তবতা অনুধাবন। আমাদের দেশের যেসব বিদয়াতীরা কারামতের দাবী করে, তাদের সকলেই প্রকাশ্য শরীয়ত বিরোধী হারাম ও গর্হিত কাজে লিপ্ত । সুতরাং এদের থেকে বাস্তবে কোন অস্বাভাবিক কাজ প্রকাশিত হলেও এরা ভন্ড। কখনও এরা বুজুর্গ নয়। এদের থেকে প্রকাশিত অস্বাভাবিক বিষয় কখনও কারামতের মর্যাদা পাবে না।

দ্বিতীয়ত: ইবনে তাইমিয়া রহ. কিছু অস্বাভাবিক ঘটনার উদাহরণ দিয়েছেন, যেগুলো অপ্রাকৃতিক ঘটনা হিসেবে ঘটতে পারে। তিনি স্পষ্টভাষায় বলেছেন, ওলীদের কারামত এসব উদাহরণ থেকেও অনেক বড়। ইবনে তাইমিয়া রহ. যেসব উদাহরণ দিয়েছেন, এর মাঝে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি উদাহরণ রয়েছে। সেটি হল, কোন মৃত ব্যক্তি উপস্থিত হওয়া। একজন মৃতব্যক্তি কারও সামনে উপস্থিত হওয়াটা সম্ভব। এটি কারামত হিসেবে যে কোন ওলীর ক্ষেত্রে ঘটতে পারে। এধরনের কারামত প্রকাশিত হওয়া শরীয়তে অসম্ভব নয়। বরং এর চেযে বড় কারামত সংঘঠিত হতে পারে। ইবনে তাইমিয়া রহ. এর বক্তব্য থেকে বিষয়টি সুস্পষ্ট।

আমরা বেশ কয়েক পর্বে মৃত্যুপরবর্তী কারামতসমূহ বিশুদ্ধ উৎস থেকে আলোচনা করব। সালাফে-সালেহীন ও মুহাদ্দিসগণের কিতাব থেকে বিভিন্ন ঘটনা উদ্ধৃত করবো। বিশেষভাবে ইবনে কাসীর রহ. এর আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া থেকে, ইবনুল কাইয়্যিম রহ. এর কিতাব থেকে, ইবনে তাইমিয়া রহ. , বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনে আবিদ দুনিয়া রহ. এর কিতাব থেকে এগুলো উল্লেখ করবো।

এধরণের ঘটনা তাদের কিতাবে উল্লেখ করার অর্থই হল, তারা এটাকে কোনভাবেই শরীয়ত বিরোধী মনে করেন না। এগুলো ঘটা সম্ভব এবং আহলে সুন্নতের আকিদার অনুগামী, এজন্যই তারা এগুলো উল্লেখ করেছেন। এগুলো কুফুরী-শিরকী হওয়া তো অকল্পনীয়। সুতরাং এগুলো যদি শরীয়ত বিরোধী বা কুফুরী-শিরকী হতো, তাহলে তারা কখনও স্বেচ্ছায় এধরনের কুফুরী-শিরকী কাজে লিপ্ত হতেন না। বিশেষভাবে যুগ যুগ ধরে বিখ্যাত ইমামগণ একের পর এক এগুলো কখনও তাদের কিতাবে বর্ণনা করতেন না। সুতরাং এসব ঘটনা যদি, কুফুরী-শিরকী হয়, তাহলে যারা এগুলো উল্লেখ করেছেন, তাদের উপর যেমন কুফুরী-শিরকের অপবাদ দেয়া হয়, তেমনি পরবর্তী যেসব আলেম এসব থেকে বিভিন্ন ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন, তারা কুফুরী-শিরকীতে লিপ্ত হয়েছেন। অথচ এটি একটি অকল্পনীয় বিষয়।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনে আবিদ দুনিয়া রহ. (২০৮-২৮১ হি:) একটি বিখ্যাত কিতাব লিখেছেন। কিতাবের নাম, মান আশা বা'দাল মাউত (মৃত্যুর পরে যারা জীবিত হয়েছেন)। এই কিতাবটি একজন বিখ্যাত সালাফের। যিনি মুহাদ্দিস হিসেবে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য।পরবর্তীতে ইমাম বাইহাকী, ইবনে কাসীর, জালালুদ্দীন সূযূতী, ইবনে রজব

হাম্বলীসহ অসংখ্য মুহাদ্দিস ও আলেম তার কিতাব থেকে বিভিন্ন ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন। সুতরাং মৃত্যুপরবর্তী কারামতে বিশ্বাস স্থাপন যেমন সালাফের মানহাজ, তেমন পরবর্তী আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য।

আমাদের দেশে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত বহির্ভূত একদল বস্তুবাদীদের আবির্ভাব হয়েছে, যারা কুরআন-হাদীস অনুসরণের ছদ্মবেশে কারামতকে কুফুরী-শিরকী হওয়ার মতো জঘন্য বিষয় সমাজে প্রচার করছে। এরা নিজেদেরকে আহলে হাদীস ও সালাফী হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকে। কারামত অস্বীকারকারী এই বস্তুবাদী দলটি বিভিন্ন সময়ে তাদের খোলস পরিবর্তন করেছে। কারামত বিষয়ে বর্তমানের সালাফী ও আহলে হাদীস ভাইয়েরা তাদের অসুরর্ণীয় আলেমদের থেকেও নিজেদেরকে মুক্ত ঘোষণা করেছে। এরা নিজেদেরকে ইবনে তাইমিয়া রহ. ও ইবনুল কাইয়্যিম রহ. ও মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজদীর অনুসারী হিসেবে প্রকাশ করে থাকে। অথচ কারামত বিষয়ে এদের থেকে মুক্ত হয়ে অনেক ক্ষেত্রে এসব শায়খদেরকেও কুফুরী-শিরকের অপবাদ দিচ্ছে। বস্তুপূজারী এই ভয়ংকর ফেতনাটি এতটা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে, আফগান মুজাহিদদের বিশ্বস্ত কারামতকেও এরা হাশি-তামাশার বস্তু বানিয়েছে। এদের এই অবস্থানটি বস্তুবাদ ও নাস্তিকতার পূর্বলক্ষণ। কেননা, যেসব ঘটনাকে তারা কুফুরী- শিরকী আখ্যা দিচ্ছে, হুবহু একই ধরনের ঘটনা কুরআন ও হাদীসে রয়েছে। সুতরাং এসব ঘটনাকে কুফুরী শিরকী বলার অর্থ কুরআন ও হাদীসকে পরোক্ষভাবে কুফুরী শিরকী বলা। যেটা পরোক্ষ নাস্তিকতার একটি অংশ। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ইবনে আবিদ দুনিয়া রহ. একটি কারামত উল্লেখ করেছেন। এক ব্যক্তির গাধা মৃত্যুবরণ করলে সে আল্লাহর কাছে দুয়া করার পর সেটি আল্লাহ তায়ালা জীবিত করে দেন। এখন আমাদের এই আহলে হাদীস ভাইদের নিকট এটি কুফুরী। এটি যদি কুফুরী হয়, তাহলে পবিত্র কুরআনে হযরত উযাইর রা. এর গাধা জীবিত হওয়ার ঘটনা কুফুরী নয় কেন? উভয়ের মাঝে পার্থক্যটা কী?

এধরনের বিভিন্ন বিষয় কারামত অস্বীকারকারীদের মনস্তত্ব শিরোনামে পূর্বে আলোচনা করেছি। নব্য এই ফেতনা মোকাবেলার জন্য সেগুলো পড়ার অনুরোধ করছি। এই সিরিজে ইনশাআল্লাহ মৃত্যুপরবর্তী কারামত সম্পর্কে বিস্তারিত ঘটনা উল্লেখ করব। দ্বিতীয় পর্ব এসব বিষয়ে বিভিন্ন ঘটনা ও অস্বীকারকারীদের মনস্তত্ব তুলে ধরবো। ইনশা আল্লাহ।

মৃত্যুপরবর্তী কারামত ও কারামত অস্বীকারকারীদের মনস্তত্ব (পর্ব-২)
8 May 2015 at 06:53

কারামত অস্বীকারকারীদের মনস্তত্ব হল, যাদের মৃত্যু হয়েছে, তাদের পক্ষ থেকে কারামত সংগঠিত হওয়া সম্ভব নয। তাদের মতে মৃত্যুপরবর্তী কারামতে বিশ্বাস কুফুরী। উদাহরণ

হিসেবে বলা যায়   , একজন মৃত্যুবরণ করেছেন। তার কবর থেকে সালামের উত্তর শোনা সম্ভব নয়। এটা ভ্রান্ত ও কুফুরী। তাকে কবরের মাঝে সরাসরি দেখতে পাওয়া অথবা কবর থেকে তার হাতবের হতে পারে   , এধরনের বিশ্বাস রাখা শিরক। কারামত অস্বীকারকারীরা এগুলোকে কুফুরী ও শিরকী আকিদা বলে থাকেন। বিশেষভাবে মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে দুনিয়াতে যে কোন ধরনের ঘটনা প্রকাশিত হওয়া তাদের নিকট কুফুরী ও শিরক। এটা হল   , তাদের মৌলিক বিশ্বাস।

হায়াতুন্নবী বাহাসে কারামত অস্বীকারকারী মুরাদ বিন আমজাদ ও তার সঙ্গীরা এধরনের কারামতকে কুফুরী শিরকী আখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেছে। তাদের মতে এগুলো ভ্রান্ত আকিদ। এগুলো ছাটাই করার মিশনে নেমেছেন তথাকথিত আহলে হাদীস ও সালাফীরা । আল্লাহ এসব কারামত অস্বীকারকারীদের ফেতনা থেকে উম্মাহকে হেফাজত করু।

আমরা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত বিশ্বাস করি   , আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ও ক্ষমতায় কারামত সংঘঠিত হয়। সুতরাং কেউ মৃত্যুবরণ করলে আল্লাহ তায়ালা তার রুহ   , দেহ বা প্রতিচ্ছবির মাধ্যমে যে কোন কারামত প্রকাশ করতে সক্ষম। এধরনের কোন মৃত ব্যক্তি থেকে দুনিয়াতে কোন কারামত প্রকাশিত হলে এটি সম্পূর্ণ শরীযতসম্মত। বিকৃত মস্তিষ্কের কারামত অস্বীকারকারীই কেবল এধরনের কারামতকে অস্বীকার করতে পারে। নতুবা কুরআন   -হাদীস ও সালাফ থেকে এধরনের অসংখ্য ঘটনা বর্ণিত আছে।

উদাহরণ হিসেবে নিজের ঘটনাগুলো লক্ষ্য করুন।

১. হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা   . থেকে বর্ণিত   , রাসূল স . বলেন,

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ , عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَعْدٍ الْجُعْفِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " حَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَإِنَّهُ كَانَتْ فِيهِمُ الأَعَاجِيبُ ، ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُ ، قَالَ : خَرَجَتْ رُفْقَةٌ مَرَّةً يَسِيرُونَ فِي الأَرْضِ فَمَرُّوا بِمَقْبَرَةٍ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : لَوْ صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَعَوْنَا اللَّهَ لَعَلَّهُ يُخْرِجُ لَنَا بَعْضَ أَهْلِ هَذِهِ الْمَقْبَرَةِ فَيُخْبِرُنَا عَنِ الْمَوْتِ ، قَالَ : فَصَلُّوا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَعَوْا ، فَإِذَا هُمْ بِرَجُلٍ خِلاسِيٍّ قَدْ خَرَجَ مِنْ قَبْرٍ يَنْفُضُ رَأْسَهُ ، بَيْنَ عَيْنَيْهِ أَثَرُ السُّجُودِ ، فَقَالَ : يَا هَؤُلاءِ مَا أَرَدْتُمْ إِلَى هَذَا ؟ لَقَدْ مِتُّ مُنْذُ مِائَةِ سَنَةٍ فَمَا سَكَنَتْ عَنِّي حَرَارَةُ الْمَوْتِ إِلَى السَّاعَةِ ، فَادْعُوا اللَّهَ أَنْ يُعِيدَنِي كَمَا كُنْتُ " .

"তোমরা বনী ইসরাইলদের ঘটনা বর্ণনা করো। কেননা তাদের মাঝে অনেক আশ্চর্যজনক ঘটনা সংগঠিত হয়েছে। এরপর রাসূল স   . একটি ঘটনা বর্ণনা করলেন   ,

একদা বনী ইসরাইলের কয়েকজন বন্ধু ভ্রমণে বের হল। তারা একটি কবরস্থান দিয়ে অতিক্রম করছিল । তারা একে -অপরকে বলল, "আমর যদি, দু'রাকাত নামায আদায় করে আল্লাহর কাছে দুয়া করি, তাহলে আল্লাহ তায়ালা হয়তো কবরের কোন ব্যক্তিকে আমাদের সামনে উপস্থিত করবেন। সে মৃত্যু সম্পর্কে আমাদেরকে বলবে।

তারা দু'রাকাত নামায আদায় করল। এরপর আল্লাহর কাছে দুয়া করল। হঠাৎ এক ব্যক্তি মাথা থেকে মাটি পরিষ্কার করতে করতে কবর থেকে বের হয়ে এল। তার কপালে সিজদার চিহ্ন ছিল। সে বলল, তোমরা কী চাও? আমি একশ বছর পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছি। এখনও আমার দেহ থেকে মৃত্যুর যন্ত্রনা উপশমিত হয়নি। আল্লাহর কাছে দুয়া করো, যেন তিনি আমাকে পূর্বের স্থানে (কবরে) ফেরত পাঠিয়ে দেন"

যেসব বিখ্যাত মুহাদ্দিস হাদীসটি তাদের কিতাবে উল্লেখ করেছেন,

১. ইবনে আবিদ দুনিয়া রহ., মান আশা বা'দাল মাউত। হাদীস নং ৫৮

২. মুসনাদে আব্দ ইবনে হুমাইদ, হাদীস নং ১১৬৪

৩.ফাওয়াইদু তামাম আর-রাজী, হাদীস নং ২১৭

৪. আল-জামে লি আখলাকির রাবী, খতীব বাগদাদী, হাদীস নং ১৩৭৮

৫. আল-বা'স, ইবনে আবি দাউদ, হা.৫

৬.আজ-জুহদ, ইমাম ওকী ইবনুল জাররাহ, হাদীস নং৮৮

৭. আজ-জুহদ, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ.

৮. মাজালিস মিন আমালি ইবনে মান্দাহ, ইবনে মান্দাহ, হাদীস নং ৩৯৩

৯. আল-মাতালিবুল আলিয়া, ইবনে হাজার আসকালানী রহ. হাদীস নং ৮০৭

১০. ফুনুনুল আজাইব, হা.১৯

১১. শরহুস সুদুর, জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. পৃ.৪২-৪৩

ঘটনাটি বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত। তামাম আর-রাজী এটি সরাসরি রাসূল স. থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনে হাজার আসকালানী রহ. হযরত জাবির রা. থেকে মওকুফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যেটি মরফু এর হুকুমে। সুতরাং ঘটনার প্রামাণ্যতার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

কারামত অস্বীকারকারী ভাইদের কাছে, আমাদের প্রশ্ন,

১. রাসূল স. এধরনের ঘটনা বর্ণনা করে উম্মতকে কুফুরী শিক্ষা দিয়েছেন?

২. মুহাদ্দিসগণ ঘটনাটি তাদের কিতাবে উল্লেখ করে কুফুরী প্রচার করেছেন?

৩. বিখ্যাত ইমামগণ এই ঘটনার মূল বিষয় তথা কবর থেকে কেউ বের হয়ে কথা বলার উপর কোন আপত্তি করেননি। এটি অসম্ভব কিংবা এটি কুফুরী-শিরকী বলা তো দূরের বিষয়। সুতরাং নতুনভাবে এটাকে কুফুরী -শিরকী বলে সেসব ইমামদেরকে কেন অভিযুক্ত করছেন?

৪. ঘটনাটি যদি কুফুরী-শিরকী হয়, তাহলে যেসব মুহাদ্দিস এই ঘটনা তাদের কিতাবে উল্লেখ করেছেন, এবং এর উপর কোন অভিযোগ করেননি, তারা সকলেই কি কুফুরী-শিরকী করেছেন?

৫. মূল ঘটনা যদি কুফুরী-শিরকী হয়, তাহলে এর সনদ দেখার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা, কুফুরী বিষয় বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হলেও কুফুরী, দুর্বল সনদে রর্ণিত হলেও কুফুরী। সুতরাং মূল ঘটনা যদি কুফুরী-শিরকী হয়, তাহলে উপর্যুক্ত ইমাম ও মুহাদ্দিসগণ সম্পর্কে আপনাদের ফতোয়া জানতে চাই।

মৃত্যুপরবর্তী কারামত ও কারামত অস্বীকারকারীদের মনস্তত্ব (পর্ব-৩)
8 May 2015 at 14:09

মৃত্যুর পর কথোপকথন

ইমাম বাইহাকী রহ. হযরত সাইদ ইবনুল মুসাইয়্যাব থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত উসমান রা. এর সময় যায়েদ ইবনে খারিজা আল-আনসারী রা. ইন্তেকাল করেন। তাকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়। পরবর্তীতে তিনি কথা বলে উঠেন। এবং বলেন, রাসূল স. এর কথা পূর্ববতী আসমানী কিতাবে রয়েছে। আবু বকর সত্য বলেছেন। উমর সত্য বলেছেন। উসমান সত্য বলেছেন।

ঘটনার সনদ বা সূত্র বিশুদ্ধ। দেখুন,

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইবনে কাসীর রহ. খ.৬, পৃ.২৯৩

২.দালাইলুন নুবুওয়াহ, ইমাম বাইহাকী রহ.। হাদীস নং ২৩০৫

৩.আল-ইস্তেয়াব, ইবনে আব্দুল বার রহ. বর্ণনা নং ৮৪৪ ।

৪. ত্ববরানী ফিল কাবীর, বর্ণনা নং ৫১৪৪

৬.তাহজীবুল কামাল।

৭. আস-সিকাত, ইবনে হিব্বান রহ .।

৮. ইমাম আবু হাতিম , মাশাহিরু উলামায়িল আমসার।

এছাড়াও বহুগ্রন্থে এটি উল্লেখ করা হয়েছে। এই ঘটনার সনদ সহীহ। কারামত অস্বীকারকারীদের মতে এটি অসম্ভব। কারামত অস্বীকারকারীরা ফাজায়েলে আমলের এজাতীয় দু 'একটি ঘটনা উল্লেখ করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে। এধরনের ঘটনার কারণে তারা সমাজে জঘন্য অপপ্রচার চালিয়েছে , ফাজায়েলে আমলে কুফুরী -শিরকী বিষয় রয়েছে। নাউযুবিল্লাহ। নিজেদের বস্তুবাদী বিকৃত মানসিকতার পরিচয় দিয়ে তারা সাধারণ মানুষকে কারামতে অবিশ্বাসী হওয়ার দাওয়াত দিচ্ছে। অথচ পবিত্র কুরআনের সুরা বাকারাতে মৃত্যুর পরে কথোপকথনের স্পষ্ট ঘটনা রয়েছে। কারামত হিসেবে মৃত্যুর পর কথা বলাতে বিশ্বাস করা যদি কুফুরী -শিরকী হয় , তাহলে তাদের দাবী অনুযায়ী পবিত্র কুরআনে কুফুরী -শিরকী বিষয় রয়েছে। নাউযুবিল্লাহ। একই বিষয় ফাজায়েলে আমলে থাকলে যদি শিরক হয় , তাহলে কুরআনে থাকলে শিরক নয় কেন?

কারামত অস্বীকারকারীরা কি বলতে চায় , কুরআন মানুষকে শিরক শিখিয়েছে ? নাউযুবিল্লাহ। তাদের আরেকটি যুক্তি হল , ঘটনার সত্যতা কি ? ঘটনা সত্য বা মিথ্যা হওয়ার সাথে কুফুরী শিরকীর কী সম্পর্ক ? বিশুদ্ধ সনদে কুফুরী -শিরকী বর্ণনা করা সঠিক আর দুর্বল সনদে কুফুরী শিরকী বর্ণনা অন্যায় ? তাদের দাবী কি এটাই ? তারা বলে , কুরআন-হাদীসে থাকলে ঠিক আছে। কিন্তু একই জিনিস ফাজায়েলে আমলে থাকলে শিরক। এরা আসলে পরোক্ষভাবে কুরআন ও হাদীসে কারামত থাকার কারণে কুরআন -হাদীসকে কুফুরী -শিরকের উৎস বলতে চায়। কিন্তু সাধারণ মানুষের ভয়ে সেটা প্রকাশ করতে পারে না। নতুবা হুবহু একই বিষয়কে কুফুরী -শিরকের বলার তাৎপর্যটা কী ?

ইবনে আব্দুল বার রহ . উক্ত ঘটনা বর্ণনা করার লিখেছেন ,

وهو الذي تكلم بعد الموت لا يختلفون في ذلك

যায়েদ ইবনে খারিজা রা . যিনি মৃত্যুর পর কথা বলেছেন। এ ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ মতবিরোধ করেননি।

ঘটনা -২:

ইমাম বাইহাকী রহ . দালাইলুন নুবুওয়াহতে বর্ণনা করেছেন , হযরত রিবয়ী ইবনে খিরাশ বলেন ,

"আমার এক ভাই মৃত্যুবরণ করল। সে আমাদের মাঝে সবচেয়ে দীর্ঘ নামায আদায় করতো। ঘরমের দিনে সবচেয়ে বেশি রোজা রাখতো। আমরা তাকে কাপড় আবৃত করলাম। সকলে তার পাশে বসে ছিলাম। হঠাৎ সে চেহারার কাপড় সরিয়ে দিয়ে বলল, আস-সালামু আলাইকুম। আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ, মৃত্যুর পরেও? সে বলল, আমি আমার প্রভূর সাথে সাক্ষাৎ করেছি। দয়াময় প্রভূ আমাকে জান্নাত দান করেছেন। তিনি আমার প্রতি রাগান্নিত নন। তিনি আমাকে মণি-মুক্তা খচিত কাপড় পরিধান করিয়েছেন। তোমরা খুব দ্রুত আমাকে রাসূল স. এর কাছে পৌছে দেও। কেননা তিনি আল্লাহর শপথ করেছেন, আমি তার কাছে না পৌছা পর্যন্ত তিনি স্থান ত্যাগ করবেন না। "

ঘটনাটি বিশুদ্ধ সূত্রে রর্ণিত। ঘটনাটি যেসব বিখ্যাতু মুহাদ্দিস উল্লেখ করেছেন,

১. ইমাম বাইহাকী, দালাইলুন নুবওয়াহ, খ.৬, পৃ.৪৫৪

২.ইবনে সায়াদ, আত-ত্ববাকাত, খ.৬, পৃ.১৬০।

৩.আল-ইস্তেয়াব, ইবনে আব্দিল বার, যায়েদ ইবনে খারিজা এর জীবনী।

৪.ইবনে আবিদ দুনিয়া, মান আশা বা'দাল মাউত, বর্ণনা নং ৯ ।

৫. ইবনে হিব্বান, আস-সিকাত, খ.৪, পৃ.৩২৬

উক্ত ঘটনাটি খুবই আশ্চর্যজনক। এধরনের কোন ঘটনা ফাজায়েলে আমল কিংবা দেওবন্দী কোন আলেমের কিতাবে থাকলে এটা অবশ্যই শিরক হতো। এবং এটা নিয়ে যারপর নাই হাশি-তামাশা করতো কারামত অস্বীকারকারী সালাফী ও আহলে হাদীস। আহলে সুন্নত বহির্ভূত বিকৃত মানসিকতার কিছু শায়খ যেমন, তাউসীফুর রহমান রাশেদী, উমর সিদ্দিক, আবু যায়েদ জমীর, তলিবুর রহমান, মতিউর রহমান মাদানী, মুরাদ বিন আমজাদ, আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালামসহ সালাফী মানহাজ থেকে বিচ্যুত লোকেরা সাধারণ মানুষকে কারামত বিদ্বেষী করছে। আর এভাবেই কুরআন-হাদীস ও সালাফে-সালেহীনের কারামতকে হাশি-তামাশার বস্তু বানিয়েছে। নাউযুবিল্লাহ। এরা হকপন্থী আলেমদের উপর কুফুরী-শিরকের যতগুলো অপবাদ দিয়েছে, এর অধিকাংশ এজাতীয় কারামত। কারামতকে কুফুরী শিরকী আখ্যা দেয়ার পাশাপাশি এরা কারামতকে উপহাস করে মূলত: কুরআন-সুন্নাহ নিয়ে উপহাস করেছে। কারণ যেসব কারামত নিয়ে এরা উপহাস করেছে, হুবহু একই ধরনের কারামত কুরআন-হাদীসে রয়েছে। সুতরাং একটিকে নিয়ে উপহাসের অর্থ একই ধরনের অপরটিকেও উপহাসের পাত্র বানানো। এজন্যই আমরা দেখতে পাই, এদের সামনে কিংবা এদের অনুসারীদের সামনে যখন বিশুদ্ধ সূত্রে এজাতীয় কারামত উল্লেখ করা হয়, তখন নির্দ্বিধায় সেগুলো অস্বীকার করে।

কারামত অস্বীকারের ক্ষেত্রে আহলে সুন্নত ও সালাফী মানহাজ বহির্ভূত নব্য মু'তাজিলীদের বাস্তবতা দেখতে এদের লেখা যে কোন বই দেখতে পারেন। বিশেষভাবে আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম সম্পাদিত তাবলীগ জামাত ও দেওবন্দীগণ, মুরাদ বিন

আমজাদের লেখা সহীহ আকিদার মানদন্ডে তাবলীগি নেসাব। কারামত অস্বীকার, এগুলো নিয়ে হাশি -তামাশা, একে কুফুরী -শিরকী আখ্যা দেয়ার মাধ্যমে এরা মূলত: বিভ্রান্ত ফেরকা মু 'তাজেলাদের ভ্রান্ত মতবাদ সমাজে প্রচার করছে। পশ্চিমাদের বস্তুবাদে প্রভাবিত তথাকথিত এসব শায়খদের কিতাব প্রমাণ করছে, পূর্ববর্তী আলেমগণ ও সালাফের অধিকাংশ কুফুরী -শিরকী আকিদা লালন করেছেন। নাউযুবিল্লাহ। কেননা, ইতিহাস, তাফসীর, হাদিস, রাবীদের জীবনীর উপর লেখা এমন কোন কিতাব পাওয়া যাবে না যেখানে এধরনের কারামত নেই। সুতরাং এজাতীয় কারামত লেখা, সেগুলো প্রচার করা যদি কুফুরী -শিরকী হয়, তাহলে সালাফের কেউ এই অপবাদ থেকে বাচবেন কি না সন্দেহ। আমরা এধরনের বিকৃত মানসিকতা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

উপর্যুক্ত ঘটনাটি উল্লেখ করার পর ইমাম বাইহাকী রহ. লিখেছেন,

هذا إسناد صحيح، لا يشك حديثيٌّ في صحته

অর্থ: ঘটনার সনদ সহীহ। এটি সহীহ হওয়ার ব্যাপারে কোন মুহাদ্দিস সন্দেহ করতে পারে না।

ঘটনাটি সালাফীদের অনুসরণীয় শায়খ নাসীরুদ্দীন আলবানী তার কিতাবে উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন,

وبالجملة؛ فالقصة صحيحة بلا شك، والله على كل شيء قدير

অর্থ: "মোট কথা, নি:সন্দেহে ঘটনাটি বিশুদ্ধ (সহীহ)। আল্লাহ তায়ালা সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান"

[সিলসিলাতুস জয়ীফা, ৬৬৭৩ নং হাদীসের আলোচনা দ্রষ্টব্য]

কারামত অস্বীকারকারীদের বাস্তবতা উপলব্ধির জন্য একটি পরীক্ষা করতে পারেন। এসব শায়খদের কাউকে জিজ্ঞাসা করুন, এক দেওবন্দী আলেম উক্ত ঘটনাটি লিখেছেন। এ ঘটনা সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কী? কোন কোন কিতাবে আছে, সেটি না বলে এধরনের পরীক্ষা করতে পারেন। তবে যদি বলেন, শায়খ নাসীরুদ্দীন আলবানী একে নি:সন্দেহে সত্য বলে স্বীকার করেছেন, তাহলে শায়খদের বুলি পাল্টে যাবে। সুতরাং ঘুণাক্ষরে তাদের সামনে এটা বলা যাবে না।

এধরনের কারামতকে অস্বীকার, একে কুফুরী শিরকী বলার ধৃষ্টতা এ পর্যায়ে পৌছেছে যে, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের সর্বসম্মত হায়াতুন্নবীর আকিদাকে কুফুরী আকিদা আখ্যা

দিচ্ছে। নাউযুবিল্লাহ। এদের এই তাকফিরী মনোভাব উম্মাহকে বিভক্ত করছে। সাধারণ মানুষকে সরল সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করে আলেম বিদ্বেষী করছে। আল্লাহ তায়ালা সাধারণ মানুষকে হেফাজত করুন।আমীন।

মৃত্যুপরবর্তী কারামত ও কারামত অস্বীকারকারীদের মনস্তত্ব (পর্ব -৪)

15 May 2015 at 13:26

মৃত্যুর পর কথোপকথন : আমরা আগের পর্বে মৃত্যুর পর কথোপকথনের দু'টি ঘটনা উল্লেখ করেছি। এ বিষয়ে আরও অনেক ঘটনা রয়েছে। সংক্ষিপ্ত কয়েকটি উল্লেখ করে পরবর্তী বিষয়ের দিকে যাবো ইনশাআল্লাহ।

ঘটনা -৩:

বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক ইবনে আসাকির তার তারীখে লিখেছেন,

عن عبد الله بن عتبة الأنصاري ، قال بينما ثم يثورون القتلى يوم مسيلمة إذ تكلم رجل من الأنصار من القتلى ، فقال : محمد رسول الله أبو بكر الصديق عمر الشهيد عثمان الرحيم ثم سكت

আব্দুল্লাহ ইবনে উতবা আল-আনসারী রা. বলেন, মুসালাইমাতুল কাজ্জাবের সাথে যখন ঘোরতর লড়াই চলছিল, আনসারী এক শহীদ কথা বলে উঠল। সে বলল, "মুহাম্মাদ স. আল্লাহর রাসূল। আবু বকর হলেন সিদ্দিক (সত্যবাদী), উমর রা. হলেন শহীদ। উসমান রা. হলেন নম্র ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী। এরপর সে চুপ করল।

তারীখে দিমাশক, খ.৩০, পৃ.৪০৮

মান আশা বা'দাল মাউত, পৃ.১৭, বর্ণনা নং ৮

ঘটনা -৪: জঙ্গে সিফফীন অথবা জঙ্গে জামালে মৃতের কথোপকথন :

ইমাম ইবনে কাসীর রহ. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াতে লিখেছেন,

عن عبد الله بن عبيد الأنصاري ، قال : بينما هم يثورون القتلى يوم صفين أو يوم الجمل إذ تكلم رجلٌ من الأنصار من القتلى فقال محمد رسول الله أبو بكر الصديق عمر الشهيد عثمان الرحيم ثم سكت

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উবায়েদ আল-আনসারী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জঙ্গে জামাল অথবা সিফফীনে যখন ঘোরতর লড়াই চলছিল, হঠাৎ এক আনসারী শহীদ কথা বলে উঠল। সে বলল, মুহাম্মদ স. আল্লাহর রাসূল । আবু বকর হলেন, সত্যবাদী। উমর হলেন শহীদ। উসমান কোমল হৃদয়ের অধিকারী। এরপর সে চুপ করল। "

[আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খ.৬, পৃ.১৫৮]

তারীখে দিমাশক, খ.৩৯, পৃ.২২২

মৃত্যুর পর হাসি:

বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনে আবিদ দুনিয়া রহ. বর্ণনা করেছেন, হারিস আল-গানাবী বর্ণনা করেন, রবী ইবনে খিরাশ কসম খেয়েছিলেন, তিনি পরকালে তার অবস্থান না জানা পর্যন্ত দাঁত বের করে কখনও হাসবেন না। তার মৃত্যুর পরেই কেবল তিনি হেসেছিলেন। রবী ইবনে খিরাশের ভাই রিবয়ী ইবনে খিরাশও একই কসম খেয়েছিলেন। তিনি জান্নাতী না কি জাহান্নামী সেটা না জানা পর্যন্ত হাসবেন না। হারেস আল-গানাবী বলেন, রিবয়ী ইবনে খিরাশের গোসলদাতা আমাকে বলেছে, আমরা যতক্ষণ তাকে গোসল দিচ্ছিলাম ততক্ষণ তিনি খাটের উপর মুচকী হাসছিলেন।

মান-আশা বা'দাল মাউত, পৃ.২০, বর্ণনা নং ১২ ।

মৃত্যুর পর হাসি সংক্রান্ত সাম্প্রতিক কারামত:

শহীদ ড. আব্দুল্লাহ আজজাম রহ. তার আয়াতুর রহমানে আফগান মুজাহিদগণের অনেক কারামত উল্লেখ করেছেন। শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করার পর অনেক শহীদ হেসেছেন। এধরনে কিছু ঘটনা শায়খের কিতাব থেকে,

১. আমার নিকট আরসালান বর্ণনা করেছে, মুজাহিদ আব্দুল জলিল ত্বালিবে ইলম (ছাত্র) ছিল। খুব নেককার ছেলে ছিল। বোম্বিং এ সে শাহাদাৎ বরণ করে। আসর সময় তার জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। আসরের পরে তাকে তার পিতার ঘরে দাফনের জন্য নেয়া হয়। সকাল পর্যন্ত তার লাশ সেখানে ছিল। মুজাহিদগণ তার কাছেই ছিল। সকাল পর্যন্ত সে চোখ খুলছিল, আর মুচকী হাসছিল। মুজাহিদগণ আরসালানের নিকট এসে বলল, আব্দুল জলিল তো মৃত্যুবরণ করেনি। আরসালান বললেন, সে শহীদ হয়েছে। অন্যরা বলল, তার মৃত্যু নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে কীভাবে দাফন করব? সে জীবিত থাকলে তার উপর নতুনভাবে জানাযা পড়তে হবে। আরসালান বললেন, সে গতকালই ইন্তেকাল করেছে। তবে এটি শহীদের বিশেষ কারামত।

-আয়াতুর রহমান, পৃ.১২৭

২. বাগমানের প্রধান কমান্ডার মুহাম্মদ উমর আমার কাছে বর্ণনা করেছে, আমাদের সাথী হামিদুল্লাহ শহীদ হল। দাফনের সময় আমি তাকে হাসতে দেখলাম। আমি প্রথমে মনে করেছিলাম, এটা আমার চোখের ভুল। পরবর্তীতে ভালোভাবে লক্ষ্য করলাম, সে আসলেই হাসছিল।

-আয়াতুর রহমান, পৃ.১২৭

৩. বিখ্যাত কমরান্ডার ফাতহুল্লাহ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, মুজাহিদ সুহাইত খানের দাফনের চার দিন পর আমরা তার কবর উন্মুক্ত করি। কবর খুড়ে দেখি, সে মুচকী হাসছে। আল্লাহু আকবার, আমি দেখেছি, সে চোখ খুলে আমাদেরকে দেখছিল।

-আয়াতুর রহমান, পৃ.১২৭

কারামত অস্বীকারকারী ভাইয়েরা এসব কারামত থেকে নিশ্চয় শিরকের গন্ধ পেয়ে গেছেন। ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া, ইবনে কাসীর, ইবনে আসাকির, আব্দুল্লাহ আজ্জাম উম্মতের মাঝে শিরক প্রচার করেননি। আবার তারা নিজেরাও এসব বিশ্বাস করে শিরক করেননি। এধরনের কারামতে বিশ্বাস যদি শিরক হয়, তাহলে ইবনে কাসীর রহ. শিরকে লিপ্ত ছিলেন, এই ফতোয়া দিয়ে দিন। তাফসীরে ইবনে কাসীর পড়া নিষিদ্ধ করুন। আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া নিষিদ্ধ করুন। কারণ আল-বিদায়াতে এধরনের অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। আমরা পর্বে পর্বে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। যেসব সহীহ আকিদার কারামত অস্বীকারকারী ভাইয়েরা ফাজায়েলে আমলের এধরনের ঘটনা থেকে শিরকের গন্ধ পান, তারা কি আল-বিদায়ার একই ঘটনা থেকে তাউহীদের গন্ধ পান? তাদের এই স্ববিরোধী আচরণ আমাদেরকে বিস্মিত করে। শুধু বিরোধীতার জন্যই যে বিরোধীতা হয়, এই বাস্তবতা আরও প্রকট করে তোলে। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে দীনের সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন।

মৃত্যুপরবর্তী কারামত ও কারামত অস্বীকারকারীদের মনস্তত্ব (পর্ব-৫)
16 May 2015 at 16:38

মৃত্যুপরবর্তী কার্যক্রম ও দুনিয়াতে এর প্রতিক্রিয়া:

আর রুহ ইবনুল কাইয়্যিম রহ. এর বিখ্যাত একটি কিতাব। ইবনে তাইমিয়া রহ. এর ইন্তেকালের পরে তিনি কিতাবটি লিখেছিলেন।

ইবনুল কাইয়্যিম রহ. কিতাবুর রুহে লিখেছেন,

وأما من حصل له الشفاء بإستعمال دواء رأى من وصفه له في منامه فكثير جدا وقد حدثنى غير واحد ممن كان غير مائل إلي شيخ الإسلام ابن تيمية أنه رآه بعد موته وسأله عن شيء كان يشكل عليه من مسائل الفرائض وغيرها فأجابه بالصواب

وبالجملة فهذا أمر لا ينكره إلا من هو أجهل الناس بالأرواح وأحكامها وشأنها وبالله التوفيق

[illegible]

[illegible]

http://islamport.com/w/qym/Web/3173/30.htm

[illegible]

ومما ينبغي أن يعلم أن ما ذكرنا من شأن الروح يختلف بحسب حال الأرواح من القوة والضعف والكبر والصغر، فللروح العظيمة الكبيرة من ذلك ما ليس لمن هو دونها. وأنت ترى أحكام الأرواح في الدنيا كيف تتفاوت أعظم تفاوت بحسب تفارق الأرواح في كيفياتها وقواها وإبطائها وإسراعها والمعاونة لها، فللروح المطلقة من أسر البدن وعلائقه وعوائقه من التصرف والقوة والنفاذ والهمة وسرعة الصعود إلى الله والتعلق بالله ما ليس للروح المهينة المحبوسة في علائق البدن وعوائقه، فإذا كان هذا وهي محبوسة في بدنها فكيف إذا تجردت وفارقته واجتمعت فيها قواها وكانت في أصل شأنها روحا علية زكية كبيرة ذات همة عالية، فهذه لها بعد مفارقة البدن شأن آخر وفعل آخر. وقد تواترت الرؤيا في أصناف بني آدم على فعل الأرواح بعد موتها ما لا تقدر على مثله حال اتصالها بالبدن من هزيمة الجيوش الكثيرة بالواحد والاثنين والعدد القليل ونحو ذلك، وكم قد رئي النبي (صلى الله عليه وسلم) ومعه أبو بكر وعمر في النوم قد هزمت أرواحهم عساكر الكفر والظلم فإذا بجيوشهم مغلوبة مكسورة مع كثرة عَدَدهم وعُدَدهم وضعف المؤمنين وقلتهم

[illegible]

আল্লাহর দিকে ধাবিত হওয়ার ক্ষমতা থাকে, যেটা দেহের বন্ধনে আবদ্ধ বন্দী রুহের থাকে না। দেহের বন্ধনে আবদ্ধ থাকার পরও রুহের অনেক অপ্রাকৃতিক কার্যক্রম দেখা যায়, সুতরাং এটি দেহের বন্ধ মুক্ত হয়ে এর পরিপূর্ণ শক্তি ও প্রকৃত বাস্তবতায় যখন ফিরে যায়, পবিত্র ও অধিক শক্তিসম্পন্ন এসব রুহের কার্যক্রম তাহলে কেমন হবে? দেহের বন্ধনে আবদ্ধ রুহের কার্যক্রম থেকে দেহের বন্ধ মুক্ত রুহের কার্যক্রম ভিন্ন।
রুহের কার্যক্রম সম্পর্কে এতো অধিক বর্ণনা রয়েছে যে, এগুলো অস্বীকারের উপায় নেই। মৃত্যুর পরে রুহের কার্যক্রম সম্পর্কে অসংখ্য স্বপ্ন বর্ণিত হয়েছে। মৃত্যুর পরে রুহের মাধ্যমে এমন সব ঘটনা ঘটেছে, যেটি জীবিত থাকা অবস্থায় সম্ভব নয়। যেমন, একজন, দু 'জন অথবা সামান্য কিছু লোক বিশাল সেনাবাহিনীকে পরাজিত করা। অসংখ্য লোক রাসূল স. কে স্বপ্নে দেখেছে, তার সাথে হযরত আবু বকর ও হযরত উমর রা. রয়েছেন। তাদের রুহ কাফেরদের সেনাবাহিনীকে পর্যুদস্ত করে দিয়েছে। কাফেরদের পরাজিত ছিন্ন-ভিন্ন সেনাদের লাশ ছড়িয়ে থাকে। অথচ তাদের সংখ্যা মুসলমানদের তুলনায় বহুগুণ বেশি ছিল। মুসলমানরা সংখ্যা ও শক্তিতে ছিল খুবই নগন্য।

ইবনুল কাইয়্যিম রহ. মৃত্যুর পর রুহের কার্যক্রম ও এর প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত অনেক ঘটনা উল্লেখ করেছেন। এজাতীয় কিছু ঘটনা নীচে উল্লেখ করা হল।

ইবনুল কাইয়্যিম রহ. 'আর-রুহ ' কিতাবে লিখেছেন,

في كتاب المنامات لابن أبي الدنيا عن

شيخ من قريش قال : رأيت رجلاً بالشام قد أسود نصف وجهه وهو يغطيه ، فسألته عن ذلك فقال : قد جعلت لله على أن لا يسألني أحد عن ذلك إلا أخبرته به ، كنت شديد الوقيعة في علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، فبينا أنا ذات ليلة نائم إذ أتاني آت في منامي فقال لي : أنت صاحب الوقيعة فيّ ؟ فضرب شق وجهي ، فأصبحت وشق وجهي أسود كما ترى

অর্থ : ইবনে আবিদ দুনিয়া রহ. এর আল-মানামাত গ্রন্থে রয়েছে, জনৈক কুরাইশি ব্যক্তি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শামে এক ব্যক্তিকে দেখলাম, তার চেহারার অর্ধেক অংশ কালো হয়ে গেছে। সে এই অংশটা ঢেকে রাখার চেষ্টা করছে। আমি তাকে চেহারা কালো হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। সে বলল, আমি আল্লাহর কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে, এ বিষয়ে কেউ আমাকে প্রশ্ন করলে আমি তাকে বিষয়টি বলব। আমি হযরত আলী রা. খুব গালাগালি করতাম। আমি এক রাতে ঘুমিয়েছিলাম। স্বপ্নে এক ব্যক্তি আমার কাছে এল। এসে আমাকে বলল, তুমি কি আমাকে গালাগালি করো? এরপর তিনি আমার মুখে চড় মারলেন। সকালে উঠে দেখি মুখের একাংশ কালো হয়ে আছে।

কিতাবুর রুহ, পৃ. ১৮৯

ঘটনাটি স্পষ্ট। হযরত আলী রা . তার ইন্তেকালের পরে একজনের স্বপ্নে আগমন করলেন। তাকে চড় মারার কারণে তার মুখে চড়ের প্রভাব রইল। ঘটনাটি সালাফীদের ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহ. লিখেছেন। এধরনের বিশ্বাস শরীয়ত বিরোধী না কি শরীয়ত সম্মত ? এটা যদি শরীয়ত বিরোধী হয়, তাহলে তার অবস্থান কী ? এটা কুফুরী , শিরকী, না কি বিদয়াত ?

কিছু সালাফী ভাই বলবেন , আমরা ইবনুল কাইয়্যিমকে মানি না। ভালো কথা। আপনারা শুধু ইবনুল কাইয়্যিম নয় , আরও অনেক আলেম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবেন। সেই সময়টাও আসছে ইনশাআল্লাহ। এই তালিকা দীর্ঘ হতে থাকবে। তবে আমাদের প্রশ্ন হল , তিনি ভুল করেছেন , তাকে অনুসরণ করি না , এগুলো আমরা শুনতে চাই না ? এধরনের বিশ্বাস রাখার কারণে ইবনুল কাইয়্যিম সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্য দিন। তিনি কি কুফুরী না কি শিরকী করেছে ?

দেওবন্দী আলেম যখন রাসূল স . কে স্বপ্ন দেখল , এবং সেই স্বপ্নের বাস্তব প্রভাব পরবর্তীতে দেখা গেল , সেটা তো আপনাদের কাছে মহা শিরক। তাহলে এই ঘটনা শিরক নয় কেন ? রাসূল স . স্বপ্নে দারুল উলুম দেওবন্দের পরিধি একে দিলেন , বাস্তবে তার প্রভাব দেখা গেল, এটা আপনাদের কাছে শিরক। তাহলে ইবনুল কাইয়্যিম রহ . যে ঘটনা লিখলেন সেটা শিরক নয় কি?

ঘটনা -২:

ইবনুল কাইয়্যিম রহ . কিতাবুর রুহে লিখেছেন ,

: وذكر ابن أبي الدنيا عن أبي حاتم الرازي ، عن محمد بن علي ، قال : كنا بمكة في المسجد الحرام قعوداً ، فقام رجل نصف وجهه أسود ونصفه أبيض ، فقال : يا أيها الناس اعتبروا بي ، فإني كنت أتناول الشيخين وأشتمهما ، فبينما أنا ذات ليلة نائم إذ أتاني آت ، فرفع يده فلطم وجهي وقال لي : يا عدو الله ، يا فاسق ، ألست تسب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ، فأصبحت وأنا على هذه الحالة .

অর্থ : বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনে আবিদ দুনিয়া রহ . আবু হাতিম রাজী রহ . থেকে বর্ণনা করেছে , তিনি মুহাম্মাদ বিন আলী থেকে বর্ণনা করেন , তিনি বলেন , আমরা মক্কায় মসজিদুল হারামে বসা ছিলাম। সেখানে এক ব্যক্তি দাড়াল , যার চেহারার অর্ধেক কালো ও অর্ধেক সাদা ছিল। লোকটি দাড়িয়ে বলল , লোক সকল, আমাকে দেখে শিক্ষা গ্রহণ করো। আমি হযরত আবু বকর ও হযরত উমর রা.কে অসম্মান ও গালাগালি করতাম। আমি এক রাতে ঘুমিয়েছিলাম। আমার কাছে এক ব্যক্তি এল। সে হাত উঠিয়ে আমার মুখে চড় মারল। আমাকে বলল , হে আল্লাহর শত্রু , ফাসিক, তুমি কি আবু বকর রা . ও উমর রা. কে গালাগালি করো না ? আমি সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি , আমার মুখের এই অবস্থা।

[কিতাবুর রুহ , পৃ .২১৭, মাকতাবাতুস সফা]

এধরনের আরও অনেক ঘটনা কিতাবুর রুহে রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে এ'দুটিই যথেষ্ট। স্বপ্নে বা রুহের জগতে কোন কিছু সংঘঠিত হওয়া এবং বাস্তবে এর প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘটনার জন্য আর-রুহ কিতাবটি দেখতে পারেন। ইবনে তাইমিয়া রহ. এর দীর্ঘ সংশ্রবের পর ইবনুল কাইয়্যিম রহ. যে কিতাব সংকলন করেছেন, সেগুলোতে এসব ঘটনা রয়েছে। এসব ঘটনা তিনি কিতাবে উল্লেখ করেছেন। এগুলো থেকে রুহের বিভিন্ন কার্যক্রম ব্যাখ্যা করেছেন। আমাদের প্রশ্ন হল, হুবহু একই বিষয় দেওবন্দী আলেমের কিতাবে থাকার পরেও সেটি যদি কুফুরী-শিরকী হয়, তাহলে ইবনুল কাইয়্যিম রহ. এর কিতাব কীভাবে সহীহ আকিদা হয়? তাহলে কি দেওবন্দী আলেমদের বক্তব্য পরিমাপের দাড়িপাল্লা একটি, আর সালাফী আলেমদের বক্তব্য মাপার দাড়িপাল্লা আরেকটি? স্বপ্নে কিছু সংগঠিত হওয়া এবং বাস্তবে তার প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হওয়া যদি কুফুরী-শিরকী হয়, তাহলে এই ফতোয়াটি ইবনুল কাইয়্যিমের উপর আরোপ করুন। ইবনুল কাইয়্যিম রহ. এর কুফুরী-শিরকী আকিদা নামে লেকচার তৈরি করুন। আমরা দেখতে চাই, সহীহ আকিদার দাবীদারগণ কতটা নিরপেক্ষ এবং তারা সত্যিকার দাওয়াতী মেহনত করছে না কি পেট্র-ডলার অপছায়া তাদেরকে গ্রাস করেছে?

পরিশেষে আমরা একটা নিবেদন রাখতে চাই, যে বিষয়গুলো সম্পূর্ণ শরীয়ত সম্মত, যেখানে শরীয়ত বিরোধী কোন কিছুরই সম্পৃক্ততা নেই, সেটা কীসের ভিত্তিতে কুফুরী শিরকী বলেন? আল্লাহ তায়ালা কি বলেছেন, স্বপ্নের ঘটনার বাস্তব প্রতিক্রিয়ায় কেউ বিশ্বাস করলে সে কাফের? রাসূল স. কী বলেছেন, তোমরা স্বপ্নের ঘটে যাওয়া কোন কিছুর বাস্তব প্রতিক্রিয়ায় বিশ্বাস করবে না। কারণ এটি শিরক? শরীয়তের কোন দলিলের ভিত্তিতে এটা কুফুরী বা শিরকী? আপনারা যেহেতু কুরআন ও হাদীস ছাড়া কিছুই দলিলযোগ্য মনে করেন না, তাহলে বলুন, কুরআন ও হাদীসের কোথায় এগুলোকে কুফুরী-শিরকী বলা আছে। সুস্পষ্ট বক্তব্য আনুন। যদি কুরআন ও হাদীসের এধরনের সুস্পষ্ট কোন বক্তব্য দেখাতে পারেন, তাহলে ফতোয়া দিন। আর সেই ফতোয়াটি শুধু দেওবন্দী আলেমের বিরুদ্ধে নয়, সেটা নিজেদের ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. ও ইবনুল কাইয়্যিম রহ. এর উপর আগে আরোপ করতে হবে। এটাই ইনসাফের দাবী।

মৃত্যুপরবর্তী কারামত ও কারামত অস্বীকারকারীদের মনস্তত্ব (পর্ব-৬)
19 May 2015 at 14:31

মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন লাভ

ইবনে কাসীর রহ. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াতে বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনে আবিদ দুনিয়ার সূত্রে ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। ইবনে আবিদ দুনিয়া রহ. নিজ সনদে বর্ণনা করেন, রবীয়া ইবনে কুলসুম জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন, উক্ত ব্যক্তির এক বৃদ্ধা প্রতিবেশী ছিল। তিনি অন্ধ ও কিছুটা বধির ছিলেন। হাটা-চলা করতে পারতেন না। তার একটি মাত্র ছেলে ছিল। ছেলেটি তার দেখা-শোনা করতো। ছেলেটি মৃত্যুবরণ করল। আমরা এসে বৃদ্ধাকে বললাম, মুসীবতে আল্লাহর উপর সবর করুন। তিনি বললেন, কী হয়েছে? আমার ছেলে কি মারা গেছে? হে আমার মাওলা, আমার উপর রহম করো। আমার থেকে আমার ছেলেকে নিও না। আমি অন্ধ, বধির ও অচল। আমার দুনিয়াতে আর কেউ নেই। মাওলা, আমার উপর রহম করুন।

আমি বললাম, বৃদ্ধার স্মৃতিভ্রম হয়েছে। এই বলে আমি বাজারে গেলাম। আমি তার কাফনের কাপড় ক্রয় করে নিয়ে এলাম। ফিরে এসে দেখি সে জীবিত হয়ে বসে আছে।

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খ.৬, পৃ.১৫৪।

২.দালাইলুন নুবুওয়া, খ.৬, পৃ.৫০-৫১

ইবনে কাসীর রহ. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াতে নীচের ঘটনাটি লিখেছেন। ঘটনাটি ইবনে আবিদ দুনিয়া রহ. মান আশা বা'দাল মাউত কিতাবে উল্লেখ করেছেন,

এক দল লোক ইয়ামান থেকে আল্লাহর পথে বের হল। পথিমধ্যে তাদের একজনের গাধা মৃত্যুবরণ করল। তার সহযাত্রীরা তাকে অন্য গাধার উপর আরোহরণের অনুরোধ জানাল। কিন্তু সে অস্বীকার করল। সে উঠে উজু করল। নামায আদায় করে দুয়া করল,

" হে আল্লাহ, আমি দাফিনা শহর থেকে আপনার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়েছি। আমি একমাত্র আপনার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এসেছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি মৃতকে জীবিত করেন। আপনি কররবাসীকে পুনরায় জীবন দান করবেন। সুতরাং আমাকে কারও অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী করবেন না। আমি আপনার কাছে দুয়া করছি, আপনি আমার গাধা জীবিত করে দিন। এরপর সে গাধার কাছে গেল। গাধাকে উঠার জন্য একটি আঘাত করল। গাধাটি দাড়িয়ে কান ঝাড়তে শুরু করল। সে পুনরায় গাধায় তার সফরের পাথেয় উঠিয়ে যাত্রা করল। কিছুদূর গিয়ে তার সঙ্গীদের সাথে মিলিত হল। তারা তাকে জিজ্ঞাসা করল, এটা কীভাবে হল?

সে বলল, আল্লাহ তায়ালা আমার গাধা জীবিত করে দিয়েছেন। ইমাম শা'বী বলেন, আমি সেই গাধাটি কান্নাসা নামক বাজারে বিক্রি হতে দেখেছি।

সূত্র: আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খ.৬, পৃ.১৫৪

২. মান আশা বা 'দাল মাউত, বর্ণনা নং ২৯।

৩. দালাইলুন নুবুওয়াহ, খ.৬, পৃ .৪৯

এধরনের একটি ঘটনা ইবনে তাইমিয়া রহ. তার মাজমুয়াতুল ফাতাওয়া-তে লিখেছেন। ইবনে তাইমিয়া রহ. লেখেন,

ورجل من النخع كان له حمار فمات في الطريق فقال له أصحابه : هلم نتوزع متاعك على رحالنا، فقال لهم : أمهلوني هنيئة ، ثم توضأ فأحسن الوضوء وصلى ركعتين ودعا الله تعالى فأحيا حماره فحمل عليه متعاه .

অর্থ : নাখ' এর অধিবাসী এক ব্যক্তির একটি গাধা ছিল। যাত্রাপথে গাধাটি মৃত্যুবরণ করে। তার সহযাত্রীরা বলল, আমরা তোমার মাল-সামানা ও পাথেয় আমাদের গাধাগুলোতে বন্টন করে নেই। সে তাদেরকে বলল। আমাকে কিছুক্ষণ সময় দাও। এরপর সে উত্তমরূপে ওজু করল। দু'রাকাত নামায আদায় করে আল্লাহর কাছে দুয়া করল। আল্লাহ তায়ালা তার গাধা জীবিত করে দিলেন। এরপর সে গাধার উপর তার পাথেয় উঠালো।

মাজমুউল ফাতাওয়া, খ.১১, ২৮১।

একই ধরনের একটি ঘটনা ইমাম শা'বী থেকে ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তার আল-ইসাবাগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি হযরত উমর রা. এর সময় সংগঠিত হয়। এক্ষেত্রে শাইবান নামক এক ব্যক্তির গাধা মৃত্যুবরণ করলে পরবর্তীতে সে নামায আদায় করে দুয়া করে। আল্লাহ তায়ালা তার গাধাটি জীবিত করে দেন।

[আল-ইসাবা, খ.৩, পৃ .২২৭, বর্ণনা নং ৩৯৮৮]

হযরত হামজা রা. এর কবর থেকে সালামের উত্তর:

ইমাম ইবনে কাসীর রহ. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াতে ঘটনাটি লিখেছেন। হযরত আত্তাফ বিন খালিদ তার খালা থেকে বর্ণনা করেন, এক দিন আমি উহুদের শহীদগণের কবরের দিকে যাই। (তিনি প্রায়ই তাদের কবর জিয়ারত করতেন)। তিনি বলেন, আমি হযরত হামরা রা. এর কবরের নিকট বাহন থেকে নামলাম। আল্লাহর তৌফিকে সেখানে কিছু নামায আদায় করলাম। উপত্যকায় আর সাড়া-শব্দ দেয়ার মতো কেউ ছিল না। আমার বাহনের লাগাম ধরে ছিল ছোট্র একটি ছেলে ছিল। আমি কবরের উদ্দেশ্যে আস-সালামু আলাইকুম বললাম। আমি স্পষ্ট মাটির নীচ থেকে সালামের উত্তর

পেলাম। ওয়ালাইকুমুস সালাম। আমার কাছে উত্তরটি এতটা স্পষ্ট ও সুনিশ্চিত যেমন, আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করেছেন, এটা সুনিশ্চিত। রাত্র-দিনের পার্থক্য যেমন সুস্পষ্ট, এই সালামের উত্তরও তেমনি সুস্পষ্ট। সালামের উত্তর শুনে আমার প্রত্যেকটি লোমকূপ দাড়িয়ে গেল। আমার শরীর ভয়ে শিহরিত হল।

[আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খ.৪, পৃ.৪৫, দালাইলুন নুবুওয়াহ, ইমাম বাইহাকী রহ. খ.৩, পৃ.৩০৮]

হযরত হামজা রা. এর কবর থেকে সালামের উত্তর আসার ঘটনাটি কারামত অস্বীকারকারীদের নিকট শিরক। মৃত্যুর পরে কবর থেকে কীভাবে সালামের উত্তর দেয়? সুতরাং এটি ইবনে কাসীর রহ. উল্লেখ করলেও তাদের নিকট এটি শিরক। ইমাম বাইহাকী, ইবনে কাসীর ও ইবনে আবিদ দুনিয়া রহ. এর থেকে শিরকের গন্ধ না পেলেও কারামত অস্বীকারকারী সালাফী আহলে-হাদীসরা ঠিকই এর থেকে শিরকের গন্ধ পায়।

বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনে আবিদ দুনিয়া রহ. মৃত্যুর পরে জীবন লাভের উপর পৃথক একটি কিতাব লিখেছেন। এখানে তিনি সনদসহ ৬৪ টি ঘটনা ও বর্ণনা এনেছেন। তার বিখ্যাত কিতাবের নাম হল, মান আশা বা'দাল মাউত (মৃত্যুপর পরে যারা জীবন লাভ করেছে)। এই কিতাব থেকে ইবনে কাসীর রহ, ইমাম বাইহাকি রহ, ইমাম সূয়ূতী রহ, ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী রহ. তাদের কিতাবে বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করেছেন। সুতরাং এসকল কারামতকে কুফুরী-শিরকী আখ্যা দিয়ে এসকল সালাফী ও আহলে হাদীস ভাইয়েরা এসব ইমাম ও মুহাদ্দিসকে কুফুরী -শিরকীর অপবাদ দিয়েছে। এধরনের তাকফিরী মানসিকতা থেকে অধিকাংশ ইমামই মুক্ত নয়। আল্লাহ তায়ালা সালাফী-আহলে হাদীসদের তাকফিরের ফেতনা থেকে উম্মাহকে হেফাজত করুন। আমীন।

মৃত্যুপরবর্তী কারামত ও কারামত অস্বীকারকারীদের মনস্তত্ব (পর্ব-৭)
22 May 2015 at 13:27

মৃত্যুর পর বিভিন্ন আমল

বিখ্যাত ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী রহ. কবরের বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে বিখ্যাত একটি কিতাব লিখেছেন। আহওয়ালুল কুবুর কিতাবের নাম। রুহ, বারজাখ ও কবর সম্পর্কে অনেকেই কিতাব রচনা করেছেন। এর মধ্যে বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনে আবিদ দুনিয়া রহ. আল-কুবুর কিতাবটি সবচেয়ে প্রাচীন। এছাড়া ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. আজ-জুহদ কিতাবে এসম্পর্কিত বেশ কিছু বর্ণনা রয়েছে। এ বিষয়ে পৃথক কিতাব লিখেছেন, ইবনুল কাইয়্যিম রহ.। ইবনুল কাইয়্যিম রহ. এর আর-রুহ কিতাবটি বিখ্যাত। এছাড়াও জালালুদ্দীন সূয়ূতী রহ.

শরহুস সুদুর নামে বারজাখ বা কবরের জীবনের উপর কিতাব লিখেছেন। জালালুদ্দীন সূয়ূতী রহ. এর কিতাবটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল , এতে পূর্ববর্তী লিখিত বিভিন্ন কিতাবের সার নির্যাস তুলে ধরেছেন।

মৃত্যুর পর বিভিন্ন আমল সম্পর্কে উপর্যুক্ত কিতাবগুলোর প্রত্যেকটিতেই আলোচনা রয়েছে। আমরা ইবনে রজব হাম্বলী রহ . এর কিতাব থেকে আলোচনার মৌলিক অংশটি তুলে ধরব।

মৃত্যুপরবর্তী আমল সম্পর্কে আমাদের আকিদা :

এ বিষয়ে ইবনে রজব হাম্বলী রহ . বলেন,

بعض أهل البرزخ يكرمه الله بأعماله الصالحة عليه في البرزخ وإن لم يحصل له ثواب تلك الأعمال لانقطاع عمله بالموت لكن إنما يبقى عمله عليه ليتنعم بذكر الله وطاعته كم يتنعم بذلك الملائكة وأهل الجنة في الجنة وإن لم يكن لهم ثواب على ذلك لأن نفس الذكر والطاعة نعيما عند أهلها من نعيم جميع أهل الدنيا ولذاتها

অর্থ : আল্লাহ তায়ালা কিছু কিছু কবরবাসীকে কবরে নেক আমল করার সুযোগ দিয়ে সম্মানিত করেন। তারা এসব আমলের কোন সওয়াব পান না। মৃত্যুর মাধ্যমে তারা আমলের সওয়াব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে (তিনটি ব্যতিক্রম ব্যতীত)। তবে কবরের জীবনে তাদেরক আমলের সুযোগ দেয়া হবে। এসব আমল তথা আল্লাহর জিকির ও আনুগত্যের মাধ্যমে তারা বিশেষ স্বাদ পেতে থাকবে। যেমন ফেরেশতা ও জান্নাতবাসীগণ আল্লাহর ইবাদত ও জিকিরের মাধ্যমে বিশেষ স্বাদ আস্বাদন করে থাকে। যদিও তারা এর কোন সওয়াব পান না। কেননা মূল জিকির ও ইবাদতও অনেক বড় নেয়ামত। দুনিয়ার সকল ইবাদত ও স্বাদ এর তুলনায় নগন্য ও তুচ্ছ।

-আহওয়ালুল কুবুর , পৃ .৬৮, ৬৯।

এ সম্পর্কে ইবনে তাইমিয়া রহ . বলেন,

" هذه الصلاة ونحوها مما يتمتع بها الميت ويتنعم بها كما يتنعم أهل الجنة بالتسبيح ، فإنهم يلهمون التسبيح كما يلهم الناس في الدنيا النَّفَس ؛ فهذا ليس من عمل التكليف الذي يطلب له ثواب منفصل ، بل نفس هذا العمل هو من النعيم الذي تتنعم به الأنفس وتتلذذ به "

অর্থ : এধরনের নামায ও ইবাদত দ্বারা মৃত্য ব্যক্তি বিশেষ স্বাদ উপভোগ করে থাকে। যেমন জান্নাতবাসীগণ তাসবীহ পড়ার মাধ্যমে স্বাদ উপভোগ করবে। দুনিয়াতে প্রত্যেক মানুষ

যেমন শ্বাস -প্রশাস নেয় , তেমনি জান্নাতে মানুষ তাসবীহ পাঠ করবে। এগুলো তাদের উপর অপরিহার্য কোন শরয়ী নির্দেশনা নয়। এর জন্য পৃথক কোন সওয়াবও থাকবে না। বরং মূল আমলই বিশেষ নেয়ামত , যার মাধ্যমে অতুলনীয় স্বাদ আস্বাদন করবে।

[মাজমুয়াতুল ফাতাওয়া , খ.৪, পৃ .৩৩০]

এ বিষয়ে ইমাম কুরতুবী রহ . সহ আরও অনেক ইমামের বক্তব্য রয়েছে। ইবনে রজব রহ . হাম্বলী রহ. মৃত্যুর পর ইবাদত সম্পর্কে বেশ কিছু ঘটনা উল্লেখ করেছেন। আমরা এখানে কয়েকটি উল্লেখ করছি।

১. আল্লামা আবু নুয়াইম নিজ সনদে ইয়াসার ইবনে হুবাইশ থেকে , তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন,

عن يسار بن حبيش عن أبيه قال أنا والذي لا إله إلا هو أدخلت ثابت البناني في لحده ومعي حميد ورجل غيره فلما سوينا عليه اللبن سقطت لبنه فإذا به يصلي في قبره فقلت للذي معي ألا تراه قال اسكت فلما سوينا عليه وفرغنا أتينا ابنته فقلنا لها ما كان عمل ثابت قال وما رأيتم فأخبرناها فقالت كان يقوم الليل خمسين سنة فإذا كان السحر قال في دعائه اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطينها فما كان الله ليرد ذلك الدعاء

অর্থ : একমাত্র ইলাহ আল্লাহ তায়ালার শপথ , আমি, হুমাইদ ও আরেক ব্যক্তি সাবেত আল -বুনানীকে দাফন করার উদ্দেশ্যে তার কবরে অবতরণ করি। আমরা যখন দাফন সমাধা করে কবরে ইট বিছিয়ে দিলাম। উপর থেকে একটি ইট সরে গেল। আমরা আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলাম যে সে কবরে নামায আদায় করছে। আমি আমার সঙ্গীকে বললাম , তুমি তাকে দেখছো ? সে বলল, চুপ করো। আমরা সঠিকভাবে দাফন সম্পন্ন করে তার মেয়ের নিকট এলাম। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম , সাবেতের আমল কী ছিল ? আমরা যা দেখেছি , তার কাছে বলা হল। সে বলল , সে পঞ্চাশ বছর যাবৎ রাত জেগে নামায আদায় করতো। ফজর হলে সে দুয়া করতো, হে আল্লাহ , আপনি যদি কবরে কাউকে নামায পড়ার সুযোগ দেন , তাহলে আমাকে সেই সুযোগ দিন। সুতরাং আল্লাহ তার দুয়া প্রত্যাখ্যান করেননি।

-আহওয়ালুল কুবুর , পৃ .৭০

-শরহুস সুদুর , জালালুদ্দীন সুয়ূতী , পৃ .১৮৮ ।

-মুখতাসারু সাফওয়াতিস সাফওয়া , খ.১, পৃ .২৯৬।

আশ্চর্যের বিষয় হল, সালাফীদের অনুসরণীয় শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজদী তার 'আহকামু তামান্নিল মাউত' কিতাবে এই বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন। আহকামু তামান্নিল মাউত শায়খ নজদীর নিজের হাতের লেখা। এটি তাহকীক করেছে আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ সাদহান ও শায়খ আব্দুল্লাহ ইবনে জিবরীন। সৌদি থেকে আব্দুল ওহাব নজদীর সকল বই ও রচনা একত্রে প্রকাশ করা হয়েছে মুয়াল্লাফাতুশ শাইখিল ইমাম নামে। মুহাম্মাদ বিন সউদ ইউনিভার্সিটিতে শায়খ আব্দুল ওহাব নজদীর উপর একটি সেমিনার করা হয়। শায়খের বিভিন্ন রচনা ও চিঠি ইত্যাদি সংকলনের উদ্দেশ্যে বোর্ড গঠন করা হয়। এই বোর্ডের তত্ত্বাবধানে তার রচনাসমগ্র ১৩ খন্ডে প্রকাশিত হয়। রচনা সমগ্রের ৩ খন্ডে আহকামু তামান্নিল মাউত কিতাবটি রয়েছে। যে কেউ ডাউন লোক করতে পারবেন নীচের লিংক থেকে। http://waqfeya.com/book.php?bid=3697

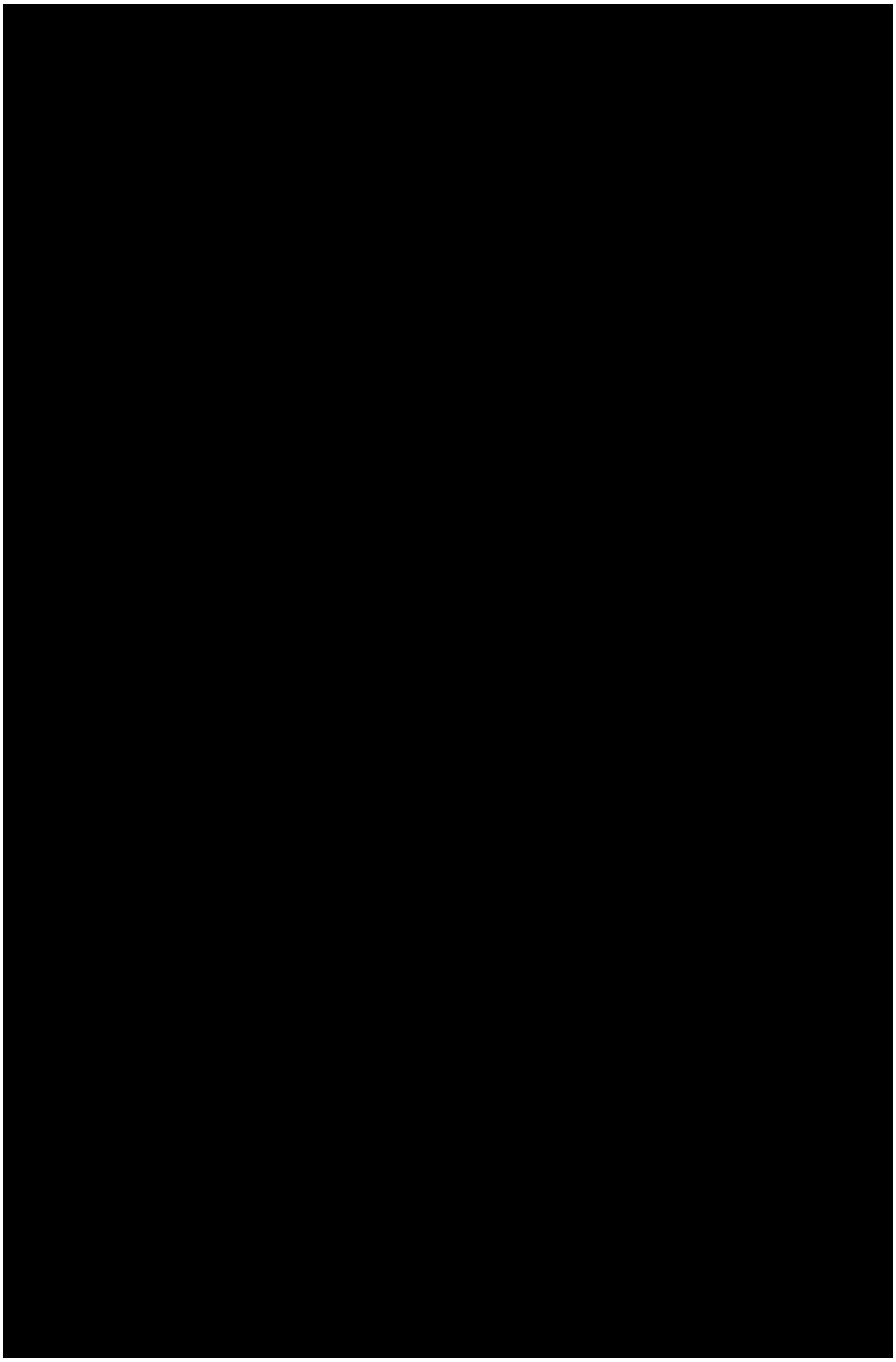

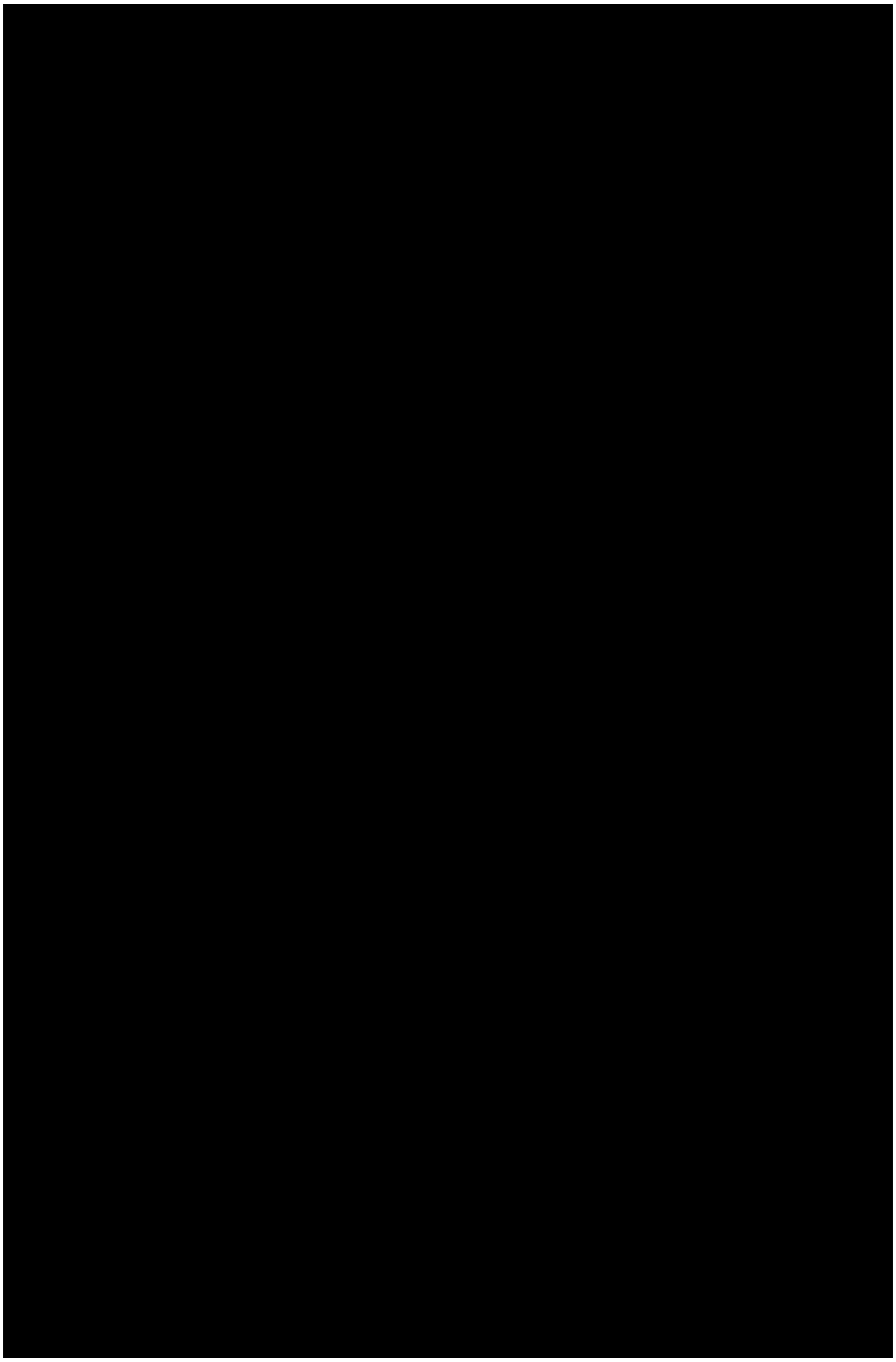

দাফন শেষে যখন ইট বিছিয়ে দিচ্ছিলাম।, একটি ইট পড়ে গেল। আমি দেখলাম, সাবেত আল-বুনানী কবরে নামায আদায় করছে।

-আহকামু তামান্নিল মাউত, পৃ.৪০, শায়খ আব্দুল ওহাব নজদী।

তিনি আরও লিখেছেন, ইমাম আবু নুয়াইম ও ইমাম ইবনে জারীর নিজ সনদে ইব্রাহীম আল-মুহাল্লাবী থেকে বর্ণনা করেছেন, জাস নামক স্থান দিয়ে ভোরে যাতায়াতকারীরা আমার কাছে বর্ণনা করেছে যে, আমরা যখন ভোরে সাবেত আল-বুনানীর কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতাম, তার কবর থেকে কুরআন তেলাওয়াতের শব্দ শুনতে পেতাম।

-আহকামু তামান্নিল মাউত, পৃ.৪০, শায়খ আব্দুল ওহাব নজদী।

ইমাম তিরমিজী রহ. ইবনে আব্বাস রা. থেকে নীচের হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং একে হাসান বলেছেন। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূল স. এর এক সাহাবী একটি কবরের উপর তাবু গাড়ল। তিনি জানতেন না যে সেখানে কবর রয়েছে। হঠাৎ তিনি কবর থেকে শুনতে পেলেন, এক ব্যক্তি সূরা মুলুক তেলাওয়াত করছে। সে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করল। সাহাবী এসে রাসূল স. কে ঘটনাটি বলল। রাসূল স. বললেন, সূরা মুলুক করবের আজাব থেকে মুক্তিদানকারী, করবের আজাব থেকে প্রতিরোধক।

ইমাম তিরমিজী রহ. এর হাদীসটি দুর্বল। এরপরও শায়খ আব্দুল ওহাব নজদী এটি প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এবং ইমাম তিরমিজীর হাসান হওয়ার বক্তব্যটি গ্রহণ করেছেন। এই ঘটনা ও হাদীস দেওবন্দী কোন আলেমের কিতাবে থাকলে তাকে নিশ্চিত কবরপূজারী উপাধি দেয়া হতো। শুধু নয়, তাকে কুফুরী-শিরকের অপবাদও দেয়া হতো। অথচ সালাফীদের ইমাম শায়খ আব্দুল ওহাব নজদী এটি তার কিতাবে লিখেছেন। তার সম্পর্কে যখন প্রশ্ন করবেন, তখন একেবারে মুখে কুলুপ এঁটে থাকবে।

বর্তমানে কিছু সালাফী তো নিজেদেরকে বাচানোর জন্য এগুলো অস্বীকার করা শুরু করেছে। এদের এই অস্বীকারনীতির তালিকা অনেক লম্বা। ইমাম বোখারী রহ. সূরা কাসাসের ৮৮ নং আয়াতে আল্লাহর ওয়াজহ বা চেহারার ব্যাখ্যা করেছেন রাজত্ব। এটি বোখারীর সকল নুসখা বা কপিতে রয়েছে। যেহেতু এটি সালাফীদের মতের বিরোধী এজন্য আলবানী সাহেব ইমাম বোখারীর বক্তব্যটাই অস্বীকার করে বসেছেন। একে অমুসলিমদের কথা আখ্যা দিয়েছেন।

কিতাবুর রুহ ইবনুল কাইয়্যিম রহ. এর কিতাব। এটি ইবনে তাইমিয়া রহ. এর ইন্তেকালের পরে লেখা। প্রথম দিকে এরা অপপ্রচার চালাতো ইবনে তাইমিয়া রহ. এর সাথে সাক্ষাতের পূর্বে এটি তিনি লিখেছেন। এই অপপ্রচার যখন মিথ্যা প্রমাণিত হল, তখন কিতাবটি ইবনুল কাইয়্যিমের লেখা নয় বলে মিথ্যাচার শুরু করল। এই হল সহীহ আকিদার ভাইদের আমানত। আস্তাগফিরুল্লাহ। অথচ কিতাবটি ইবনুল কাইয়্যিম রহ. এর হওয়ার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

আহকামু তামান্নিল মাউত কিতাবটি শায়খ আব্দুল ওহাব নজদীর নিজ হাতে লেখা। তার হস্তলিপির কপি এখনও সংরক্ষিত আছে। এটি শায়খ সালেহ আলুশ শায়খ স্বীকার করেছেন। কিন্তু কিতাবে বর্তমান সালাফীদের মতবাদের বিরোধী অনেক বক্তব্য থাকায় কেউ কেউ এটি অস্বীকার করা শুরু করেছে। এটি শায়খ নজদীর কিতাব নয়। যেমন শায়খ সালেহ আল-ফাউজান এটি অস্বীকার করে কিতাব লিখেছেন। শায়খ আব্দুর রাজ্জাক বদরও এটি অস্বীকার করেছেন, এই যুক্তিতে যে, এতে অনেক বাতিল দলিল ও আশ্চর্যজনক ঘটনা রয়েছে। এগুলো বিদয়াতের প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাং এটি শায়খ নজদীর কিতাব হতে পারে না।

যদি মুহূর্তের জন্য ধরেও নেই যে, এটি নজদীর কিতাব নয়, তাহলে যেসব শায়খ একে শায়খ নজদীর কিতাব মনে করেন, তাদের ব্যাপারে কী ফয়সালা হবে? তারা সকলেই কি কবরপূজারী? যেমন শায়খ ইবনে জিবরী ও শায়খ আব্দুর রহমান ইবনে সাদহান? এছাড়াও যারা শায়খের রচনাসমগ্র প্রকাশ করেছে তাদের ব্যাপারে কি ফতোয়া হবে? তারা কুফুরী-শিরকী প্রচার করছে? হকপন্থী আলেমদেরকে নির্দ্বিধায় কুফুরী শিরকের অপবাদ দিলেও সালাফী আলেমদের ব্যাপারে তারা বরাররই নীরবতা ও মিথ্যাচারের আশ্রয় নিচ্ছে। এটি তাদের মারাত্মক খিয়ানত ও দ্বিমুখী চরিত্র আরও প্রকট করে তুলছে।

২. ইবনে রজব হাম্বলী রহ. ইমাম খাল্লাল রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম খাল্লালের আস-সুন্নাহ কিতাবটি সালাফীদের মৌলিক আকিদার কিতাব। ইমাম সূয়ূতী বর্ণনাটি ইবনে মান্দা রহ. থেকে উল্লেখ করেছেন। ইবনে মান্দা রহ. এর আত-তাউহীদ কিতাবটি সালাফীদের মৌলিক আকিদার কিতাব। ইমাম খাল্লাল নিজ সনদে হাম্মাদ আল-হাফফার থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

আমি এক জুমুয়ার দিনে কবর স্থানে প্রবেশ করলাম। আমি যতোগুলো কবরের নিকটে গিয়েছি প্রত্যেকটি কবর থেকে কুরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ শুনেছি।

-আহওয়ালুল কুবুর, ইবনে রজব হাম্বলী রহ, পৃ.৭০।

-শরহুস সুদুর, সূয়ূতী রহ, পৃ.১৮৮-১৮৯

৩. ইবনে রজব হাম্বলী রহ. আবুল হাসান ইবনুল বারা এর আর-রওজা কিতাব থেকে নীচের ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। ইবনুল বারা নিজ সনদে ইব্রাহীম আল-হাফফার থেকে বর্ণনা করেন, " আমি একটি কবর খনন করলাম। সেখানে একটি ইট বেরিয়ে এল। ইট বের হওয়ার সাথে সাথে সেখান থেকে মেশকের সুঘ্রাণ পাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি একজন বৃদ্ধ তার কবরে বসে বসে কুরআন তেলাওয়াত করছে।

-আহওয়ালুল কুবুর, ইবনে রজব হাম্বলী রহ, পৃ.৭১।

-শরহুস সুদুর, সূয়ূতী রহ, পৃ .-১৮৯

৪. ইমাম লালকায়ী রহ . এর শরহুস সুন্নাহ কিতাবটি সালাফীদের মৌলিক আকিদার কিতাব। ইমাম লালকায়ী নিজ সনদে বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাইন থেকে বর্ণনা করেছেন, ইমাম ইবনে মাইন বলেন, আমাকে কবর খননকারী বলেছে, আমি কবরে অনেক আশ্চর্যজনক জিনিস দেখেছি। এর মাঝে সবচেয়ে আশ্চর্যের হল, এক কবর থেকে মৃদু কান্নার আওয়াজ শুনেছি, যেমন অসুস্থ রোগী কেঁদে থাকে। আর এক মুয়াজ্জিনের কবর থেকে আমি আজানের জওয়াব দিতে শুনেছি।

ইবনে তাইমিয়া রহ . বলেন,

ولا يدخل في هذا الباب: ما يروى من أن قوما سمعوا رد السلام من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو قبور غيره من الصالحين. وأن سعيد بن المسيب كان يسمع الأذان من القبر ليالي الحرة. ونحو ذلك. فهذا كله حق ليس مما نحن فيه، والأمر أجل من ذلك وأعظم.

অর্থাৎ রাসূল স . এর হাদীস রয়েছে, আল্লাহ তায়ালা ইহুদীদের ধ্বংস করুন। তারা তাদের নবীদের কবরকে সিজদার জায়গা বানিয়েছে।এই হাদীসের ব্যাখ্যায় ইবনে তাইমিয়া রহ . বলেন, হাদীসের আলোচনায় নিম্নের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হবে না।

বর্ণিত আছে, অনেকেই রাসূল স . এর কবর থেকে সালামের উত্তর শুনেছেন। অথবা অন্যান্য বুজুর্গদের কবর থেকে সালামের উত্তর পেয়েছেন। একইভাবে বর্ণিত আছে, হযরত সাইদ ইবনুল মুসায়্যিব রহ . (বিখ্যাত তাবেয়ী) হাররা এর ফেতনার সময় রাসূল স . এর কবর থেকে আজান শুনতেন। এসবই সত্য। আমাদের আলোচ্য বিষয় এটি নয়। বরং আমাদের আলোচ্য বিষয় এর চেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ।

-ইকতেজাউস সিরাতিল মুস্তাকীম। খ .২, পৃ .২৫৪ (শামেলা)

http://shamela.ws/browse.php/book-11620/page-792

রাসূল স . এর কবর থেকে সালামের উত্তর শুনতে পাওয়া সত্য। রাসূল স . এর কবর থেকে আজান শুনে নামায আদায় করা ইবনে তাইমিয়া রহ . এর নিকট সত্য। অথচ তার অনুসারী সালাফীদের নিকট এটি কুফুরী -শিরকী। তাহলে কি ইবনে তাইমিয়া রহ . ও কুফুরী -শিরকীতে লিপ্ত ছিলেন? সালাফীদের মনস্তত্ব অনুযায়ী ইবনে তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়্যিম, ইবনে কাসীর, ইবনে রজব হাম্বলী ও শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজদী সকলেই কবর পূজারী ও কুফুরী -শিরকীতে লিপ্ত ছিলেন। নতুবা একই বিষয় দেওবন্দী আলেমদের কিতাবে থাকলে শিরক হয়, অথচ এসব শায়খদের কিতাবে থাকলে শিরক হবে না কেন?

মৃত্যুপরবর্তী কারামত ও কারামত অস্বীকারকারীদের মনস্তত্ত্ব (পর্ব -৮)

23 May 2015 at 09:16

মৃত ব্যক্তি একে -অপরের সাথে সাক্ষাৎ

মৃত ব্যক্তি একে -অপরের সাথে সাক্ষাতের বিষয়টি রাসূল স . এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। রাসূল স .বলেন,

" إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه , فإنهم يبعثون في أكفانهم و يتزاورون في أكفانهم "

অর্থ : তোমরা যখন তোমাদের মৃত ভাইকে বিদায় করবে , তখন তার কাফন সুন্দর করো। কেননা তাদের কাফনে তারা পুনরুত্থিত হবে এবং তাদের কাফনে তারা একে -অপরের সাথে সাক্ষাৎ করে।

হাদীসটিকে শেইখ নাসীরুদ্দীন আলবানী সহীহ বলেছেন। সিলসিলাতুস সহীহা , খ.৩, পৃ .৪১১

সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত বিষয়টি যদিও আমাদের জ্ঞানের উর্ধ্বে , তবুও আমরা এটি বিশ্বাস করি।

কবরের বিভিন্ন নেয়ামত ও সংক্রান্ত কারামত :

এ বিষয়ে ইবনে রজব হাম্বলী রহ . বলেন,

و ما شوهد من نعيم القبر و كرامة أهله فكثير أيضا

অর্থ : কবরের বিভিন্ন নেয়ামত ও কবরবাসীর কারামতের উপর বহু ঘটনা প্রত্যক্ষ করা হয়েছে।

-আহওয়ালুল কুবুর , পৃ .১২১

এরপর এ বিষয়ে তিনি অনেক কারামত ও ঘটনা উল্লেখ করেছেন তার আহওয়ালুল কুবুর কিতাবে।

এ বিষয়ে আমরা শুরুতেই শায়খ ইবনে উসাইমিন রহ. এর বর্ণিত একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। কবরের আজাব রুহের উপর হবে না কি দেহের উপর? এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, মূল হল, রুহের উপর আজাব হবে। তবে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, রুহ দেহের সাথে সম্পর্ক রাখে বা মিলিত থাকে। তখন দেহও রুহের সাথে সাথে শাস্তি ও নেয়ামত ভোগ করতে থাকে। এ বিষয়ে আহলে সু্ন্নত ওয়াল জামাতের আরেকটি বক্তব্য রয়েছে। সেটি হল, কবরের আজাব দেহের উপর হবে। রুহের উপর নয়। এক্ষেত্রে তাদের দলিল হল, বাস্তবে এটি প্রত্যক্ষ করা হয়েছে। অনেক কবর উন্মোচিত হলে দেখা গেছে, দেহের উপর শাস্তির চিহ্ন রয়েছে। কারও কারও দেহের উপর নেয়ামতের চিহ্ন দেখা গেছে। আমার কাছে কিছু লোক বর্ণনা করেছে। তারা উনাইজাতে ড্রেন খননের কাজ করতো। খনন করতে করতে তারা একটি কবর পেল। কবরে একটি লাশ দেখতে পেল। মাটি লাশের কাফন খেয়ে ফেলেছে। কিন্তু দেহটি এখনও তরু-তাজা রয়েছে। তারা বলেছে, তারা এ ব্যক্তির দাড়ীতে মেহেদী দেখেছে। তার কবর থেকে এতো সুঘ্রাণ বের হচ্ছিল যে, এটি মেশকের চেয়েও উন্নত ছিল। তারা এটি রেখে জনৈক শায়খের কাছে গেল। তিনি তাদেরকে এভাবে রেখে আশে-পাশে খনন করতে বললেন।

-মাজমুউ ফাতাওয়া ও রাসাইল, পৃ.৬৬ ।

http://kl28.com/house_of_knowledge/page/Mjmwa_Ftawa_Wrsaail_Abn_Athymyn_page_66

এধরনের ঘটনা বর্ণনা তথাকথিত আহলে হাদীস ও সালাফীদের নিকট কুসংস্কার প্রচার। মতিউর রহমান মাদানী, তাউসিফুর রহমান রাশেদী, মুরাদ বিন আমজাদ, আকরামুজ্জামানের নিকট এগুলো হল খুরাফাত। এগুলোকে উপলক্ষ্য করে তারা তাবলীগ জামাত ও দেওবন্দী আলেমদেরকে কুফুরী-শিরকীর অপবাদ দিয়ে থাকে। এসব পাতি সালাফীদের বিকৃত মানসিকতার কারণে আজ যেসব কারামত ছিল তাউহীদের প্রমাণ, সেগুলি হয়েছে আজগুবি গল্প, কুফুরী-শিরকী বিশ্বাস। নাউযুবিল্লাহ।

কবরে বিভিন্ন নেয়ামত ও কারামতের কথা অসংখ্য আলেম লিখেছেন। সম্প্রতি আফগান মুজাহিদদের এধরনের কারামত সংকলন করেছেন শায়খ আব্দুল্লাহ আজ্জাম রহ.। তিনি এজাতীয় বেশ কিছু কারামত উল্লেখ করেছেন তার কিতাবে। আমরা আলোচনার শেষে সেগুলো উল্লেখ করবো।

ইবনে রজব হাম্বলী রহ. কবরের বিভিন্ন নেয়ামত সংক্রান্ত যেসব কারামত লিখেছেন, এগুলো থেকে কয়েকটি নীচে উল্লেখ করা হল।

১. খতীব বাগদাদী রহ. নিজ সনদে মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমার মা ইন্তেকাল করেন। আমি তাকে দাফন করার জন্য কবরে অবতরণ করলাম। হঠাৎ পাশের কবরের দিকে একটি ছিদ্র সৃষ্টি হল। আমে দেখতে পেলাম, এক ব্যক্তির লাশ রয়েছে। তার কাফনটি একেবারে নতুন। তার বুকের উপর ইয়াসমীন নামক সুগন্ধির একটি পাত্র রয়েছে। আমি

সেটি উঠালাম। আমি ও অন্যান্যরা এর সুঘ্রান পাচ্ছিলাম। এটি মেশক থেকে বেশি সুগন্ধিময় ছিল। আমার সাথে একদল লোক ছিল। তারা সকলেই এর ঘ্রাণ শুকেছে। আমি পাত্রটি পূর্বের জায়গায় রেখে দিলাম। আর গর্তটি বন্ধ করে দিলাম।

-আহওয়ালুল কুবুর, পৃ.১২১

২. ইমাম ইবনুল জাওযী রহ. নিজ সনদে আবু জা'ফর আস-সাররাজের উস্তাদ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এর কবরের কাছে এক ব্যক্তির কবর উন্মোচিত হল। মৃত ব্যক্তির বুকের উপর একটি প্রস্ফুটিত ফুল দেখা গেল।

৩. ইমাম ইবনে সায়াদ তার ত্ববাকাতে নিজ সনদে আবু সাইদ খুদরী রা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি জান্নাতুল বাকীতে সায়াদ ইবনে মুয়াজ রা. এর কবর খননকারীদের একজন ছিলাম। আমরা যখনই কবর থেকে সামান্য মাটি তুলছিলাম, সেখান থেকে মেশকের ঘ্রাণ বের হচ্ছিল।

-আহওয়ালুল কুবুর, পৃ.১২২

৪. ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া নিজ সনদে মুগীরা ইবনে হাবিবা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে গালিব আল-হাররানীকে যখন দাফন করা হয়, তখন তার কবর থেকে মেশকের ঘ্রাণ বের হচ্ছিল।

-শরহুস সুদুর, পৃ.১৫৬

সাম্প্রতিক কারামত:

ড. আব্দুল্লাহ আজ্জাম রহ. তার 'আয়াতুর রহমান' কিতাবে একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন, রাইহাতুশ শুহাদা (শহীদদের সুঘ্রাণ)। এ পরিচ্ছেদে তিনি অনেকগুলো কারামত উল্লেখ করেছেন।

১. আমার কাছে নাসরুল্লাহ মানসুর বর্ণনা করেছে, তিনি বলেন, আমার কাছে হাবীবুল্লাহ বর্ণনা করেছে, তিনি বলেন, আমার ভাই যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করে। তিন মাস পর আমার আম্মা তাকে স্বপ্ন দেখে। সে স্বপ্নে মাকে বলল, আমার সব ক্ষত সেরেছে, কিন্তু মাথার একটি ক্ষত এখনও শুকায়নি। পরবর্তীতে আমার আম্মা কবর খনেনর জন্য খুব জোরাজুরি করেন। আমরা কবর খুড়তে শুরু করি। আমার ভাইয়ের কবরটি আরেক ব্যক্তির কবরের পাশে ছিল। খননের সময় একটি গর্ত হয়ে পাশের কবরটি বের হয়ে গেল। আমরা লাশের উপর একটি সাপ দেখতে পেলাম। আমার আম্মা বললেন, এ কবরটি আর খুড়ো না। আমি বললাম, আমার ভাই শহীদ হয়েছে। সুতরাং তার কবরে কখনও সাপ থাকতে পারে না। আমরা যখন ভাইয়ের কবরটি খুড়লাম, সেখান থেকে সুঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ল। আমাদের নাকে ঘ্রাণ মৌ মৌ করছিল। ঘ্রাণের আতিশয্যে আমরা মাতাল হয়ে যাচ্ছিলাম।

আমরা ভাইয়ের মাথায় ক্ষত দেখতে পেলাম। সেখান থেকে রক্ত বের হচ্ছিল। আমার মা তার রক্তে আঙ্গুল দিলেন। তার আঙ্গুল সুগন্ধিময় হয়ে গেল। তিন মাস গত হয়েছে, এখনও আমার মায়ের আঙ্গুল থেকে সুঘ্রাণ বের হয়।

-আয়াতুর রহমান, পৃ.১২৫ ।

২. মুহাম্মাদ শিরীন আমার কাছে বর্ণনা করেছে, আমাদের চারজন মুজাহিদ বুত ওরদাক নামক জায়গায় শাহাদাত বরণ করল। চার মাস পরে আমরা তাদের থেকে মেশকের মতো সুগন্ধি পেলাম।

-আয়াতুর রহমান, পৃ.১২৫ ।

৩. আমার কাছে আরসালান বর্ণনা করেছে, "আমি অন্ধকার রাতে শহীদ আব্দুল বাসীরকে তার সুগন্ধির মাধ্যমে খুজে বের করেছি।"

-আয়াতুর রহমান, পৃ.১২৪

এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ নেয়ামত ও কারামত। এগুলো কোন কাল্পনিক গল্প নয়। এগুলো বাস্তব সত্য। যাদের কাছে এগুলো গাজাখুরী গল্প ও সূফীদের ভন্ডামি মনে হয়, তারা মূলত: পশ্চিমাদের মতো বস্তুপূজার অতল তলে নিমজ্জিত। আল্লাহর কুদরত ও ক্ষমতায় বিশ্বাসী কোন মু'মিন এগুলোকে কখনও গাজাখুরী বলতে পারে না। তবে বস্তুপূজা ও পশ্চিমাদের বিকৃত চেতনায় গড়ে ওঠা ব্যক্তিরাই কেবল এগুলো নিয়ে তামাশা ও হাসি ঠাট্রা করে। আল্লাহ সবাইকে সঠিক বুঝ দান করুন।

সালাফে-সালেহীনের ইবাদতময় জীবন (পর্ব-১)
25 May 2015 at 19:40

হযরত উমর রা. এর ইবাদত:

ইমাম ইবনে কাসীর রহ. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াতে হযরত উমর রা. এর জীবনী আলোচনা করেছেন। তিনি লেখেন, হযরত উমর রা. ইশার নামায পড়িয়ে নিজ ঘরে প্রবেশ করতনে। এরপর তিনি ফজর পর্যন্ত নামায আদায় করতেন।

-আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খ.৭, পৃ.১৩৫

হযরত উসমান রা. এর ইবাদত:

ইমাম ইবনুল জাওযী রহ. তার বিখ্যাত কিতাব সিফাতুস সাফওয়া-তে হযরত উসমান রা. এর জীবনী আলোচনা করেছেন। ইমাম ইবনে সিরীন রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন,

"খারেজীরা যখন হযরত উসমান রা. কে হত্যা করতে উদ্যত হয়, তখন হযরত উসমান রা. এর স্ত্রী বলেন, তোমরা তাকে হত্যা করো বা ছেড়ে দাও, তিনি এক রাকাতে সম্পূর্ণ কুরআন খতম করতেন। আর সারা রাত নামায আদায় করতেন। "

[সিফাতুস সাফওয়া, খ.১, পৃ.২০০]

সারা রাত ইবাদত করা ও এক রাকাতে কুরআন খতমের বিষয়টি হযরত উসমান রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত। ইমাম ইবনে কাসীর রহ. তার ফাজাইলুল কুরআনে একে সহীহ বলেছেন। হযরত উসমান রা. এর এক রাতে কুরআন খতমের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন,

১. মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, খ.২, পৃ.৫০২

২.মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক।

৩. ইমাম বাইহাকী, শুয়াবুল ইমান ও সুনানুল কুবরা।

৪.ইমাম দারে কুতনী, সুনানে দারে কুতনী।

৫.ইমাম ত্ববরানী, মু'জামুল কাবীর।

৬. ইমাম বাগাবী শরহুস সুন্নাহ।

উসমান রা. এর তেলাওয়াতের বিষয়টি সহীহ বলেছেন, ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী ফাতহুল বারীতে। (খ.২, পৃ.৪৮২)

এছাড়াও আহলে হাদীস আলেম আব্দুর রহমান মুবারকপুরী হযরত উসমান রা. এর আমলটি উল্লেখ করেছেন। সেই সাথে আরও অনেক ইমামের কুরআন খতমের বিষয় উল্লেখ করেছেন। তুহফাতুল আহওয়াজী, খ.৮, পৃ.২১৯।

হযরত ইবনে উমর রা. এর রাত্রি জাগরণ:

ইমাম যাহাবী সিয়ারু আ 'লামিন নুবালাতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা . এর ইবাদত সম্পর্কে লিখেছেন ,

أنه كان يحيي الليل صلاة ، ثم يقول : يا نافع ، أسحرنا ؟ فأقول : لا . فيعاود الصلاة إلى أن أقول : نعم فيقعد ويستغفر ويدعو حتى يصبح .

অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা . সারা রাত নামায আদায় করতেন। তিনি বলতেন , হে নাফে , ভোর হয়েছে কি ? আমি (নাফে) বলতাম, না। এরপর তিনি আবার নামায শুরু করতেন। এভাবে আমি হ্যা বলা পর্যন্ত তিনি নামায পড়তে থাকতেন। ফজর হলে তিনি বসে বসে ইস্তেগফার করতেন। এবং সকাল পর্যন্ত দুয়া করতেন।

১.সিয়ারু আলামিন নুবালা , খ.৩, পৃ .২৩৫

২. হিলয়াতুল আউলিয়া , খ.১, পৃ .৩০৩।

হযরত তামীম দারী রা . এর আমল :

ইমাম ইবনে আব্দুল বার তার আল -ইস্তেজকার কিতাবে লিখেছেন ,

وقد كان عثمان وتميم الداري وعلقمة وغيرهم يقرؤون القرآن كله في ركعة وكان سعيد بن جبير وجماعة يختمون القرآن مرتين وأكثر في ليلة

অর্থ : হযরত উসমান রা , তামীম দারী রা , হযরত আলকমাসহ অন্যান্যরা এক রাকাতে সম্পূর্ণ কুরআন তেলাওয়াত করতেন। হযরত সাইদ ইবনে জুবাইর ও একদল তাবেয়ী একই রাতে দু 'বার বা এর চেয়ে কুরআন খতম করেছেন।

আল-ইস্তেজকার , খ.২, পৃ .৪৭৫

ইমাম ত্বহাবী রহ . হযরত উসমান রা , হযরত তামীম দারী রা , আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর রা . সাইদ ইবনে জুবাইর সম্পর্কে শরহু মায়ানিল আসারে উল্লেখ করেছেন যে , তারা সকলেই এক রাকাতে সম্পূর্ণ কুরআন খতম করতেন।

-শরহু মাযানিল আসার , খ.১, পৃ .৩৪৮ ।

বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনে আবি শাইবা রহ . মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাতে তামীম দারী রা . এর একই রাকাতে কুরআন খতমের বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা , খ.১, পৃ .৩২৩।

و قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يُقْرَأُ الْقُرْآنُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ لِلْحَدِيثِ الَّذِي رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَخَّصَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَرُوِي عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ يُوتِرُ بِهَا وَرُوِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ فِي الْكَعْبَةِ وَالتَّرْتِيلُ فِي الْقِرَاءَةِ أَحَبُّ إِلَى أَهْلِ الْعِلْمِ

" (وَرَخَّصَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ) أَيْ رَخَّصَ بَعْضُهُمْ فِي أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ : وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي لَيْلَتَيْنِ , وَكَانَ ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَيَصُومُ الدَّهْرَ . وَكَانَ أَبُو حَرَّةَ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ , وَكَانَ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ لَيْلَتَيْنِ . (وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ يُوتِرُ بِهَا) رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ , وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ اِبْنِ سِيرِينَ قَالَ : كَانَ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ يُحْيِي اللَّيْلَ كُلَّهُ بِالْقُرْآنِ كُلِّهِ فِي رَكْعَةٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ فِي الْبَيْتِ , وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ : وَخَرَجَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ إِلَى الْحَجِّ فَرُبَّمَا خَتَمَ الْقُرْآنَ مَرَّتَيْنِ فِي لَيْلَةٍ بَيْنَ شُعْبَتَيْ رَحْلِهِ , وَكَانَ مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ خَفِيفَ الْقِرَاءَةِ , وَكَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي صَلَاةِ الضُّحَى , وَكَانَ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ بَيْنَ الْأُولَى وَالْعَصْرِ وَيَخْتِمُ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ , وَكَانَ يُصَلِّي اللَّيْلَ كُلَّهُ , وَكَانَ إِذَا جَاءَ شَهْرُ رَمَضَانَ خَتَمَ الْقُرْآنَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ خَتْمَتَيْنِ ثُمَّ يَقْرَأُ إِلَى الطَّوَاسِينِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ . وَكَانُوا إِذْ ذَاكَ يُؤَخِّرُونَ الْعِشَاءَ لِشَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى أَنْ يَذْهَبَ رُبْعُ اللَّيْلِ اِنْتَهَى مَا فِي قِيَامِ اللَّيْلِ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ , وَلَوْ تَتَبَّعْت تَرَاجِمَ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ لَوَجَدْت كَثِيرًا مِنْهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ , فَالظَّاهِرُ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْأَعْلَامَ لَمْ يَحْمِلُوا النَّهْيَ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ عَلَى التَّحْرِيمِ , وَالْمُخْتَارُ عِنْدِي مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ وَغَيْرُهُمَا وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ".

দু'দিনে কুরআন খতম করতেন। হযরত সাবেত বুনানী রহ. একদিন ও এক রাতে কুরআন খতম করতেন এবং লাগাতার রোজা রাখতেন। হযরত আবু হাররা প্রত্যেক রাত ও দিনে কুরআন খতম করতেন। হযরত আতা ইবনে সায়েব দু'রাতে কুরআন খতম করতেন। (হযরত উসমান রা. সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি বিতরের এক রাকাতে কুরআন খতম করতেন।) মুহাম্মাদ ইবনে নসর তার কিয়ামুল লাইল কিতাবে এটি উল্লেখ করেছেন। ইমাম ত্বহাবী রহ. নিজ সনদে ইবনে সিরীন রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন, সাহাবী হযরত দামীম দারী রা. এক রাকাতে সম্পূর্ণ কুরআন খতম করতেন এবং সারা রাত নামাযে কুরআন তেলাওয়াত করতেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর রা. সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি এক রাকাতে কুরআন খতম করেছেন। হযরত সাইদ ইবনে জুবাইর রহ. সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি কাবা ঘরে এক রাকাতে সম্পূর্ণ কুরআন খতম করেছেন। ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে নসর তার কিয়ামুল লাইল গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ইমাম সালেহ ইবনে কাইসান হজ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। কখনও বাহনে আরোহী অবস্থায় একই রাতে দু'বার কুরআন খতম করতেন। হযরত মানসুর ইবনে যাজান রহ. ধীরে ধীরে তেলাওয়াত করতেন। কখনও তিনি চাশতের নামাযে কুরআন খতম করতেন। তিনি যোহর ও আসরের মাঝে কখনও কুরআন খতম করতেন। তিনি এক দিনে দু'বার কুরআন খতম করতেন। সারা রাত জেগে তিনি নামায আদায় করতেন। যখন রমজান মাস আসতো, মাগরিব ও ইশার নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে দু'বার কুরআন খতম করতেন। এরপর ইশার নামাযের পূর্বে তাসিন পর্যন্ত তেলাওয়াত করতেন। রমজানে তিনি ইশার নামায একটু বিলম্বে রাতের এক চতুর্থাংশের পরে আদায় করতেন। তুমি যদি মুহাদ্দিসগণের জীবনী দেখো, তাহলে তাদের অনেকের জীবনীতে পাবে, তারা তিন দিনের কম সময়ে কুরআন খতম করতেন। সুতরাং স্পষ্ট কথা হল, যে হাদীসে তিন দিনের কমে কুরআন খতম করতে নিষেধ করা হয়েছে, এসব মুহাদ্দিস সেটা দ্বারা হারাম নিষেধাজ্ঞা উদ্দেশ্য নেননি। আমার নিকট প্রাধান্য মত হল, ইমাম আহমাদ ও ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ ও অন্যদের মত। আল্লাহ তায়ালা ভালো জানেন।

-তুহফাতুল আহওয়াজী খ.৮, পৃ.২১৯।

এই সিরিজটি কোন ভূমিকা ছাড়াই শুরু করেছি। ইনশাআল্লাহ প্রত্যেকটি বিষয়ে বিস্তারিত লিখবো। অনেকের মনে প্রশ্নের পাহাড় জমে গেছে। আহলে হাদীস আলেম আব্দুর রহমান মুবারকপুরী তাবেয়ীদের থেকে বর্ণান করলেন, সেটা কীভাবে সম্ভব? মাগরিব থেকে ইশার মধ্যবর্তী সময়ে দু'খতম কুরআন তেলাওয়াত? এক রাকাতে সম্পূর্ণ কুরআন তেলাওয়াত কীভাবে সম্ভব? প্রত্যেকটি বিষয়ে লিখবো ইনশাআল্লাহ। এ বিষয়ে কেন লিখছি, কী কী থাকবে, সেগুলো স্পষ্ট করবো ইনশাআল্লাহ।

সালাফে-সালেহীনের ইবাদতময় জীবন (পর্ব-২)
26 May 2015 at 14:13

পূর্বের আলোচনায় অনেক সাহাবী ও তাবেয়ী থেকে বর্ণণা করা হয়েছে যে, তারা একই রাকাতে সম্পূর্ণ কুরআন খতম করেছেন। কেউ কেউ মাগরিব থেকে ইশার নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে কুরআন খতম করেছেন। প্রশ্ন দেখা দেয়, এটি কীভাবে সম্ভব।

অল্প সময়ে অধিক আমল:

বোখারী শরীফে এ বিষয়ে রাসূল স. এর একটি হাদীস রয়েছে। হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল স.বলেন,

خُفِّفَ على داود القرآنُ، فكان يأمر بداوبِّه، فتسرج، فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه، ولا يأكل إلا من عمل يده

অর্থ: হযরত দাউদ আ. এর জন্য তেলাওয়াত হালকা করে দেয়া হয়। তিনি তার বাহনের জিন প্রস্তুত করতে বলতেন। বাহনে জিন লাগানোর পূর্বেই তিনি যাবুর পড়ে শেষ করতেন। তিনি শুধু নিজ হাতের উপার্জনই ভক্ষণ করতেন।

-বোখারী শরীফ, হাদীস নং ৩৪১৭

এই হাদীস থেকে স্পষ্ট, হযরত দাউদ আ. খুব অল্প সময়ে যবুর পড়ে শেষ করতেন। তিনি খুব দ্রুত পড়তেন বিষয়টি এমন নয়। সুললিত কন্ঠে ধীর-স্থিরভাবে তেলাওয়াতের জন্য তিনি বিখ্যাত। ঘোড়ার জিন লাগাতে খুব বেশি সময় লাগার কথা নয়। এই অতি অল্প সময়ে তিনি সম্পূর্ণ যবুর পড়ে শেষ করতেন।

উপর্যুক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন,

وَفِي الْحَدِيث أَنَّ الْبَرَكَة قَدْ تَقَع فِي الزَّمَن الْيَسِير حَتَّى يَقَع فِيهِ الْعَمَل الْكَثِير . قَالَ النَّوَوِيّ : أَكْثَر مَا بَلَغَنَا مِنْ ذَلِكَ مِنْ كَانَ يَقْرَأ أَرْبَع خَتَمَات بِاللَّيْلِ وَأَرْبَعًا بِالنَّهَارِ،

অর্থ: হাদীস থেকে প্রমাণিত, কখনও খুব অল্প সময়ে ব্যাপক বরকত হয়। ফলে অল্প সময়ে অধিক কাজ করা সম্ভব হয়। ইমাম নববী রহ. বলেন, এ বিষয়ে অনেক বর্ণনা আমাদের নিকট পৌছেছে যে, অনেকে এক রাতে চার খতম ও এক দিনে চার খতম কুরআন তেলাওয়াত করেছেন।

-ফাতহুল বারী, খ.৬, পৃ.৪২৪

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ. উমদাতুল কারীতে লিখেছেন,

وفيه الدلالة على أن الله تعالى يطوي الزمان لمن يشاء من عباده كما يطوي المكان وهذا لا سبيل إلى إدراكه إلا بالفيض الرباني ... ولقد رأيت رجلاً حافظاً قرأ ثلاث ختمات في الوتر في كل ركعة ختمة في ليلة القدر

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ينبغي أن يحافظ على تلاوته ، ويكثر منها . وكان السلف رضي الله عنهم لهم عادات مختلفة في قدر ما يختمون فيه .

فروى ابن أبي داود عن بعض السلف رضي الله عنهم ، أنهم كانوا يختمون في كل شهرين ختمة واحدة ، وعن بعضهم في كل شهر ختمة ، وعن بعضهم في كل عشر ليال ختمة ، وعن بعضهم في كل ثمان ليال ، وعن الأكثرين في كل سبع ليال ، وعن بعضهم في كل ست ، وعن بعضهم في كل خمس ، وعن بعضهم في كل أربع ، وعن بعضهم في كل ليلتين ، وختم بعضهم في كل يوم وليلة ختمة ، ومنهم من كان يختم ثلاثا ، وختم بعضهم ثمان ختمات ، أربعا بالليل وأربعاً بالنهار .

فمن الذين كانوا يختمون ختمة في الليل واليوم : عثمان بن عفان رضي الله عنه و تميم الداري و سعيد بن جبير و مجاهد و الشافعي وآخرين.

ومن الذين كانوا يختمون ثلاث ختمات : سليم بن عمر رضي الله عنه قاضي مصر في خلافة معاوية رضي الله عنه ، وروى أبو بكر بن أبي داود أنه كان يختم في الليلة أربع ختمات ، وروى أبو عمر الكندي في كتابه في قضاة مصر أنه كان يختم في الليلة أربع ختمات.

قال الشيخ الصالح أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه : سمعت الشيخ أبا عثمان المغربي يقول : كان ابن الكتاب رضي الله عنه يختم بالنهار أربع ختمات وبالليل أربع ختمات ، وهذا أكثر ما بلغنا من اليوم والليلة.

وروى السيد الجليل أحمد الدورقي بإسناده عن منصور بن زادان من عباد التابعين رضي الله عنه أنه كان يختم القرآن فيما بين الظهر والعصر ويختمه أيضا فيما بين المغرب والعشاء في رمضان ختمتين ، وكانوا يؤخرون العشاء في رمضان إلى أن يمضي ربع الليل.

وروى أبو داود بإسناده الصحيح : أن مجاهدا كان يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء.

وعن منصور قال : كان علي الأزدي يختم فيما بين المغرب والعشاء كل ليلة من رمضان.

وعن إبراهيم بن سعد قال : كان أبي يحتبي فما يحل حبوته حتى يختم القرآن.

وأما الذي يختم في ركعة ، فلا يحصون لكثرتهم ، فمن المتقدمين : عثمان بن عفان و تميم الداري و سعيد بن جبير رضي الله عنهم ختمة في كل ليلة في الكعبة.

অর্থ : কুরআন তেলাওয়াতের প্রতি মনযোগী হওয়া উচিৎ। অধিক কুরআন তেলাওয়াত মু 'মিনের বিশেষ কর্তব্য। কতো দিনে কুরআন খতম করতে হবে , এ বিষয়ে সালাফে -সালেহীনের বিভিন্ন আমল ছিল। ইবনে আবি দাউদ কিছু সালাফ থেকে বর্ণনা করেছেন , তারা প্রতি দু 'মাসে একবার কুরআন খতম করতেন। কোন কোন সালাফ এক মাসে একবার খতম করতেন। কেউ কেউ প্রতি দশরাতে একবার খতম করতেন। কেউ কেউ আট রাতে। তবে অধিকাংশ থেকে সাত রাতে খতমের কথা বর্ণিত আছে। কিছু সালাফ থেকে ছয়দিন , পাচ দিন ও চার দিনে খতমের কথা বর্ণিত আছে। কিছু সালাফ দু 'রাতে খতম করতেন। কেউ কেউ এক দিন ও একরাতে এক খতম করতেন। কিছু সালাফ একদিনে ও একরাতে তিন খতম তেলাওযাত করেছেন। কোন কোন সালাফ আট খতম তেলাওয়াত করেছেন। চার খতম দিনে ও চার খতম রাতে।

সালাফে -সালেহীনের মাঝে যারা একদিন ও একরাতে কুরআন খতম করেছেন , তাদের কয়েকজন হলেন, ১. হযরত উসমান রা ২ , তামীম দারী রা . ৩. তাবেয়ী সাইদ ইবনে জুবাইর রহ . ৪.ইমাম মুজাহিদ রহ . ৫. ইমাম শাফেয়ী রহ . সহ অন্যান্য সালাফগণ।

যারা দিনে তিন খতম কুরআন তেলাওয়াত করতেন , এদের মাঝে রয়েছেন , সুলাইম বিন উমর রা . । তিনি হযরত মুয়াবিয়া রা . এর সময় মিশরের বিচারপতি ছিলেন। ইমাম আবু বকর ইবনে আবি দাউদ বর্ণনা করেন , তিনি এক রাতে চার খতম কুরআন তেলাওয়াত করতেন। আবু বকর আল-কিন্দী তার 'কুজাতু মিসর ' বইয়ে লিখেছেন , তিনি রাতে চার খতম কুরআন তেলাওয়াত করতেন।

শায়খ আবু আব্দুর রহমান সুলামী বলেন , আমি শায়খ আবু উসমান মাগরিবীকে বলতে শুনেছি , "ইবনুল কাতিব রহ . দিনে চার খতম ও রাতে চার খতম কুরআন তেলাওয়াত করতেন। "

আমার (ইমাম নববী) জানা মতে এটি সর্বোচ্চ পরিমাণ।

ইমাম আহমাদ দাওরাকী নিজ সনদে বিখ্যাত তাবেয়ী ও আবেদ ইমাম মানসুর ইবনে যাজান সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন , ইমাম মানসুর ইবনে যাজান রহ .যোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে কুরআন খতম করতেন। তিনি রমজান মাসে মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে দু 'খতম কুরআন তেলাওযাত করতেন। তিনি রমজানে রাতের এক চতুর্থাংশের পরে ইশার নামায আদায করতেন।

ইমাম আবু দাউদ সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন , ইমাম মুজাহিদ রহ . মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে এক খতম কুরআন তেলাওয়াত করতেন।

ইমাম মানসুর থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন , আলী আল-আজদী রহ. রমজান মাসে প্রত্যেক রাতে মাগরিব থেকে ইশার মধ্যবর্তী সময়ে এক খতম কুরআন তেলাওয়াত করতেন।

হযরত ইব্রাহীম ইবনে সায়াদ থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন , আমার পিতা মাঝে মাঝে লোকান্তরে যেতেন। এসময়ে তিনি এক খতম কুরআন তেলাওয়াত করতেন।

সালাফের মাঝে এক রাকাতে কুরআন খতম কারীদের সংখ্যা এতো বেশি যে গণনা করে শেষ করা যাবে না। এদের মাঝে অগ্রণী ছিলেন , হযরত উসমান রা , হযরত তামীম দারী রা ও হযরত সাইদ ইবনে জুবাইর রহ . ।তিনি কা 'বা শরীফে এক রাকাতে এক খতম তেলাওয়াত করেছেন।

[আত-তিবয়ান , পৃ .৫৯-৬০]

এধরনের বক্তব্য ইমাম নববীর কিতাবুল আজকারেও রয়েছে।

বিখ্যাত ইমাম তাজুদ্দীন সুবকী রহ . বলেন,

(النوع الرابع والعشرون: ما سُهِّلَ لكثير من العلماء من التصانيف في الزمن اليسير، بحيث وزع زمان تصنيفهم على زمان اشتغالهم بالعلم إلى أن ماتوا فوجد لا يفي به نسخاً، فضلاً عن التصنيف، وهذا قسم من نشر الزمان الذي قدمناه،

فقد اتفق النقلة على أن عُمُرَ الشافعي رحمه الله لا يفي بعشر ما أبرزه من التصانيف، مع ما يثبت عنه من تلاوة القرآن كل يوم ختمة بالتدبر، وفى رمضان كل يوم ختمتين كذلك، واشتغاله بالدرس، والفتاوى والذكر والفكر والأمراض التي كانت تعتوره، بحيث لم يخلُ رضي الله عنه من علة أو علتين أو أكثر، وربما اجتمع فيه ثلاثون مرضاً.

وكذلك إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله، حُسِبَ عُمُرُه وما صنفه مع ما كان يلقيه على الطلبة، ويُذَكِّرْ به في مجالس التذكير فوجد لا يفي به.

وقرأ بعضهم ثماني ختمات في اليوم الواحد، وأمثال هذا كثير.

وهذا الإمام الرباني الشيخ محيى الدين النووي رحمه الله، وُزِّعَ عُمُرُه على تصانيفه، فوجد أنه لو كان ينسخها فقط لما كفاها ذلك العمر، فضلاً عن كونه يصنفها، فضلاً عما كان يضمه إليها من أنواع العبادات وغيرها.

وهذا الشيخ الإمام الوالد رحمه الله إذا حُسِبَ ما كتبه من التصانيف مع ما كان يواظبه من العبادات، ويمليه من الفوائد، ويَذْكُرُه في الدروس من العلوم، ويكتبه على الفتاوى، ويتلوه من القرآن، ويشتغل به من المحاكمات، عرف أن عمره قطعاً لا يفي بثلث ذلكن فسبحان من يبارك لهم ويطوى لهم وينشر

তুমি ইমাম নববীর কথা চিন্তা করো। তার জীবনের সময়টা যদি তার লিখিত গ্রন্থ দিয়ে ভাগ করা হয়, তাহলে তার পক্ষে এগুলো শুধু কপি করেই শেষ করাই সম্ভব নয়। অথচ গবেষণা করে এগুলো লেখা তো অনেক কঠিন বিষয়। অথচ গ্রন্থ রচনার পাশাপাশি তিনি সর্বদা বিভিন্ন ইবাদতে মগ্ন থাকতেন।

আমার পিতা তকীউদ্দীন সুবকী রহ. কে দেখো। গ্রন্থ রচনা, বিভিন্ন ইবাদত, সূক্ষ্ম বিষয়ে গবেষণা, ইলমের বিভিন্ন শাখায় নিয়মিত দরস প্রদান, নিয়মিত ফতোয়া প্রদান, কুরআন তেলাওয়াত, বিচার কার্য পরিচালনাসহ তিনি যেসব কাজে ব্যস্ত থাকতেন, এগুলো দিয়ে যদি তার জীবনের সময়কে ভাগ করা হয়, তাহলে এর এক তৃতীয়াংশও সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয়। সেই মহান সত্তার জন্য পবিত্রতা, যিনি তাদের জীবনে বরকত দিয়েছেন। তাদের জন্য সময় সংকুচিত ও বিস্তৃত করেছেন।

[ত্ববাকাতুশ শাফিইয়্যা আল-কুবরা, খ.২, পৃ.৩৪২]

সালাফে-সালেহীনের কুরআন তেলাওয়াত:

১. হযরত আব্দুর রহমান ইবনে কাসিম (মৃত:১৯১ হি:) রহ. প্রতি দিন দু'বার কুরআন খতম করতেন।

[ওফায়াতুল আ'য়ান, খ.১, পৃ.২৭৬, তাজকিরাতুল হুফফাজ, খ.১, পৃ.২৫৬, হুসনুল মুহাজারা, খ.১, পৃ.৩০৩]

২. ইমাম আবু বকর ইবনে আয়্যাশ রহ. ত্রিশ বছর যাবৎ প্রতি দিন একবার কুরআন খতম করতেন। এ সম্পর্কে ইমাম নববী রহ. বলেন,

وروينا عن إبراهيم بن أبي بكر بن عياش أنه (أي إبراهيم) قال: قال لي أبي: إنَّ أباك لم يأت فاحشة قط ، و إنَّه يختم القرآن منذ ثلاثين سنة كلَّ يوم مرَّة .

و روينا عنه أنَّه قال لابنه : يا بني ! إيَّاك أن تعصي الله في هذه الغرفة فإنِّي ختمت فيها اثني عشر ألف ختمة .

و روينا عنه أنَّه قال لبنته عند موته و قد بكت : يا بنية لا تبكي ، أتخافين أن يعذبني الله و قد ختمت في هذه الزَّاوية أربعة و عشرين ألف ختمة ؟

অর্থ: হযরত ইব্রাহীম ইবনে আবু বকর আয়্যাশ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে বললেন, নিশ্চয় তোমার পিতা কখনও ফাহিশা (গর্হিত, যিনা-ব্যভিচার) কাজ করেনি। আর সে ত্রিশ বছর যাবৎ প্রতি দিন এক খতম কুরআন তেলাওয়াত করেছে।

ইমাম আবু বকর আয়্যাশ থেকে আরও বর্ণিত আছে , তিনি তার ছেলেকে বলেন , বৎস!, এই ঘরে আল্লাহর নাফরমানী থেকে অবশ্যই বেঁচে থাকবে। আমি এই ঘরে বার হাজার বার কুরআন খতম করেছি।

তাঁর থেকে আরও বর্ণিত , মৃত্যুর সময়ে তার মেয়ে কাঁদছিলো। তিনি মেয়েকে বললেন , কেদো না। তুমি কি ভয় করছো , আল্লাহ আমাকে শাস্তি দিবেন ; অথচ আমি ঘরের এই কোণে চব্বিশ হাজার খতম দিয়েছি ?

-শরহে মুসলিম , ইমাম নববী রহ , খ.১, পৃ .৭৯

৩. ইমাম ইবনে কাসীর রহ . আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া -তে লিখেছেন ,

ذكر ابن عساكر في ترجمة سليم بن عنز التجيبي قاضي مصر، و كان من كبار التابعين ... و كان من الزهادة و العبادة على جانب عظيم ، و كان يختم القرآن في كل ليلة ثلاث ختمات في الصلاة و غيرها .اهـ .

অর্থ : ইমাম ইবনে আসাকির মিশরের বিচারপতি হযরত সুলাইম বিন হানাজ আত -তুজাইবির জীবনীতে লিখেছেন , তিনি একজন বড় তাবেয়ী ছিলেন। দুনিয়া বিরাগী ও অধিক ইবাদত বন্দেগীকারীদের প্রথম সারিতে ছিলেন। তিনি প্রতি নামায ও নামাযের বাইরে তিন খতম কুরআন তেলাওয়াত করতেন।

-আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া , খ.৯, পৃ .১৩৬

৪. ইমাম ইবনে কাসীর রহ . ইমাম বোখারী রহ . এর জীবনী লিখেছেন আল-বিদায়াতে। ইমাম বোখারীর আমল সম্পর্কে লিখেছেন ,

قد كان يصلي في كل ليلة ثلاث عشرة ركعة ، و كان يختم القرآن في كل ليلة من رمضان ختمة

অর্থ : তিনি প্রত্যেক রাতে তেরো রাকাত নামায আদায় করতেন। আর রমজান মাসে প্রত্যেক রাতে এক খতম কুরআন তেলাওয়াত করতেন।

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া , খ.১১, পৃ .৩১

৫. ইবনে কাসীর রহ . লিখেছেন ,

محمد بن علي بن أحمد بن العباس الكرخي الأديب ، كان عالماً زاهداً ورعاً ، يختم القرآن كل يوم ، و يديم الصيام

অর্থ : সাহিত্যিক মুহাম্মাদ বিন আলী বিন আহমাদ বিন আব্বাস আল -কারখী , তিনি বড় আলেম, যাহিদ (দুনিয়াত্যাগী) ও খোদাভীরু ছিলেন। প্রত্যেক দিন কুরআন খতম করতেন। আর লাগাতার রোজা রাখতেন।

-আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া , খ.১১, পৃ .২৫৯

৬. ইমাম যাহাবী রহ . সিয়ারু আ 'লামিন নুবালাতে হযরত ইব্রাহীম নাখয়ী রহ . থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন ,

عَنْ إِبْرَاهِيْمَ ، قَالَ :

كَانَ الأَسْوَدُ بن يزيد يَخْتِمُ القُرْآنَ فِي رَمَضَانَ فِي كُلِّ لَيْلَتَيْنِ ، وَ كَانَ يَنَامُ بَيْنَ المَغْرِبِ وَ العِشَاءِ ، وَ كَانَ يَخْتِمُ القُرْآنَ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ فِي كُلِّ سِتِّ لَيَالٍ .

অর্থ : হযরত আসওয়াত ইবনে ইয়াজীদ রহ. রমজানের প্রতি দু 'রাতে কুরআন খতম করতেন। তিনি মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে নিদ্রা যেতেন। রমজান ব্যতীত অন্য সময়ে ছয় রাতে তিনি কুরআন খতম করতেন।

-সিয়ারু আ 'লামিন নুবালা , খ.৪, পৃ .৫১

৬.ইমাম যাহাবী রহ . সিয়ারু আ 'লামিন নুবালাতে উল্লেখ করেছেন ,

عَنْ وِقَاءِ بنِ إِيَاسٍ ، قَالَ :كَانَ سَعِيْدُ بنُ جُبَيْرٍ يَخْتِمُ القُرْآنَ فِيْمَا بَيْنَ المَغْرِبِ وَ العَشَاءِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَ كَانُوا يُؤَخِّرُوْنَ العِشَاءَ

অর্থ : হযরত বিকা ইবনে ইয়াস থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন , তাবেয়ী হযরত সাইদ ইবনে জুবাইর রহ . রমজান মাসে মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে কুরআন খতম করতেন। রমজানে তাঁরা ইশার নামায বিলম্বে আদায় করতেন।

-সিয়ারু আ 'লামিন নুবালা , খ.৪, পৃ .৩২৪

৭. ইমাম যাহাবী রহ . লিখেছেন ,

قَالَ سَلاَمُ بنُ أَبِي مُطِيْعٍ : كَانَ قَتَادَةُ يَخْتِمُ القُرْآنَ فِي سَبْعٍ ، وَ إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ ، خَتمَ فِي كُلِّ ثَلاَثٍ ، فَإِذَا جَاءَ العَشرُ ، خَتَمَ كُلَّ لَيْلَةٍ .

অর্থ : সালাম ইবনে আবী মুতী বলেন , ইমাম কাতাদা রহ . সাত দিনে কুরআন খতম করতেন। রমজান মাস এলে তিন দিনে কুরআন খতম করতেন। রমজানের শেষ দশকে প্রতি রাতে কুরআন খতম করতেন।

-সিয়ারু আ 'লামিন নুবালা , খ.৫, পৃ .২৭৬

[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible],

قَالَ يَزِيْدُ بنُ هَارُوْنَ : كَانَ مَنْصُوْرُ بنُ زَاذَانَ يَقْرَأُ القُرْآنَ كُلَّه فِي صَلاَةِ الضُّحَى ، وَ كَانَ يَخْتِمُ القُرْآنَ مِنَ الأُوْلَى إِلَى العَصْرِ ، وَ يَخْتِمُ فِي اليَوْمِ مَرَّتَيْنِ ، وَ يُصَلِّي اللَّيْلَ كُلَّه .وَ عَنْ هِشَامِ بنِ حَسَّانٍ ، قَالَ :

كَانَ يَخْتِمُ فِيْمَا بَيْنَ المَغْرِبِ وَ العِشَاءِ مَرَّتَيْنِ ، وَ الثَّالِثَةُ إِلَى الطَّوَاسِيْنَ ، وَ كَانَ يَبُلُّ عِمَامَتَه مِنْ دُمُوْعِ عَيْنَيْهِ .

[illegible]: [illegible]. [illegible], [illegible]

[illegible]. [illegible], [illegible], [illegible]. [illegible]

-[illegible], [illegible]. [illegible]-[illegible]

[illegible]. [illegible]. [illegible],

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنِي سَعِيْدٌ أَبُو عُثْمَانَ ، سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ يَقُوْلُ : قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ : سَأَلَ كُرْزٌ رَبَّهُ أَنْ يُعْطِيَهُ الاسْمَ الأَعْظَمَ ، عَلَى أَلاَ يَسْأَلَ بِهِ شَيْئاً مِنَ الدُّنْيَا ، فَأُعْطِيَ ، فَسَأَلَ أَنْ يُقَوَّى حَتَّى يَخْتِمَ القُرْآنَ فِي اليَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ

[illegible]: [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]

-[illegible], [illegible].[illegible]

[illegible]. [illegible]. [illegible], [illegible], [illegible]. [illegible]

-[illegible], [illegible], [illegible].[illegible]

[illegible]. [illegible], [illegible]. [illegible]

-[illegible], [illegible], [illegible].[illegible]

[illegible]

قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ جَعْفَرِ بنِ خَاقَانَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بنَ عَلِيٍّ يَقُوْلُ : كَانَ يَحْيَى بنُ سَعِيْدٍ القَطَّانُ يَخْتِمُ القُرْآنَ كُلَّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ ، يَدعُو لأَلفِ إِنْسَانٍ ، ثُمَّ يَخْرُجُ بَعْدَ العَصْرِ ، فَيُحَدِّثُ النَّاسَ .

[illegible]

[illegible]

[illegible]

قَالَ الرَّبِيْعُ بنُ سُلَيْمَانَ مِنْ طَرِيْقَيْنِ عَنْهُ ، بَلِ أَكْثَرَ : كَانَ الشَّافِعِيُّ يَخْتِمُ القُرْآنَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سِتِّيْنَ خَتْمَةً .و رَوَاهَا ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْهُ ، فَزَادَ : كُلُّ ذَلِكَ فِي صَلاَةٍ .

[illegible]

[illegible]

[illegible]

كَانَ بقي بن مخلد يَخْتِم القُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ ، فِي ثلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، وَ كَانَ يُصَلِّي بِالنَّهَارِ مائَةِ رَكْعَةٍ ، وَ يَصُوْمُ الدَّهْرَ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

قَالَ الحَاكِمُ : سَمِعْتُ طَاهِرَ بنَ أَحْمَدَ الوَرَّاق يَقُوْلُ : تُوُفِّيَ أَبُو العَبَّاسِ بنُ شَادَل ، وَ كَانَ يختمُ القُرْآنَ كُلَّ يَوْم

[illegible]

[illegible]

مَا لَقَيْتُ أَتمَّ وَرَعاً وَ لاَ أَحْسَنَ خُلُقاً وَ لاَ أَكْمَلَ عِلْماً مِنْهُ ، كَانَ يَخْتِمُ القُرْآنَ عَلَى قَدَمِيْه فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ ليلَةٍ .

অর্থ : আমি আবুল ওয়ালীদ এর চেয়ে খোদাভীরু, সুন্দর চরিত্র ও পরিপূর্ণ ইলমের অধিকারী কাউকে দেখিনি। তিনি প্রত্যেক দিন ও রাতে দাড়িয়ে দাড়িয়ে (নামাযে) কুরআন খতম করতেন।

-সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খ.১৭, পৃ.৫৮৬

১৭. খতীব বাগদাদী রহ. তারীখে বাগদাদে উল্লেখ করেছেন,

* عن محمد بن زهير بن محمد قال : كان أبي يجمعنا في وقت ختمة القرآن في وقت شهر رمضان في كل يوم وليلة ثلاث مرات تسعين ختمة في شهر رمضان

অর্থ : মুহাম্মাদ ইবনে যুহাইর ইবনে মুহাম্মাদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রমজান মাসে আমার পিতা প্রত্যেক কুরআন খতম শেষে আমাদেরকে একত্র করতেন। এভাবে প্রত্যেক দিন ও রাতে তিনি আমাদেরকে তিনবার ডাকতেন। অর্থাৎ রমজানে তিনি নব্বই খতম কুরআন তেলাওয়াত করতেন।

[তারীখে বাগদাদ, খ.৮, পৃ.৪৮৫]

আমরা যেসব ইমামের কথা উল্লেখ করেছি, তারা সত্যিকার অর্থেই সালাফে-সালেহীন ছিলেন। অধিকাংশই খাইরুল কুরুন তথা প্রথম তিন যুগের। তাদের এই ইবাদতের কথা এতো অধিক সংখ্যক কিতাবে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে, এগুলো অস্বীকারের কোন সুযোগ নেই। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তাদের পদাংক অনুসরণের তৌফিক দান করেন। আমীন।

সালাফে-সালেহীনের ইবাদতময় জীবন (পর্ব-৩)

29 May 2015 at 18:50

ইশার ওজু দিয়ে ফজরের সালাত আদায়

সালাফী শায়খ ইবনে জিবরীন রহ. বলেন,

هكذا حرص هؤلاء الصحابة- رضي الله عنهم- على أن يأتوا بهذه العبادات، فهذا، هؤلاء وغيرهم من الصحابة كثيرون يحرصون على قيام الليل.

كذلك التابعون فيهم كثير يصلون الليل كله، ويجدون لصلاة الليل نشاطا وإقبالا من نفوسهم.

ذكروا عن سعيد بن جبير -رضي الله عنه- أنه بقي عشرين سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء، إذا توضأ لصلاة العشاء وصلى استمر يصلي حتى يطلع الفجر، لا يضع جنبه طوال الليل، يتقلب، ويصلي من صلاة إلى قراءة إلى ذكر، هذه حالتهم.

وكذلك -أيضا- أُثر عن أبي حنيفة الإمام -رحمه الله- أنه بقي نحو أربعين سنة أو ثلاثين سنة لا ينام طوال الليل، بل يصلي الليل كله، أو يصلي جل الليل ويتلذذ بقيامه وتهجده.

وكذلك ذُكر عن بعض السلف أنه قال: كابدت قيام الليل عشرين سنة، وتلذذت به عشرين سنة. أي أربعون سنة وهو يقوم الليل كله، العشرون الأولى كأنه يلاقي تعبا ومشقة، والعشرون الأخيرة يجد لقيام الليل لذة، ويجد له راحة، ويحبه ويتمنى أنه يطول، حتى قال بعضهم: ما أحزنني منذ عشرين سنة إلا طلوع الفجر.

كيف يحزنه؟ كيف يسوءه؟ كيف يستاء؟

لأنه يقطع التذاذه، تلذذه بالعبادة يقطعها، ينقطع عن تلذذه بالقراءة وبالذكر وبالصلاة وما أشبه ذلك.

ويقول بعضهم: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ويريد بأهل الليل أهل التهجد، وأهل قيام الليل، والأمثلة على ذلك كثيرة.

অর্থ : এটাই ছিলো সাহাবীদের ইবাদতের প্রতি আগ্রহ -উদ্দীপনার দৃশ্য। অনেক সাহাবী এভাবে রাত জেগে তাহাজ্জুদ আদায়ের প্রতি যারপর নাই যত্নবান ছিলেন।

তেমনিভাবে তাবেয়ীগণও তাহাজ্জুদের ব্যাপারে যত্নবান ছিলেন। তাদের মাঝে অনেকেই সারা রাত নামায আদায় করতেন। রাতে নামায আদায়ের ক্ষেত্রে নিজেদের ভিতর থেকে একধরনের শক্তি , উদ্দীপনা ও পুলক অনুভব করতেন। মুহাদ্দিসগণ তাবেয়ী হযরত সাইদ ইবনুল মুসায়্যাব রহ . সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন , তিনি বিশ বছর যাবৎ ইশার ওজু দিয়ে ফজরের নামায আদায় করেছেন। তিনি যখন ইশার জন্য ওজু করতেন , ইশার নামায শেষ করে নফলে দাড়িয়ে যেতেন। এভাবে ভোর পর্যন্ত নামায আদায় করতেন। রাতে কখনও বিছানায় পিঠ দিতেন না। তেলাওয়াত, জিকর ও নামাযে তাদের রাত কেটে যেত। এই ছিল তাদের ইবাদতের চিত্র। একইভাবে ইমাম আবু হানিফা রহ . বর্ণনারয়েছে , তিনি চল্লিশ বছর অথবা ত্রিশ বছর রাতে ঘুমাতেন না। বরং সারা রাত নামায আদায় করতেন। তাহাজ্জুদের মাধ্যমে বিশেষ স্বাদ আস্বাদন করতেন।

জনৈক সালাফ থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন , বিশ বছর যাবৎ আমি কষ্ট করে তাহাজ্জুদ আদায় করেছি। আর বিশ বছর তাহাজ্জুদের স্বাদ উপভোগ করেছি। অর্থাৎ তিনি মোট চল্লিশ বছর সারা রাত নামায আদায় করেছেন। প্রথম বিশ বছরে কিছুটা কষ্ট ও ক্লান্তি অনুভব করেছেন। পরবর্তী বিশ বছরে শুধু তাহাজ্জুদের স্বাদ উপভোগ করেছেন। তাহাজ্জুদের মাঝে পেয়েছেন অনাবিল প্রশান্তি। তিনি আকাংখ্য ব্যক্ত করেছেন , তার এই প্রশান্তি যেন দীর্ঘ স্থায়ী হয়। এমনকি কোন কোন সালাফ বলেছেন, বিশ বছর যাবৎ ভোরের আলো আমাকে পেরেশান করেছে।

ভোরের আলো কীভাবে চিন্তিত করে? ভোরের আলো কীভাবে পেরেশান করে? এটি কীভাবে তাঁকে কষ্ট দেয়?

কেননা এটি তার তাহাজ্জুদের প্রশান্তি ভঙ্গ করে। ইবাদতের অনাবিল সুখ থেকে বঞ্চিত করে। তেলাওয়াত, জিকর, সালাত এগুলোর স্বাদ থেকে তাকে দূরে সরিয়ে দেয়।

জনৈক সালাফ বলেছেন, খেলা-ধুলায় মত্ত ব্যক্তি যেমন স্বাদ পায় তাহাজ্জুদ আদায়কারীগণ এর চেয়েও বেশি স্বাদ পেয়ে থাকে। সালাফে-সালিহীনের তাহাজ্জুদের নিমগ্নতা ও প্রশান্তির অসংখ্য উদাহরণ ও বর্ণনা রয়েছে।

সূত্র: http://www.ibn-jebreen.com/books/8-205--7262-.html

তাবেয়ী সাইদ ইবনুল মুসায়্যাব রহ. এর আমল:

ইমাম ইবনে কাসীর রহ. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াতে বর্ণনা করেছেন,

وقال ابن إدريس: صلى سعيد بن المسيب الغداة بوضوء العتمة خمسين سنة

অর্থ: ইবনে ইদরীস রহ. বলেন, সাইদ ইবনুল মুসায়্যাব রহ. পঞ্চাশ বছর যাবৎ ইশার ওজু দিয়ে ফজরের নামায আদায় করেছেন।

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খ.৯, সাইদু ইবনুল মুসায়্যাব রহ. এর জীবনী।

বর্ণনাটি ইমাম ইবুনল জাওযী রহ. তার সিফাতুস সাফওয়া গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। (সিফাতুস সাফওয়া, খ.২, পৃ.৮০)

একই বর্ণনা ইমাম আবু নুয়াইম হিলয়াতুল আউলিয়াতে এটি সনদসহ বর্ণনা করেছেন। (হিলয়াতুল আউলিয়া, খ.২, পৃ.১৬৩)

সুলাইমান আত-তাইমী রহ [মৃত: ১৪৩] এর আমল:

তাবেয়ী সুলাইমান আত-তাইমী রহ. চল্লিশ বছর যাবৎ ইশার ওজু দিয়ে ফজরের সালাত আদায় করতেন। এ বিষয়ে ইমাম যাহাবী রহ. সিয়ারু আ'লামিন নুবালাতে তিনটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. থেকে বর্ণিত,

أقام سليمان التيمي أربعين سنة إمام الجامع بالبصرة يصلي العشاء والصبح بوضوء واحد .

অর্থ : সুলাইমান আত-তাইমী রহ. চল্লিশ বছর যাবৎ বসরার জামে মসজিদের ইমাম ছিলেন, তিনি চল্লিশ বছর ইশার ওজু দিয়ে ফজরের নামায আদায় করতেন।

-সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খ.৬, পৃ.২০০, হিলয়াতুল আউলিয়া, খ.৩, পৃ.২৯

তাবেয়ী ইমাম আবু হানিফা রহ. এর আমল:

ইমাম আবু হানিফা রহ. চল্লিশ বছর যাবৎ ইশার ওজু দিয়ে ফজরের নামায আদায় করেছেন। ইমাম যাহাবী রহ. সিয়ারু আ'লামিন নুবালাতে বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন। ইমাম যাহাবী রহ. লিখেছেন,

عن أسد بن عمرو أن أبا حنيفة رحمه الله صلى العشاء والصبح بوضوء أربعين سنة

অর্থ : আসাদ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত, ইমাম আবু হানিফা রহ. চল্লিশ বছর যাবৎ একই ওজু দিয়ে ইশা ও ফজরের নামায পড়েছেন।

-সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খ.৬, পৃ.৩৯৯

-মানাকিবুল ইমাম আবি হানিফা, ইমাম কারদারী রহ, খ.১, পৃ.২৪১-২৪২

হুশাইম ইবনে বিশর আবু মুয়াবিয়া রহ. (মৃত:১৮৩ হি:) এর আমল:

তিনি বিশ বছর যাবৎ ইশার উজু দিয়ে ফজরের নামায আদায় করেছেন। ইমাম যাহাবী ও ইবনে কাসীর রহ. তার এই আমল বর্ণনা করেছেন।

ইমাম যাহাবী রহ. লিখেছেন,

مكث هشيم يصلي الفجر بوضوء العشاء قبل أن يموت عشرين سنة .

অর্থ : আমর ইবনে আউন থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুশাইম রহ. মৃত্যুর পূর্বে বিশ বছর যাবৎ ইশার উজু দিয়ে ফজরের নামায আদায় করেছেন।

-সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খ.৮, পৃ.২৯০

-আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খ.১০, পৃ.১৯৮

আবু বকর নাইসাপুরী রহ. এর আমল:

ইমাম আবু বকর নাইসাপুরী রহ. চল্লিশ বছর যাবৎ ইশার উজু দিয়ে ফজরের নামায আদায় করেছেন।

-তাজকিরাতুল হুফফাজ, খ.৩, পৃ.৮২০, শাজারাতুয যাহাব, খ.৪, পৃ.১২৯

আবুল হাসান আশআরী রহ. এর আমল:

ইমাম আবুল হাসান আশআরী রহ. বিশ বছর যাবৎ ইশার উজু দিয়ে ফজরের নামায আদায় করেছেন।

-আত-ত্ববাকাতুল কুবরা, খ.২, পৃ.১৯০

এছাড়াও আরও অনেক ইমাম থেকে ইশার উজু দিয়ে ফজরের সালাত আদায়ের কথা বর্ণিত আছে। ইবনুল জাওযী রহ. তার সিফাতুস সাফওয়া গ্রন্থে তাদের জীবনী আলোচনা করেছেন। এছাড়াও ইমাম যাহাবী রহ. সিয়ারু আ'লামিন নুবালাতে এবং ইমাম ইবনে কাসীর রহ. আল-বিদায়াতে তাদের জীবনী এনেছেন। এসব ইমামদের মতো উদ্দীপনা ও ইবাদতের স্বাদ আমাদেরকে নসীব করুন। আমীন।

সূফীদের সংগ্রামী জীবন (পর্ব-১)
25 June 2015 at 07:59

ভূমিকা:

তাজকিয়া, তাসাউফ, যুহদ বা আত্মশুদ্ধির মেহনত অন্যতম একটি ফরজ বিধান। আত্মার ব্যাধি থেকে মুক্ত না হলে বাহ্যিক আমলের সত্ত্বেও শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। রাসূল স. ইরশাদ করেছেন, যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। সুতরাং অহংকার নামক আত্মিক ব্যধিসহ অন্যান্য ব্যাধি থেকে মুক্ত হতে হবে। একেই তাজকিয়া, তাসাউফ বা জুহদ বলে।

আত্মার ব্যাধি থেকে মুক্ত হওয়া ফরজে আইন। প্রত্যেক মুসলিমকে এগুলো থেকে পরিশুদ্ধি অর্জন করতে হবে। লোভ, লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, অহংকার, পরশ্রীকাতরতা, কু-ধারণা, ক্রোধ মানুষের অন্তরে সুপ্ত মারাত্মক কিছু রোগ। এগুলো থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য প্রয়াসী হওয়া আবশ্যক।

তাসাউফ বা তাজকিয়ার সারমর্ম হলো,

১. প্রকাশ্য ও গোপনে তাকওয়া অবলম্বন। (আল্লাহর ভয়ে সকল গোনাহ থেকে দূরে থাকা)

২. কথা ও কাজে সর্বদা সুন্নাহর অনুসরণ।

৩. সর্বদা আল্লাহর প্রতি ভরসা ও সৃষ্টি থেকে বিমুখ থাকা।

৪.সুখ -দুখে সদা -সর্বদা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা।

৫. সুখে -দুখে আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করা। (বিপদে আল্লাহকে স্মরণ করা আর সুখের সময় ভুলে যাওয়ার মতো অকৃতজ্ঞ আচরণ না করা)

একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখবেন , এগুলোই হলো শরীয়তের মূল। ইসলাম একজন মু 'মিন থেকে এগুলোই চায়। আমাদের প্রত্যেকের কাংখিত মনজিল উল্লেখিত পাচটি মৌলিক বিষয়। এজন্যই সালাফে -সালেহীন জুহদ , তাকওয়া ও তাজকিয়ার প্রতি সীমাহীন গুরুত্ব দিয়েছেন।

ইবনুল কাইয়্যিম রহ . বলেন,

ومنها أن هذا العلم (التصوف) هو من أشرف علوم العباد وليس بعد علم التوحيد أشرف منه وهو لا يناسب إلا النفوس الشريفة

অর্থ : বান্দার জন্য অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইলম হলো তাসাউফের ইলম। তাউহীদের ইলমের পরে এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন ইলম নেই। সম্মানিত অন্তর কেবল এটি অর্জন করতে পারে।

[ত্বরিকুল হিজরাতাইন , ইবনুল কাইয়্যিম রহ . পৃ . ২৬০-২৬১]

ইবনুল কাইয়্যিম রহ . বুজুর্গদের মজলিশ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা বলেছেন। এই বক্তব্যে তাসাউফের মৌলিক বিষয়গুলি উঠে এসেছে। সেই সাথে তাসাউফের প্রকৃত চর্চাকারীদের পরিচয় স্পষ্ট হয়েছে। কেননা যাদের মজলিশে বসলে নীচের বিষয়গুলি অর্জিত হয় না , তাহলে বাস্তবে কোন ওলী -বুজুর্গ নয়।

ইবনুল কাইয়্যিম রহ . বলেন,

وقيل : مجالسة العارف تدعوك من ست الي ست : من الشك إلي اليقين , ومن الرياء الي الإخلاص , ومن الغفلة الي الذكر , ومن الرغبة في الدنيا الي الرغبة في الاخرة , ومن الكبر الي التواضع , ومن سوء الطوية الي النصيحة

অর্থ : সূফীগণ বলেন , বুজুর্গ ব্যক্তির মজলিশ তোমাকে ছয়টি বিষয় থেকে মুক্ত হয়ে ছয়টি গুণ অর্জনে উদ্বুদ্ধ করবে।

১. সন্দেহ থেকে ইয়াকীনের দাওয়াত দিবে।

২. রিয়া (লৌকিকতা) থেকে ইখলাসের দাওয়াত দিবে।

৩. গাফলত (উদাসীনতা) থেকে জিকরের দাওয়াত দিবে।

৪. দুনিয়ার আসক্তি থেকে পরকালের আসক্তির দিকে দাওয়াত দিবে।

৫. অহংকার থেকে বিনয়ের দাওয়াত দিবে।

৬. পরশ্রীকাতরতা ও হিংসা থেকে অন্যের কল্যাণকামিতার দাওয়াত দিবে।

[মাদারিজুস সালিকীন, ইবনুল কায়্যিম রহ. খ.৩, পৃ.৩৩৫]

যুহদ ও তাজকিয়া মূলত: সাহাবায়ে কেরামের মাঝে সবচেয়ে বেশি ছিলো। পরবর্তীতে তাবেয়ীগণও এগুলো চর্চা করে উম্মাহের মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন। গোনাহমুক্ত জীবন, অধিক ইবাদত, দুনিয়া বিমুখতা এগুলো যেমন সাহাবায়ে কেরামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিলো, একইভাবে তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগনও এগুলো দ্বারা নিজেদের জীবনকে অলংকৃত করেছেন।

"সালাফে-সালেহীনের ইবাদতময় জীবন (১-৩)" শিরোনামে আমরা তাদের যুহদের সামান্য চিত্র তুলে ধরেছি। পরবর্তীতে আরও বিস্তারিত আলোচনার নিয়ত রয়েছে। তাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ছিল তাকওয়ার রঙে উজ্জল। মূল ধারার তাসাউফ মূলত: সাহাবা ও তাবেয়ীগণের মাধ্যমে বিকশিত হয়েছে। তাসাউফের মৌলিক বিষয়গুলো তাদের থেকেই উম্মত গ্রহণ করেছে। যেকোন একজন তাবেয়ীর জীবনী পর্যালোচনা করে দেখুন, তাদের ইবাদত, দুনিয়া বিমুখতা ও গোনাহমুক্ত সুন্নাহ সম্মত জীবন আপনাকে বিস্মিত করবে। জীবনের ছোট্র একটি গোনাহের কারণে তারা বছরের পর বছর কান্নাকাটি করে তৌবা করেছেন। এগুলোই হলো প্রকৃত তাসাউফ।

মূল ধারার তাসাউফ থেকে বিচ্যুত মাজারপূজারী ভন্ড পীর-ফকিরদের শরীয়ত বিরোধী কর্মকান্ডের সাথে তাসাউফের দূরতম কোন সম্পর্ক নেই। এরা মূল ধারার তাসাউফ থেকে যোজন যোজন দূরে। বাস্তবতা হলো, শরীয়ত বিরোধী কর্মকান্ডে লিপ্ত ব্যক্তি যে নামেই সমাজে আত্মপ্রকাশ করুক, সে পরিত্যাজ্য। তাসাউফের বিখ্যাত ইমামগণ বলেছেন, তুমি যদি কাউকে বাতাসে উড়তে কিংবা পানিতে হাঁটতে দেখো, শরীয়তের মানদন্ডে উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাকে ওলী-বুজুর্গ ভেবো না। বাহ্যিকভাবে কুরআন-সুন্নাহ ও শরীয়ত বিরোধী ব্যক্তি থেকে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ঘটনা প্রকাশিত হলেও সে ভন্ড প্রতারক। শরীয়ত বিরোধী কেউ কখনও আল্লাহর প্রিয়ভাজন হতে পারে না।

মূল ধারার তাসাউফ চর্চাকারী সালাফে- সালেহীন শরীয়তের সকল বিধি-বিধান পালন করতেনা।
শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিধান হলো কিতাল ও জিহাদ। আল্লাহর জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার সর্বোচ্চ স্তর এটি। মূল ধারার সূফীগণ এই সর্বোচ্চ সুযোগকে হাত ছাড়া করতেন না। এজন্যই তো সালাফে-সালেহীন সম্পর্কে প্রবাদ রয়েছে, তারা ছিলেন রুহবানুল-লাইল, ফুরসানুন নাহার (রাতে আবেদ, দিনে অশ্বারোহী)।

নফস বা প্রবৃত্তি দুনিয়ার লোভ-লালসা ও ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকার দাওয়াত দেয়। নফসের এই দাওয়াত উপেক্ষা করে, নফসের জিহাদে জয়ী হয়েই কেবল নিজেকে কিতালের ময়দানে পেশ করা সম্ভব। নফসের গোলাম কখনও কিতালের ময়দান মাড়ায় না। মূল ধারার সুফীগণ নিজেদের প্রবৃত্তি দমন করেছিলেন। প্রবৃত্তির চাহিদা উপেক্ষা করে জীবনে মায়া ত্যাগ করে কিতালের ময়দানে নিজেদেরকে সঁপে দিতেন। নফসের সাথে জিহাদ করে পরাজিত হয়ে ময়দান থেকে দূরে থাকতেন না। বেঁচে থাকার সীমাহীন আকাঙ্খা ও প্রবৃত্তির তাড়নাকে গলাটিপে হত্যা করে বীরদর্পে এগিয়ে যেতেন তারা। প্রবৃত্তির জিহাদকে মূল বানিয়ে নফসের কাছে আত্মসমর্পণ করে বসে থাকতেন না। গোনাহমুক্ত, যুহদ ও তাকওয়ার রঙে রঙ্গিন এসব সংগ্রামী সূফীদের সংক্ষিপ্ত জীবনী তুলে ধরতেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। পরবর্তী পর্বগুলোতে ইনশাআল্লাহ তাদের জীবনী আলোচনা করা হবে।

সূফীদের সংগ্রামী জীবন (পর্ব-২)
25 June 2015 at 18:04

আলকমা ইবনে মারসাদ রহ. (মৃত:১২০ হি:) বলেন,

আটজন তাবেয়ীর মাঝে জুহদ (দুনিয়া বিমুখতা) সবচেয়ে বেশি ছিল। তারা হলেন,

১. আমের বিন আব্দুল্লাহ রহ.।

২.উয়াইস কারনী রহ.।

৩.হারাম ইবনে হাইয়্যান।

৪. রবী ইবনে খাইসাম।

৫.আবু মুসলিম খাওলানী রহ.।

৬.আসওয়াদ ইবনে ইয়াজীদ রহ.।

৭.মাসরুক ইবনে আজদা রহ.।

৮.হাসান বসরী রহ .।

[জুহদুস সামানিয়া মিনাত তাবেয়ীন , রিয়াতু ইবনে আবি হাতিম , তাহকীক, আব্দুর রহমান ফারতুয়ানী]

এই আটজনকে তাজকিয়া, জুহদ ও তাসাউফের ইমাম ও শিরোমণি মনে করা হয়। গবেষক আলেমগণ বলেছেন, এদের হাতেই মূলত : জুহদ ও তাসাউফ বিকশিত হয়। এজন্যই তাসাউফ ও জুহদের উপর লিখিত অধিকাংশ কিতাবে তাদের জীবন ও কর্ম আলোচিত হয়েছে।

উপর্যুক্ত আটজন তাবেয়ীর মাঝে সাতজন ছিলেন আল্লাহর পথের মুজাহিদ। তারা জিহাদের ময়দানে অংশগ্রহণ করে কুফফারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন।

১. উয়াইস কারনী রহ . ।

খাইরুত তাবেয়ীন হযরত উয়াইস কারনী রহ .। সাহাবায়ে কেরামকে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও তার কাছ থেকে দুয়া চাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন রাসূল স .। তার শাফায়াতে রবীয়া ও মুজার গোত্রের মতো অধিক সংখ্যক লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে । [তারিখুল ইসলাম , ইমাম যাহাবী রহ. , খ.২, পৃ .৫৫৮, আল-ইসাবা , ইবনে হাজার আসকালানী রহ . বর্ণনা নং ৫০০]

ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন যে, তিনি কোন এক যুদ্ধে ইন্তেকাল করেছেন। তবে কোন যুদ্ধ এবং কোন জায়গায় ইন্তেকাল করেছেন এ বিষয়ে মতানৈক্য করেছেন।

ইমাম ইবনে আসাকির রহ . বলেন,

خرج أويس راحلا إلي ثغر أرمينيا فأصابه البطن ، فألتجا إلي أهل خيمة فتوفي هناك

অর্থ : আমেনিয়ার সাগার নামক অঞ্চলে যুদ্ধের উদ্দেশ্য উয়াইস কারনী রহ . সফর করেন। হঠাৎ তিনি পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হন। পীড়ার কারণে একটি তাবুতে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানেই তিনি ইন্তেকাল করেন।

[তাহজীবু তারিখে দিমাশক , খ.৩, পৃ .১৭৭]

আব্দুল্লাহ ইবনে সালিম থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ,

অর্থ : আমরা হযরত উমর রা. এর খেলাফতকালে আজারবাইজানে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। আমাদের সাথে উয়াইস কারনী ছিলেন। আমরা যখন যুদ্ধ থেকে ফিরছিলাম, তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তিনি আরোগ্য লাভ করলেন না। ফলে সেখানেই ইন্তেকাল করলেন। আমরা সেখানে উপস্থিত হলাম। কাফন প্রস্তুত ছিলো। কবর খোড়া হয়ে গিয়েছিল। গোসলের পানিও প্রস্তুত ছিলো। আমরা তাকে গোসল দিলাম। কাফন পরিয়ে জানাজা সম্পন্ন করলাম। এরপর দাফন করলাম। আমাদের কিছু সাথী পরবর্তীতে বলল, চলো তার কবর চিনে রাখি। সেখানে গিয়ে দেখি, সেখানে কোন কবর নেই। কবরের চিহ্নও নেই।

[সিফাতুস সাফওয়া, ইবনুল জাওযী রহ. খ.৩, পৃ.৫৬, হিলয়াতুল আউলিয়া, খ.২, পৃ.৮৩]

কোন কোন ঐতিহাসিক বলেছেন, তিনি সিফফীন অথবা নাহাওয়ান্দের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।

২. আবু মুসলিম খাওলানী রহ.

বিখ্যাত তাবেয়ী ও বুজুর্গ ছিলেন। অসংখ্য কারামত তার হাতে প্রকাশিত হয়েছে। মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদার আসওয়াদ আনাসী তাকে আগুনে নিক্ষেপ করেছিল। কিন্তু আগুন তার কোন ক্ষতি করেনি। এরপর তিনি ইয়ামান থেকে মদীনায় এলেন। হযরত উমর রা. তাকে চুম্বন করে কেঁদে ফেললেন। এবং বললেন, সেই রবের প্রশংসা, যিনি আমাকে মুহাম্মাদ স. এর উম্মতের মাঝে এমন এক ব্যক্তিকে দেখার সৌভাগ্য দিয়েছেন, যার সাথে ইব্রাহীম আ. এর মতো আচরণ করেছেন।

আবু মুসলিম খাওলানী রহ. সম্পর্কে ইবনে কাসীর রহ. বলেন,

وكان ملازما للجهاد وفي كل سنة يغازي بلاد الروم وله مكاشفات، وأحوال و كرامات كثيرة جدا

অর্থ : আবু মুসলিম খাওলানী রহ. নিয়মিত জিহাদে অংশগ্রহণ করতেন। প্রত্যেক বছর রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন। তার অনেক কাশফ, হালত ও অসংখ্য কারামত রয়েছে।

[আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খ.৮, পৃ.১৪৬]

৩.হারাম ইবনে হাইয়্যান রহ.।

বিখ্যাত আবেদ ও দুনিয়াত্যাগী ছিলেন। হযরত উমর ও উসমান রা. এর থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। তার থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন ইমাম হাসান বসরী রহ.।

ইবনে সায়াদ ও অন্যান্য ঐতিহাসিক লিখেছেন, তিনি এক যুদ্ধে ইন্তেকাল করেন। [তবাকাতে ইবনে সায়াদ, খ.৭, পৃ.৯৪, তারীখুল ইসলাম, ইমাম জাহাবী, খ.৩, পৃ.২১২]

মৃত্যুর পূর্বে তিনি অসিয়ত করেছিলেন, তার রর্ম বিক্রি করে যেন ঋণ পরিশোধ করা হয়।

৪.আমের ইবনে আব্দুল্লাহ আল-কাইস:

তিনি প্রত্যহ এক হাজার রাকাত নামায আদায় করতেন। বিখ্যাত আবেদ ও জাহেদ ছিলেন।

তার সংগ্রামী জীবন সম্পর্কে ইবনুল জাওযী রহ. একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

কোন এক যুদ্ধে মুসলমানরা গণীমত একত্র করছিল। আমের বিন আব্দুল্লাহ রহ. একটি গণীমতের একটি থলি নিয়ে এলেন। গণীমত সংগ্রহে নিয়োগপ্রাপ্ত দায়িত্বশীলকে সেটি অর্পণ করলেন।

অন্যান্য মুসলিম বলল, এই গণীমত আমরা কখনও দেখিনি। আমাদের সংগৃহীত কোন গণীমতই এতো মূল্যবান বা এর কাছাকাছি নয়। তারা জিজ্ঞাসা করল, আপনি কে?

তিনি বললেন, না। আল্লাহর শপথ। আমি তোমাদেরকে আমার পরিচয় বলব না। তোমরা আমার প্রশংসায় মগ্ন হবে। অন্যদেরকেও আমার পরিচয় দিবো না।

তাদের মাঝে একজন তাকে অনুসরণ করতে শুরু করল। এমনকি তার সঙ্গীদেরক কাছে এসে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করল। তারা বলল, ইনি হলেন আমের বিন কায়স।

[সিফাতুস সাফওয়া, খ.৩, পৃ.১৩৯]

৫. রবী ইবনে খাইসাম রহ. (মৃত্যু:৬৭ হি:)।

তার সম্পর্কে বিখ্যাত সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন,

لو رأك رسول الله صلي الله عليه وسلم لأحبك

অর্থ: রাসূল স. যদি তোমাকে দেখলে অনেক মহব্বত করতেন।

[হিলয়াতুল আউলিয়া, খ.২, পৃ.১০৬]

অশ্বারোহী হয়ে একটি যুদ্ধ অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে এক জায়গায় তিনি নামায আদায় করছিলেন। তার সামনে থেকেই এক চোর ঘোড়া চুরি করে নিয়ে যায়। তিনি বলেন , প্রভূর সাথে কথোপকথনে কোন কিছুই মনযোগ বিনষ্ট করতে পারে না। হে আল্লাহ , চোর যদি ধনী হয় , তাহলে তাকে হেদায়াত দান করো। আর যদি অভাবগ্রস্ত হয় , তাহলে তাকে ধনী বানিয়ে দাও।

[আজ-জুহদ , ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ ., পৃ .৩১৪]

৬.মাসরুক ইবনে আজদা আল-কুফী রহ .

তাবেয়ী মাসরুক রহ . বিখ্যা আবেদ ছিলেন। ইমাম শা 'বী রহ . বলেন, ইমাম মাসরুকের ইন্তেকালের সময় তার কাছে কাফন ক্রয়ের মতো সম্পদ ছিলো না।

হিশাম আল-কালবী তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন , তিনি বলেন , ইমাম মাসরুক রহ . কাদিসিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এ যুদ্ধে তিনি আহত হন। আহতে হওয়ার কারণে তার হাত অবশ হয়ে যায়।

[হিলয়াতুল আউলিয়া , খ.৪, পৃ .১৫৫]

৭. হাসান বসরী রহ .।

তাসাউফের এমন কোন কিতাব নেই , যেখানে তার কথা আলোচনা করা হয়নি। তিনি তাসাউফের প্রথম সারির ইমাম ছিলেন।

ইবনে সায়াদ বর্ণনা করেছেন , এক ব্যক্তি হাসান বসরী রহ . কে জিজ্ঞাসা করল , হে আবু সায়াদ , আপনি কি যুদ্ধ করেছেন ? তিনি বললেন , হ্যা। আমি আব্দুর রহমান ইবনে সামুরার সাথে কাবুল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি।

[আত-ত্বাবাকাতুল কুবরা , খ.৩, পৃ .১৭৫]

ইমাম জাহাবী রহ . তাজকিরাতুল হুফফাজে লিখেছেন ,

ولازم الجهاد ولازم العلم والعمل وكان أحد الشجعان الموصوفين

অর্থ : তিনি নিয়মিত জিহাদে অংশগ্রহণ করতেন। ইলম ও আমলে অগ্রণী ছিলেন। যুদ্ধে বিখ্যাত বীরদের অন্যতম ছিলেন।

[তাজকিরাতুল হুফফাজ , খ.১, পৃ .৮১, এছাড়াও দেখুন , তাহজীবুত তাহজীব , ইবনে হাজার আসকালানী রহ. খ.১, পৃ .৪৮৩]

[চলবে]

সূফীদের সংগ্রামী জীবন (পর্ব -৩)

26 June 2015 at 16:20

দ্বিতীয় হিজরী শতকের সূফীগণ

দ্বিতীয় হিজরী শতকের বিখ্যাত দুই বুজুর্গ , আবিদ ও জাহিদ হলেন, মুহাম্মাদ বিন ওয়াসি ও মালিক ইবনে দিনার। তারা উভয়ে তাসাউফের বড় ইমাম ছিলেন। হাসান বসরী রহ . এর সংশ্রবে ধন্য হোন। জুহদ ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে তাদের প্রসিদ্ধি আকাশচুম্বী।

মুহাম্মাদ বিন ওয়াসি :

ইমাম যাহাবী রহ . সিয়ারু আ 'লামিন নুবালাতে মুহাম্মাদ ওয়াসি (মৃত :১২৩ হি :) এর পরিচয় দিয়েছেন এভাবে ,

الإمام الرباني القدوة

অর্থ : আমাদের অনুসরণীয় আদর্শ আল্লাহ ওয়ালা বুজুর্গ ইমাম।

ইমাম মু 'তামির তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন , তিনি বলেন

ما رأيت أحدا قط أخشع من محمد بن واسع

অর্থ : আমি মুহাম্মাদ বিন ওয়াসি এর চেয়ে খোদাভীরু কাউকে কখনও দেখিনি।

[সিয়ারু আ 'লামিন নুবালা]

জা'ফর ইবনে সুলাইমান বলেন ,

كنت إذا وجدت من قلب قسوة غدوت فنظرت إلى وجه محمد بن واسع كان كأنه ثكلى

অর্থ : যখনই আমি আমার কঠিন হয়ে যেত, আমি মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসি এর কাছে চলে যেতাম। এবং তার চেহারা দর্শন করতাম। এটাই যেন আমার কঠিন হৃদয়ের উপশম।

[সিয়ারু আ 'লামিন নুবালা]

হাম্মাদ ইবনে জায়েদ বলেন,

قال رجل لمحمد بن واسع اوصيني قال اوصيك أن تكون ملكا في الدنيا والآخرة قال كيف قال ازهد في الدنيا

অর্থ : এক ব্যক্তি মুহাম্মাদ বিন ওয়াসি 'কে বলল, আমাকে কিছু ওসীয়ত করুন। তিনি বললেন, আমি তোমাকে দুনিয়া ও আখিরাতের বাদশাহ হওয়ার অসিয়ত করছি। সে বলল, কীভাবে? তিনি বললেন, দুনিয়ার লোভ-লালসা ত্যাগ করে পরকালমুখী হও (জাহিদ হও)।

[সিয়ারু আ 'লামিন নুবালা]

খুরাসানের আমির ও বিখ্যাত ইসলামী বীর সেনানী কুতাইবা ইবনে মুসলিম আল-বাহিলী (মৃত : ৯৬ হি :) মধ্য এশিয়া বিজয় করে ইসলামী শাসনাধীন করেন। তিনি প্রথম হিজরী শতকেই আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ইরান, চীনের কাশগর ও শিনজিয়াং অঞ্চলে ইসলামী পতাকা উড্ডীন করেন। বোখারা-সমরকন্দ, খাওয়ারিজম ও কাশগরের বিজেতা হিসেবে তিনি প্রসিদ্ধ।

বিখ্যাত বুজুর্গ মুহাম্মাদ ওয়াসি কুতাইবা ইবনে মুসলিমের সাথে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন। খুরাসান ও মধ্য এশিয়ার যুদ্ধগুলোতে তিনি কুতাইবা ইবনে মুসলিমের সেনাবাহিনীতে ছিলেন।

ইমাম ইসমায়ী বলেন,

قال الاصمعي لما صاف قتيبة بن مسلم للترك وهاله أمرهم سأل عن محمد بن واسع فقيل هو ذاك في الميمنة جامح على قوسه يبصبص بأصبعه نحو السماء قال تلك الاصبع أحب الي من مئة ألف سيف شهير وشاب طرير

অর্থ :

কুতাইবা ইবনে মুসলিম যখন তুর্কীদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীকে সারিবদ্ধ করলেন, তুর্কিদের ব্যাপারে তার মনে সামান্য ভয়ের সঞ্চার হল। তিনি মুহাম্মাদ বিন ওয়াসি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তাকে বলা হল, ওই তো সে ডান দিকে ধনুকের উপর ভর করে বসে আছে।

আসমানের দিকে হাত উঠিয়ে আঙ্গুল নাড়ছে (দুয়া করছে) । কুতাইবা বললেন , তার এই আঙ্গুলগুলি আমার কাছে এক লাখ প্রসিদ্ধ তরবারী ও এক লাখ বীর যোদ্ধা থেকে অধিক প্রিয়।

[সিয়ারু আ 'লামিন নুবালা , হিলয়াতুল আউলিয়া , খ.২, পৃ .৩৫৩]

ইবনে ওয়াসি রহ . খুব কম হাদীস বর্ণনা করতেন। অধিকাংশ সময় চুপ থাকতেন। তাকে আবদাল হিসেবে গণ্য করা হয়। [আজ-জুহদ , ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ , পৃ .৩০৭]

তার বেশ -ভূসা খুবই সাধারণ ছিলো । পশমের কাপড় পড়তেন। গভর্ণর মালিক ইবনুল মুনজির তাকে বিচারকের পদ গ্রহণের নির্দেশ করে। তিনি এটি গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। গভর্ণর তাকে ডেকে পাঠান। এবং বলেন , তুমি বিচারকের পদ গ্রহণ করো , নতুবা তোমাকে তিন শ বেত্রাঘাত করবো। তিনি বললেন ,

إن تفعل فإنك مسلط وإن ذليل الدنيا خير من ذليل الآخرة

অর্থ : আপনি যদি বেত্রাঘাত করতে চান , সে ক্ষমতা আপনার আছে। তবে দুনিয়ার লাঞ্ছনা পরকালের লাঞ্ছনা থেকে অধিক উত্তম।

[সিয়ারু আ 'লামিন নুবালা]

ইমাম ইবনে উয়াইনা রহ . বলনে,

قال ابن واسع لو كان للذنوب ريح ما جلس إلي أحد

অর্থ : ইবনে ওয়াসে রহ . বলেন, গোনাহের যদি দুর্গন্ধ থাকত , তাহলে কারও পাশে বসা যেত না।

[সিয়ারু আ 'লামিন নুবালা]

https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A3%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A1/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9

[চলবে]

উঁচু আওয়াজে আমিন বলার বিষয়ে আহলে হাদীসদের নিকট কিছু প্রশ্ন (পর্ব-১)
8 July 2015 at 10:50

আহল হাদীস ভাইয়েরা তাদের বক্তৃতা ও লেখনীতে নিজেদের মতবাদ এতো জোশের সাথে উপস্থাপন করে, মনে হয় যেন এদের কাছে অসংখ্য দলীল আছে। দলিলের ভারে তারা নুয়ে পড়ছে। এর বিপরীতে হানাফীদের কাছে কোন দলিলই নেই। কনফিডেন্সের সাথে মিথ্যা ও ধোকার আশ্রয় নেয়ার কারণে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্তিতে পড়ে যান, সত্যিই মনে হয়, এদের কাছে অংখ্য দলিল আছে।

এদের এই কনফিডেন্সের বাস্তবতা তখন স্পষ্ট হয়, যখন হানাফী আলেমগণ এদেরকে দাওয়াত দেন, আসুন আমরা আলোচনায় বসি। আপনাদের অসংখ্য দলিল দিয়ে আমাদের অবস্থান ভুল প্রমাণ করুন। আমরা দৈনন্দিন আমল করছি, এমন যে কোন মাসআলা নিয়ে আলোচনায় বসতে হানাফী আলেমগণ সদা প্রস্তুত থাকেন। কিন্তু এসব হুংকার ছাড়া আহলে হাদীসগণ তখন একেবারে চুপসে যান। পালাবার পথ খোজেন। এটাই বাস্তবতা। এতোই যদি দলিল থাকে, তাহলে আলোচনায় বসতে ভয় পান কেন?

সত্য কথা হল, অধিকাংশ সাধারণ মানুষ এসব দলিলের কিছুই বোঝে না। বুঝলেও খুব সামান্য। সাধারণ মানুষের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে এসব আহলে হাদীস হংকার ছাড়ে। কিন্তু একই হুংকার যখন আলেমের সামনে ছাড়তে বলা হয়, তখন গলা শুকিয়ে যায়।

এজন্য সাধারণ মানুষের কর্তব্য হলো, এদের এসব কনফিডেন্সের সাথে মিথ্যা ও ধোকাবাজীতে প্রভাবিত না হয়ে এদেরকে আলেমদের মুখোমুখি করুন। আলেমদের সাথে আলোচনার ব্যবস্থা করে দিন। তখন বোঝা যাবে, কার দলিলের পাল্লা কতো ভারী।

এধরণের একটি বিষয় হলো, নামাযে নিম্ন আওয়াজে আমীন বলা। আমাদের নিকট নিম্ন আওয়াজে আমীন বলা সুন্নত। এটাই আমরা আমল করি। আমাদের দলিলের বিপরীতে কেউ আমাদের দলিলের চেয়ে অধিক শক্তিশালী দলিল দ্বারা সমস্ত মুক্তাদীর জন্য উঁচু আওয়াজে আমিন প্রমাণ করতে পারে, আমরা সাদরে গ্রহণ করবো। এবং লিখে দিবো, সমস্ত মুক্তাদী জোরে আমিন বলবে। এজন্যই আমরা আহলে হাদীস ভাইদের কাছে তাদের শক্তিশালী দলিল চেয়ে বহু পোস্ট দিয়েছি। কিন্তু তাদের পক্ষ থেকে কোন সদুত্তর পাইনি।

সাত-আট মাস আগে বা এরও আগে খুবই সংক্ষেপে উঁচু আওয়াজে আমীন বলার বিষয়ে একটি নোট লিখেছিলাম। একেকটি হাদীসের উপর দু'এক লাইনে আলোচনা শেষ করেছিলাম। যেহেতু সংক্ষিপ্ত একটি নোট লেখার ইচ্ছা ছিলো, এজন্য বিস্তারিত কোন বিষয় আলোচনা করা হয়নি। জনৈক আহলে

হাদীস ভাই উক্ত নোটের একটি হাদীসের একজন বর্ণনাকারী সম্পর্কে জবাব দেয়ার চেষ্টা করেছেন। এই সিরিজে ইনশাআল্লাহ তার অভিযোগগুলোর জবাবসহ আমীনের উপর কয়েক পর্বে আলোচনার নিয়ত রয়েছে।

আমরা যেমন আহলে হাদীস ভাইদের অভিযোগের উত্তর দিচ্ছি , বিলম্বে হলেও তাদের পক্ষ থেকে আমরা উত্তর পাব বলে আশা রাখি।

নামাযে সূরা ফাতিহা শেষে আমিন বলা সুন্নত। আমিন হলো দুয়া। সূরা ফাতিহা শেষে আমরা আল্লাহর কাছে আবেদন করি , হে আল্লাহ , আমাদের দুয়া কবুল করুন। আমিন শব্দের অর্থই হলো , ইস্তাজিব। হে আল্লাহ , কবুল করুন। আমিন পবিত্র কুরআনের কোন অংশ নয়। নামাযে সূরা ফাতিহার মাঝে যেসব দুয়া রয়েছে , সেগুলো কবুলের জন্য আমিন বলা হয়।

আমাদের আহলে হাদীসদের ভাইদের মাজহাব হলো , মুক্তাদী ইমামের পেছনে এতো উচু আওয়াজে আমীন বলবে যেন মসজিদ গম গম করে। সকল মুক্তাদী একই সাথে এভাবে আমীন জোরে বলার কোন সহীহ হাদীস নেই। আমাদের আহলে হাদীস ভাইদের সাথে এখানে আমাদের মূল মতবিরোধ। আহলে হাদীস মুক্তাদীগণ সকলেই জোরে আমীন বলেন। আমরা তাদের কাছে নিবেদন করেছিলাম , আপনারা যেই আমল করছেন, এ ব্যাপারে মাত্র একটি সহীহ হাদীস দেখান। রাসূল স . এর পিছে সকল সাহাবায়ে কেরাম এভাবে উচু আওয়াজে আমীন বলেছেন। মাত্র একটি সহীহ হাদীস।

আল-হামদুলিল্লাহ। তারা এ পর্যন্ত সকল মুক্তাদী একই সাথে আমীন জোরে বলার কোন সহীহ হাদীস দেখাতে পারেনি। সত্য কথা হলো , বর্তমানের আহলে হাদীসদের আমলের পক্ষে কোন সহীহ হাদীস নেই ও।

আহলে হাদীসদের অনুসরণীয় আলেম শায়খ নাসীরুদ্দীন আলবানী এই সত্যতা স্বীকার করেছেন। শায়খ আলবানী বলেন,

ليس في تأمين المؤتمين جهرا سوى هذا الأثر ولا حجة فيه لأنه لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءت أحاديث كثيرة في جهر النبي صلى الله عليه وسلم وليس في شئ منها جهر الصحابة بها وراءه صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم أن التأمين دعاء والأصل فيه الإسرار لقوله تعالى : (ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين) فلا يجوز الخروج عن هذا الأصل الا بدليل صحيح وقد خرجنا عنه في تأمين الإمام جهرا لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم ووقفنا عنده بخصوص المقتدين ولعله لذلك رجع الشافعي عن قوله القديم فقال في " الآم " (1 / 65) : " فإذا فرغ الإمام من قراءة القرآن قال : آمين

ورفع بها صوته ليقتدي بها من خلفه فإذا قالها قالوها وأسمعوا أنفسهم ولا أحب أن يجهروا بها فإن فعلوا

" فلا شئ عليهم

অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর রা. এর আমল ছাড়া মুক্তাদী জোরে আমিন বলা কোন দলিল নেই। আর আব্দুল্লাহ ইবনে জোবায়ের রা. এর আমলটিও মুক্তাদীগণের জোরে আমীন বলার দলিল হতে পারে না। কেননা, তিনি এটি রাসূল স. থেকে বর্ণনা করেননি। রাসূল স. এর উঁচু আওয়াজে আমীন বলার বিষয়ে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এগুলোর কোনটিতেই একথা নেই যে, রাসূল স. এর পেছনে সাহাবায়ে কেরাম উঁচু আওয়াজে আমীন বলেছেন। সকলেরই জানা রয়েছে যে, আমীন হলো দুয়া। আর দুয়ার ক্ষেত্রে মূল হলো, আস্তে বলা। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, তোমরা তোমাদের প্রভুকে বিনয়ের সাথে নিচু আওয়াজে ডাকো (দুয়া করো)। কেননা তিনি সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না।" সুতরাং সহীহ দলিল ছাড়া পবিত্র কুরআনের এই মূলনীতির বিপরীত করাটা জায়েজ হবে না। এই মূলনীতি থেকে ইমামের উঁচু আওয়াজে আমীন বলার বিষয়টিকে আমরা ব্যতিক্রম বলেছি, কেননা এটি রাসূল স. থেকে প্রমাণিত। কিন্তু মুক্তাদীর ক্ষেত্রে এই মূলনীতি থেকে বের হওয়া থেকে বিরত থেকেছি। আর হয়তো এজন্যই ইমাম শাফেয়ী রহ. আমিন উঁচু আওয়াজে বলার বিষয়ে তার পূর্বের মত থেকে ফিরে আসেন। ইমাম শাফেয়ী রহ. তার কিতাবুল উম্ম-এ লিখেছেন, " ইমাম যখন কুরআন তেলাওয়াত (সূরা ফাতিহা) শেষ করবে তখন আমীন বলবে। এবং উচু আওয়াজে বলবে। যেন তার পেছনের মুসল্লীরা তাকে অনুসরণ করে আমীন বলতে পারে। ইমাম যখন আমীন বলবে, তখন মুসল্লীগণও আমীন বলবে। মুসল্লীরা শুধু নিজেদেরকে শোনাবে (এতটুকু আওয়াজে বলবে যেন নিজে শুনতে পারে)। আমি এটা পছন্দ করি না যে, তারা উচু আওয়াজে আমীন বলবে। এরপরও তারা যদি উচু আওয়াজে বলে, তাহলে এতে কোন গোনাহ নেই। [আল-উম্ম, খ.১, পৃ.৬৫]"

[তামামুল মিন্না, শায়খ নাসীরুদ্দীন আলবানী, খ.১, পৃ.১৭৭]

http://islamport.com/d/2/fqh/1/40/982.html

ইহুদীরা আমীন বলার বিষয়ে হিংসা করে এই হাদীসের আলোকে আলবানী সাহেব পরবর্তীতে তার মত পরিবর্তন করেন। আমীন বলার বিষয়ে ইহুদীদের হিংসা করার হাদীসে আমীন আস্তে বা জোরে বলার কোন কথা নেই। সুতরাং এটা আমিন জোরে বলার কোন দলিলই হতে পারে না। উপরন্তু এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীসটি দুর্বল। শায়খ আলবানী এটি সহীহ বললেও বাস্তবে হাদীসটি দুর্বল।
এই হাদীসের উপর বিস্তারিত পর্যালোচনা পরবর্তীতে উল্লেখ করবো ইনশাআল্লাহ।

মোটকথা, মুক্তাদীগণ উঁচু আওয়াজে আমীন বলার বিষয়ে রাসূল স. থেকে কোন সহীহ হাদীস নেই। যদি কোন সহীহ হাদীস থাকে, আহলে হাদীস ভাইদের কাছে নিবেদন রাখবো, আমাদেরকে হাদীসটি পেশ করুন।

রাসূল স. মুক্তাদীরকে জোরে আমীন বলার নির্দেশ দিয়েছেন অথবা সাহাবায়ে কেরাম রাসূল স. এর পিছে জোরে আমীন বলেছেন, এই মর্মে মাত্র একটা সহীহ হাদীস দেখাবেন। মাত্র একটা। তবে শর্ত হলো, সেটা সহীহ হতে হবে।

একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ:

বোখারী-মুসলিম সহ অসংখ্য হাদীসের কিতাবে রয়েছে, রাসূল স. বলেছেন, ইমাম যখন ওলাজ্জাল্লীন বলবে তোমরা তখন আমীন বলো। কেননা, যার আমীন ফেরেশতাদের আমীনের সাথে মিলবে, তার পূর্ববর্তী গোনাহ মাফ হয়ে যাবে।

এই হাদীস থেকে আহলে হাদীস থেকে আমরা আহলে হাদীস ভাইদের কাছে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর চাচ্ছি,

১. আহলে হাদীসদের নিকট ইমামে পেছনে সূরা ফাতিহা পড়া ফরজ। ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা না পড়লে নামায হবে না। কারণ ইমামের সূরা ফাতিহা মুক্তাদীদের জন্য যথেষ্ট নয়।

আমাদের প্রশ্ন হল, মুক্তাদী সূরা ফাতিহা কখন পড়বে?

১. কোন ব্যক্তি যদি ইমামের সূরা ফাতিহা অর্ধেক পড়ার সময় অংশ গ্রহণ করে, তাহলে সে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া শুরু করবে। এই ব্যক্তির সূরা ফাতিহার কিছু অংশ পড়ার সময় ইমাম সূরা ফাতিহা শেষ করে আমীন বলে। আহলে হাদীসদেরকে দেখা যায়, তাদের সকলেই এক সাথে আমীন বলে। এটা কীভাবে সম্ভব? এই ব্যক্তি তো মাত্র সূরা ফাতিহা শুরু করলো। অর্ধেক সূরা ফাতিহা পড়ে আমীন বলার বিধান কোন হাদীসে আছে?

২. এই ব্যক্তি ইমামের সাথে আমীন বলার পর তার অবশিষ্ট সূরা ফাতিহা পড়বে কি না? যদি অবশিষ্ট সূরা ফাতিহা পড়ে, তাহলে তার নিজের সূরা ফাতিহা শেষে আমীন বলবে কি না? যদি আমীন বলে, তাহলে ইতিপূর্বে ইমামের সাথে কেন আমীন বলল? তাদের নিকট যেহেতু ইমামের সূরা ফাতিহা মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা নয়, তাহলে ইমামের আমীন মুক্তাদীর আমীন হয় কীভাবে?

৩. এই ব্যক্তি দ্বিতীয়বার যদি আমীন বলে তাহলে একই নামাযে সে দু'বার আমীন বলছে। তার এই দুই আমীনের কোনটি ফেরেশতাদের সাথে মিলবে? সূরা ফাতিহা না পড়ে কিংবা অর্ধেক পড়ে ইমামের সাথে যেই আমীন বলেছে, সেটা ফেরেশতাদের সাথে মিলবে না কি পরবর্তীতে নিজে যখন আমীন বলবে সেটা ফেরেশতার সাথে মিলবে?

৪. অনেক সময় ইমাম খুব দ্রুত সূরা ফাতিহা পড়েন। সাধারণ মুসল্লীর পক্ষে ইমামের সাথে সাথে সূরা ফাতিহা শেষ করা সম্ভব হয় না। এই অবস্থায়ও দেখা যায় আহলে হাদীসরা নিজেদের সূরা ফাতিহার অর্ধেক পড়েই জোরে আমীন বলে। এভাবে সূরা ফাতিহার অর্ধেক পড়ে আমীন বলার একটি হাদীস দেখান।

৫. ইমামের পেছনে যারা সূরা ফাতিহা পড়ার মত দিয়েছেন, তারা কেউ ইমামের সাথে সাথে সূরা ফাতিহা পড়ার কথা বলেন না। বরং তাদের মত হলো, ইমাম সূরা ফাতিহা শেষ করে কিছুক্ষণ নীরব থাকবে, তখন মুক্তাদী সূরা ফাতিহা পড়বে। আহলে হাদীসরা যদি এভাবে আমল করে, তাহলে নামাযে দু'বার আমীন বলা হয়। একবার ইমামের সাথে। একবার নিজে। আমাদেরকে বলুন, আপনাদের কোন আমীন ফেরেশতাদের আমীনের সাথে মেলে?

৬. ইমামের তেলাওয়াত না শুনে তার সাথে সাথে নিজে সুরা ফাতিহা পড়া জায়েয নয়। কারণ সূরা আ'রাফে স্পষ্ট নিষেধ রয়েছে। সুতরাং আহলে হাদীসদের ভাইদের কাছে আমাদের জিজ্ঞাসা হলো, নিজের সূরা ফাতিহা শেষ না হলেও ফাতিহার অর্ধেক পড়ে আমীন বলার বিধান কী? এরপর আবার নিজে যখন ফাতিহা পড়বে তখন দ্বিতীযবার আমীন বলবে কি না? যদি বলে, তাহলে এই দু'টো আমীনের কোনটা ফেরেশতাদের সাথে মিলবে? ইমামের পেছনে সকল মুক্তাদী একই সাথে একই সময়ে সূরা ফাতিহা শেষ করা সম্ভব নয়। সুতরাং সকল মুক্তাদী একই সাথে কীভাবে আমীন বলবে?

৭. শায়খ নাসীরুদ্দীন আলবানী বর্তমান সময়ে আমীন বলার বিষয়ে একটি ফতোয়া দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন,

ومن تمام ذلك موافقة الإمام فيه وعدم مسابقته وهذا أمر قد أخل به جماهير المصلين في كل البلاد التي أتيح لي زيارتها ويجهرون فيها بالتأمين

فإنهم يسبقون الإمام يبتدئون به قبل ابتداء الإمام ويعود السبب في هذه المخالفة المكشوفة إلى غلبة الجهل عليهم وعدم قيام أئمة المساجد وغيرهم من المدرسين والوعاظ بتعليمهم وتنبيههم حتى أصبح قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا أمن الإمام فأمنوا . . " نسيا منسيا عندهم إلا من عصم الله وقليل

অর্থ: আমিন বলার নিযম হলো, ইমামের সাথে আমীন বলা। ইমামের পূর্বে আমিন বলা শুরু না করা। এটি এমন একটি বিষয়, যেখানে অধিকাংশ মুসলিম দেশ যেখানে আমার যাওয়ার সুযোগ হয়েছে, এক্ষেত্রে মুসল্লীরা ভুল করে। তারা উঁচু আওয়াজে আমীন বলে থাকে। কিন্তু ইমামের পূর্বেই আমীন বলা শুরু করে। এটি তাদের মুর্খতার বহি:প্রকাশ। মসজিদের ইমাম, শিক্ষক ও শায়খগণ তাদেরকে সঠিকভাবে শিক্ষা দেয় না এবং তাদেরকে সতর্ক করে না একারণে এটি বিস্তার লাভ করেছে। এমনকি রাসূল স. এর এই হাদীসটি সবাই বিস্মৃত হয়েছে। রাসূল স.

فيه خطأ -يا إخواننا!- من بعض المصلِّين منتشرٌ في المساجد، ليس في مساجد بلدة معينة؛ بل البلاد الإسلامية كلها -مع الأسف-، لا نستثني من ذلك حتى الحرمين الشريفين؛ وهي: مسابقة المقتدين للإمام بالتَّأمين، ولو لم يكن هناك إلا الحكم العام؛ وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ). لو لم يكن في الموضوع إلا هذا الحديث العام الذي يعني في دلالته أن يكون المؤتم مقتديًا بالإمام وليس سابقًا له، أو متقدِّمًا عليه؛ فكيف وهناك حديثٌ خاص يتعلق بهذه المسألة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: (إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)؟!

فهذا الحديث صريحٌ جدًّا (إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا). الآن قبل أن يؤمِّن الإمام المقتدين يطلعوا صوت عالي يرج المكان به؛ يقولون: " آمـين " وهو يمكن -واحد مثل حكايتي- ما زال ما خلص من: ((ولا الضَّـآلين)). ولذلك فأنا أُذكِّر -والذكرى تنفع المؤمين-: كل مُصلِّي فَرضٌ عليه في صلاة الجماعة أن يتنبَّه لتلاوة القرآن من الإمام؛ لأنها صلاة جهرية وأن يتدبر: أولاً: ما يسمع من القرآن. وثانيًا: أن يحبس نفَسَهُ، إذا وصل الإمام إلى قوله: ((غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ)) لا يحرك لسانه بـ:" آمين " قبل أن يسمع بدء الإمام بـ: "آمين"، قبل أن يسمع بدء الإمام بـ: "آمين" ما قبل ما ينتهي الإمام من قراءة ((ولا الضآلين))! هذا خطأ فحش جدًّا جدًّا. ومن فحشه: أنَّه يأثم عند ربه؛ لأنه يخالف قوله عليه السَّلام: (إِذَا أَمَّنَ فَأَمِّنُوا). ومن فحشه: أنَّه يخسر مغفرة ربه بسبب سمحٍ سهلٍ، شو هو؟ احبس نَفَسَك، لا تسبُق الإمام بـ: "آمين"؛

কারণে আল্লাহর কাছে গোনাহগার হবে। কেননা সে রাসূল স. এর বক্তব্যের বিরোধীতা করছে। এই নিন্দনীয় ভুলের আরেকটি দিক হলো, এই ভুলের কারণে সে আল্লাহর ক্ষমা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে (ফেরেশতাদের সাথে আমীন না মেলার কারণে)। সুতরাং নিজেকে সংযত করো। ইমামের পূর্বে আমীন বলো না।

সূত্র: http://albanyimam.com/play.php?catsmktba=12574

আমাদের দেশের আহলে হাদীস ভাইয়েরা আলবানী সাহেবের অনুসরণ করে থাকে। সুতরাং তার মতে আহলে হাদীস ভাইয়েরাও নিন্দনীয় ভুলের শিকার হয়ে গোনাহগার হচ্ছে। এ বিষয়েও তাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য আশা করছি।

৮. আহলে হাদীসদের মাসআলা হলো, নারী-পুরুষের নামাযে কোন পার্থক্য নেই। রাসুল স. বলেছেন, আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখো, সেভাবে নামায পড়ো। এর থেকে তারা বলে, নারী- পুরুষের নামাযে পার্থক্য করার কোন দলিল নেই। উভয়ে একইভাবে নামায পড়বে। আহলে হাদীস মহিলারা যেহেতু মসজিদে জামাতে নামায পড়ে, সুতরাং তারাও আহলে হাদীস পুরুষদের মতো জোরে আমীন বলবে না কি আস্তে? যদি আস্তে বলে, তাহলে এর দলিল দিন। আর মহিলাদের আমিনের আওয়াজে আহলে হাদীসদের মসজিদ গম গম করে কি না সেটাও আমাদের জিজ্ঞাসা। আশা করি এগুলোর উত্তর পাবো।

সূফীদের সংগ্রামী জীবন (পর্ব-৪)
7 August 2015 at 01:48

দ্বিতীয় হিজরী শতকের অন্যতম সূফী ছিলেন ইমাম মালিক ইবনে দিনার রহ। ত্বরীকত ও তাসাউফের শীর্ষস্থানীয় ইমাম ছিলেন তিনি। কুনুজুল আউলিয়া গ্রন্থকার বর্ণনা করেন, মালিক ইবনে দিনার রহ. দীর্ঘ দিন যাবৎ যুদ্ধে অংশ গ্রহণের অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান ছিলেন। পরবর্তীতে যুদ্দের উদ্দেশ্যে মুসলিম সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। যুদ্ধ শুরু হলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এমনকি ঘোড়ার পিঠে আরোহণের মতো শক্তি তার ছিলো না। লোকেরা তাকে একটি তাবুতে নিয়ে যায়। সেখানে তিনি কান্না শুরু করেন। নিজেকে ভর্সৎসনা করে বলতে থাকেন, আমার শরীরে কল্যাণকর কিছু থাকলে আজ আমি জ্বরে আক্রান্ত হতাম না...।

মালিক ইবনে দিনার রহ. এর বিখ্যাত উক্তি:

১. মানুষের অন্তরে দুনিয়ার ভালোবাসা প্রবল হলে ওয়াজ-নসীহত কোন ফল দেয় না।

২. কারও নিকৃষ্ট হওয়ার জন্য এটুকু যথেষ্ট যে, সে নিজে নেককার নয় আবার নেককারদের সমালোচনায় লিপ্ত।

দ্বিতীয় হিজরী শতকের মধ্যবর্তী সময়ের বিখ্যাত বুজুর্গ হলেন , উতবা আল-গোলাম রহ .। তিনি অধিক ইবাদত , কান্নাকাটির জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। আল্লাহর ভয় ও তাকওয়ার দিক থেকে তাঁকে হাসান বসরী রহ . এর সঙ্গে তুলনা করা হতো।

হিলয়াতুল আউলিয়াতে ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী রহ . বর্ণনা করেন , ইমাম উতবা বলেন , আমার জন্য এমন একটি ঘোড়া ক্রয় করো , যেটা দেখে মুশরিকরা হিংসায় জ্বলতে থাকবে। তিনি শামের বিভিন্ন অঞ্চলে জিহাদে অংশগ্রহণ করেন।

উতবা রহ. এর সঙ্গে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন বিখ্যাত বুজুর্গ আব্দুল ওয়াহিদ ইবনে যায়েদ। [হিলয়াতুল আউলিয়া , খ.৬, পৃ .১৬০, ১৬২]

আব্দুল ওয়াহিদ বিন যায়েদ রহ . এর বিখ্যাত উক্তি রয়েছে ,

لكل طريق مختصر و مختصر طريق الجنة الجهاد

অর্থ : প্রত্যেক রাস্তার শর্টকাট (সংক্ষিপ্ত রাস্তা) থাকে। জান্নাতে যাওয়ার সংক্ষিপ্ত রাস্তা হলো জিহাদ

[হিলয়াতুল আউলিয়া , খ.৬, পৃ .১৫৭]

ইব্রাহীম ইবনে আদহাম রহ . [মৃত :১৬২ হি :]

============

দুনিয়ার সকল ঐশ্বর্য পায়ে দলে যিনি আল্লাহর পথিক হয়েছিলেন। রাজ সিংহাসন পরিত্যাগ করে যিনি দরবেশী গ্রহণ করেন। ইতিহাসের সেই অমর ব্যক্তিত্ব ইব্রাহীম ইবনে আদহাম রহ . শুধু বুজুর্গই ছিলেন না , আল্লাহর পথের অকুতোভয় মুজাহিদও ছিলেন।

ইমাম ইবনে আসাকির রহ. তার সম্পর্কে লিখেছেন , "তিনি একজন দু :সাহসী ঘোড়সওয়ার ও অকুতোভয় বীর যোদ্ধা ছিলেন। "

[তাহজিবু তারিখি দিমাশক , খ.২, পৃ .১৭৯]

তিনি বাইজেন্টাইনে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

তার খোদাভীতি ও জুহদ সম্পর্কে প্রশংসা করেছেন ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ ., ইমাম আওজায়ী, ইমাম সুফিয়ান সাউরী , ইমাম নাসায়ীসহ অন্যান্য ইমামগণ।

ইমাম ইবনে হিব্বান রহ . বলেন,

"ইব্রাহীম ইবনে আদহাম রহ . বলখে জন্মগ্রহণ করেন। এরপরও তিনি হালাল রুজির জন্য শামের উদ্দেশ্যে সফর করেন। সেখানে তিনি আল্লাহর পথে যুদ্ধ ও পাহারায় অংশ গ্রহণ করতে থাকেন। সীমাহীন তাকওয়া , খোদাভীতি ও মোজাহাদা ছিলো তার আমৃত্যু ভূষণ। "

ইমাম ইবনে কাসীর রহ . ও ইয়াকুত হামাবী তার ইন্তেকাল সম্পর্কে বলেন ,

১৬২ হিজরীতে পারস্য সাগরের একটি দ্বীপে তিনি কাফেরদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। বিনিদ্র রজনী আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দিতে থাকেন। কাফেরদের উদ্দেশ্য তীর উদ্যত অবস্থায় যুদ্ধের ময়দানে তিনি ইন্তেকাল করেন।

[আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া , খ.১০, পৃ .১৪৫, মু 'জামুল বুলদান]

শাক্বীক বালখী রহ . [মৃত :১৯৪ হি :]

=========

বিখ্যাত সুফী শাক্বীক বালখী রহ . এর অমূল্য নসীহত তাসাউফের ভান্ডার সমৃদ্ধ করেছে। তাসাউফের বিখ্যাত এই ইমাম একজন বীর যোদ্ধাও ছিলেন। তাকওয়া , যুহদ ও মোজাহাদায় নিমগ্ন এই বুজুর্গ যুদ্ধের ময়দানে ছিলেন ইস্পাত কঠিন।

وروى محمد بن عمران ، عن حاتم الأصم قال : كنا مع شقيق ونحن مصافو العدو الترك ، في يوم لا أرى إلا رءوسا تندر وسيوفا تقطع ، ورماحا تقصف ، فقال لي : كيف ترى نفسك ، هي مثل ليلة عرسك ؟ قلت : لا والله ، قال : لكني أرى نفسي كذلك

তার শিষ্য হাতেম আল -আসম বর্ণনা করেন , "আমরা শাক্বীক বলখী রহ . এর সাথে একই কাতারে তুর্কিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলাম। দিনটি ছিল ভয়াবহ। চারদিকে কর্তিত মস্তক , উড়ন্ত তীর আর তলোয়ার ভাঙার শব্দ। শাক্বীক বলখী রহ . আামাকে বললেন, হে হাতেম , এই দিনে তোমার অনুভূতি কী ? আজকের দিনের অনুভূতি কি তোমার বাসর রাতের অনুভূতির মতো ? হাতেম বললেন , আল্লাহর শপথ , না। শাক্বীক বলখী রহ . বললেন, আল্লাহর শপথ , আমার আজকের অনুভূতি ও আনন্দ বাসর রাতের মতোই।

[সিয়ারু আ 'লামিন নুবালা]

তিনি ১৯৪ হি : সনে কুমলানের যুদ্ধে ইন্তেকাল করেন।

[সিয়ারু আ 'লামিন নুবালা , খ.৬, পৃ .৩১৩, তাহজীবু ইবনে আসাকির , খ.৬, পৃ .৩৩৫, হিলয়াতুল আউলিয়া, খ.৮, পৃ .৬৪]

ইমাম আবু হানিফা রহ. এর নামে ভিত্তিহীন বিকৃত আকিদা প্রচার (পর্ব-2)
IJHARUL ISLAM·FRIDAY, 16 OCTOBER 2015

ইমাম আবু হানিফা রহ. মূল বক্তব্য:

ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, “ ব্যক্তি বলল যে, আল্লাহ তায়ালা আকাশে আছেন না কি পৃথিবীতে আছেন আমি জানি না, তবে সে কুফুরী করল। একইভাবে যে বলল, আল্লাহ আরশের উপর রয়েছেন। তবে আরশ আকাশে রয়েছে না কি পৃথিবীতে রয়েছে, সেটা আমি জানি না। আল্লাহ তায়ালার নিকট দু’য়া করা হবে বা আল্লাহকে ডাকা হবে উপরের দিক থেকে (অথর্াৎ উপরের দিকে হাত মাধ্যমে)। নীচের দিক থেকে নয়। কেননা নীচতা কখনও প্রভূত্ব ও খোদা হওয়ার গুণ নয়। এ বিষয়ে রাসূল স. থেকে একটি হাদীস রয়েছে এক ব্যক্তি তার কালো বাঁদী নিয়ে রাসূল স. এর নিকট এলো। সে বলল, আমার উপর একজন মু’মিন বাঁদী আজাদ করা ওয়াজিব। এই বাঁদীকে আজাদ করা কি যথেষ্ট হবে? রাসূল স. বাঁদীকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি মু’মিন? সে বলল, । রাসূল স. বললেন, আল্লাহ কোথায়? সে আকাশের দিকে ইঙ্গিত করলো। রাসূল স. বললেন, তাকে আজাদ করতে পারো। কেননা, সে মু’মিন ।

[আল-ফিকহুল আবসাত, আল্লামা যাহিদ আল-কাউসারী রহ. এর আল-আকিদা ও ইলমুল কালাম পৃ.৬০৭, ৬০৮, ৬০৯,]

ইমাম আবু হানিফা রহ. প্রথম দু’টি বক্তব্য নিয়ে সালাফীরা বিভিন্ন
ধরণের অপপ্রচারে লিপ্ত রয়েছে আমাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এটি। উপরের দিকে

রেখে দু’য়া করার বিষয়টি নিয়েও প্রসঙ্গক্রমে সামান্য আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেছেন, ব্যক্তি এটা জানে না যে, আল্লাহ আকাশে রয়েছেন না কি পৃথিবীতে, সে কুফুরী করল এ ব্যক্তির এখানে উল্লেখ করা হয়নি। এখানে যেহেতু “অথবা” অব্যয় পদ ব্যবহার করা হয়েছে, কুফুরীর কারণ দু’টি সম্ভাবনার যে কোন একটি হবে। ১. ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে পৃথিবীতে বিশ্বাস করলো না সে কাফের। অথবা ২. যে ব যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে আকাশে বিশ্বাস করলো না সে কাফের।

এখন প্রশ্ন হলো, আল্লাহ তায়ালাকে পৃথিবীতে বা আকাশে বিশ্বাস না করা আদৌ কি কুফুরী কোন বিষয়? কেউ যদি বলে, আমি আল্লাহ তায়ালাকে পৃথিবীতে বিশ্বাস করি না, তবে কি আদৌ কাফের হওয়ার কথা বলা যাবে? অথবা কেউ যদি বলে, আমি আল্লাহ তায়ালাকে আকাশে বিশ্বাস করি না, এটিও কোন কুফুরী কথা?

একটি সর্বজনীন অকাট্য বিষয় যে, আল্লাহ তায়ালাকে কোন সৃষ্টির মাঝে বিশ্বাস করা হলো। কেউ যদি আল্লাহ তায়ালাকে পৃথিবীতে বিশ্বাস করে, তবে স্রষ্টাকে সৃষ্টির মাঝে বিশ্বাস করার কারণে কুফুরী হবে। একইভাবে কেউ যদি আল্লাহ তায়ালাকে আকাশে বিশ্বাস করে, তবুও এটি কূফুরী হবে। কেননা, আকাশও আল্লাহর একটি সৃষ্টি। এটিকে আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন।

পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালাকে বিশ্বাস করা যে কুফুরী এ বিষয়ে সালাফীরাও একমত যদিও তাদের কোন কোন ইমাম আল্লাহ তায়ালা গাছের মধ্যে, তিনি পৃথিবীতে তওয়াফ বা চক্কর দিবেন, এজাতীয় ভ্রান্ত আকিদা রাখে। আরও আশ্চযর্ের বিষয় হলো, সালাফীদের কিছু কিছু ইমাম আল্লাহ তায়ালাকে

আকাশে বিশ্বাস করাকেও ভ্রষ্টতা ও ভ্রান্ত আকিদা হিসেবে মেনে নিয়েছেন। যদিও তাদের অধিকাংশের বিশ্বাস হলো, তায়ালা প্রত্যেক রাতের শেষভাগে প্রথম আসমানে সত্তাগতভাবে অবতরণ করেন।

মোটকথা, আকাশে বা পৃথিবীতে যেখানেই আল্লাহ তায়ালাকে বিশ্বাস করবে, সেটা সালাফীদের নিকটও কুফুরী। এবার ইমাম আবু হানিফা রহ. বক্ত আবারক্ষ য করুন, "ব্যক্তি বলল, আল্লাহ তায়ালা আকাশে আছেন না কি পৃথিবীতে আছেন আমি জানি না, তবে সে কুফুরী করল"।

যখন সালাফীরা তোতাপাখীর মতো ইমাম আবু হানিফা রহ. বক্তব্য উদ্ধৃত করে, তখন বিনয়ের সাথে আমরা তাদেরকে প্রশ্ন করেছি, ইমাআ মের এই বক্তব যের অথর্ কী? উক্ত ব্যক্তিকে কাফের হওয়ার কথা কেন বললেন? কুফুরীর কারণটা বলুন। তখন তারা একেবারে চুপ হয়ে যায়।

একটা বিষয় তো খুবই স্পষ্ট। আল্লাহ তায়ালাকে আকাশে অথবা পৃথিবীতে বিশ্বাস না করাটা যদি কুফুরী হয়, তাহলে এর বিপরীতটা ইমান হবে। অথর্াৎ আল্লাহ তায়ালাকে পৃথিবী বা আকাশে বিশ্বাস করাটা ইমান হবে। যেসব সালাফীরা ইমাম আবু হানিফা রহ. বক্তব্য না বুঝে প্রচার করে থাকেন, তাদের কাছে বিনীত আবেদন, আপনারা স্পষ্ট ভাষায় লিখে দিন। আল্লাহ তায়ালাকে আকাশে অথবা পৃথিবীতে বিশ্বাস করাটাই হলো প্রকৃত ইমান। আল্লাহ তায়ালাকে আকাশে অথবা পৃথিবীতে বিশ্বাস না করা হলো কুফুরী। এটি যদি লিখতে না পারেন, কেন ইমাম আবু হানিফার এই বক্তব্য না বুঝে প্রচার করে থাকেন?

আসুন ইমাম আবু হানিফা রহ. করা যাক।

১. কেউ যদি বলে , আমি জানি না , আল্লাহ আকাশে রয়েছেন না কি পৃথিবীতে রয়েছেন। তাহলে সে দু ’টো বিষয়ে অজ্ঞতার কথা স্বীকার করেছে। আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে রয়েছেন কি না সে জানে না। একইভাবে আল্লাহ তায়ালা আকাশে রয়েছেন কি না , সে জানে না এ ব্যক্তির উপর কুফুরীর ফতোয়া দিতে হলে কুফুরীর কারণ বণর্না করতে হবে। একটি কারণ হতে পারে , আল্লাহ তায়ালাকে পৃথিবীতে বিশ্বাস না করার কারণে সে কুফুরী করেছে। অথবা আল্লাহ তায়ালাকে আকাশে বিশ্বাস না করার কারণে সে কুফুরী করেছে।

২. এমন হতে পারে , আল্লাহ তায়ালা আকাশ ও পৃথিবী উভয় জায়গায় রয়েছেন। আল্লাহর এই অবস্থান সম্পকের্ জানে না। এজন্য সে কাফের হয়ে যাবে।

৩. আমরা জানি, আকাশ ও পৃথিবী উভয়টিই আল্লাহর সৃষ্টি। উভয়টি এক সময় ছিলো না। এগুলোর কোনটিই অনাদী ও অনন্ত নয়। সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টাকে বিশ্বাস করা কুফুরী হওয়ার বিষয়ে সকলেই একমত। সুতরাং কেউ যদি আল্লাহ তায়ালাকে পৃথিবীতে বিশ্বাস করে তবে এটিও স্রষ্টাকে সৃষ্টির মাঝে বিশ্বাস হয়। কেউ যদি আল্লাহ তায়ালাকে আকাশে বিশ্বাস করে, তবে এটিও সৃষ্টির মাঝেই আল্লাহকে বিশ্বাস করা হয়। সৃষ্টি হওয়ার দিক মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। স্রষ্টাকে সৃষ্টির মাঝে বিশ্বাস করা যেহেতু কুফুরী সুতরাং কেউ আল্লাহ তায়ালাকে পৃথিবীতে বিশ্বাস করলে কুফুরী করবে। একইভাবে কেউ আল্লাহ তায়ালাকে আকাশে বিশ্বাস করলেও কুফুরী করবে। কারও বিশ্বাস যদি এমন হয় , আল্লাহ তায়ালা তার কোন সৃষ্টির মাজে আছেন , তবে সেই সৃষ্টি কোনটি আমি জানি না , এ ব্যক্তি কুফুরী করবে। একইভাবে কেউ যদি বলে , আল্লাহ তায়ালা আকাশে অথবা পৃথিবীতে আছেন , তবে কোনটিতে আছেন আমি জানি না তার বক্তব্যটার অথর্ হলো , তায়ালা সৃষ্টির মধ্যেই আছেন। সেই সৃষ্টি আকাশ না কি পৃথিবী সেটি আমি জানি ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে দু ’টো সৃষ্টির মধ্যে বিশ্বাস করছে। তবে কোনটার আছে, সেটা সে জানে না। যেমন কেউ যদি বলে , প্রধানমন্ত্রী এখন গণভবনে

আছে না কি সংসদে আছে সেটা আমি জানি না। গণভবনে অথবা সংসদে ভবনে প্রধানমন্ত্রী আছেন, এটা সে জানে বা বিশ্বাস করে। কিন্তু সে নিশ্চিত
নয় যে, সে এই দু’টোর কোনটিতে আছে।

গণভবন বা সংসদের কোনটিতেই যদি প্রধানমন্ত্রী না থাকেন, এ ব্যক্তি তথ্যের কারণে দোষী হবে এ ব্যক্তিকে যদি আমরা দোষী প্রমাণ করি, তবে কোন অংশের কারণে দোষী সাব্যস্ত করবো। ১. গণভবনে বা সংসদে না থাকার পরও প্রধানমন্ত্রীরনামে মিথ্যা ছড়িয়েছে, একারণে সে দোষী। ২. সংসদে
আছে না গণভবনে, বিষয়ে সে দোদূল্যমান থাকার কারণে দোষী।

যে কেউ এ ব্যাপারে সচেতন যে, সংসদে না গণভবনে না থাকাটা নিশ্চিত হওয়ার
সে প্রধানমন্ত্রীর নামে মিথ্যাচার করার কারণে সে দোষী। দুই
জায়গার কোন জায়গায় আছে, এ বিষয়ে না জানাটা তার কোন অপরাধ নয়। মূল অপরাধ হলো, এই দু’জায়গায় প্রধানমন্ত্রী না থাকার পরও সে বলেছে, এই
দুই জায়গার যে কোন এক জায়গায় প্রধানমন্ত্রী আছে। তবে আমি জানি না, তিনি কোন জায়গায় আছেন।

একইভাবে ইমাম আবু হানিফা রহ. বক্তব্যটিও বুঝুন। আকাশ, পৃথিবী, আরশ-কুরসী এগুলো সবই আল্লাহর সৃষ্টি। আল্লাহর কোন সৃষ্টির মাঝে অবস্থানের বিশ্বাস করা কুফুরী। কোন একটি সৃষ্টির মধ্যে বিশ্বাস করলেই কুফুরী হবে। আকাশ আল্লাহর সৃষ্টি। পৃথিবী আল্লাহর সৃষ্টি। এই দু’টোর যে কোন একটিতে বা উভয়টিতে আল্লাহকে বিশ্বাস করার অথর্ হলো স্রষ্টাকে তার সৃষ্টির মাঝে বিশ্বাস করা। সেই সৃষ্টি আকাশ হোক, পৃথিবী হোক, আরশ হোক বা কুরসী হোক। কোন সৃষ্টির মাঝে বিশ্বাস করছে, এটা মূল বিষয়
নয় এই ব্যক্তির কুফুরীর মূল বিষয় হলো, সে আল্লাহ তায়ালাকে সৃষ্টির মাঝে বিশ্বাস করেছে। আর এই কারণে ইমাম আবু হানিফা রহ. তার কুফুরীর
কথা বলেছেন।

“ ব্যক্তি বলল যে , আল্লাহ তায়ালা আকাশে আছেন না কি পৃথিবীতে আছেন আমি জানি না , তবে সে কুফুরী করল ”। এই কথাটাকে যদি আমরা ভেঙ্গে লিখি , তবে এভাবে লেখা যায়।

“ ব্যক্তি বিশ্বাস করলো যে , আল্লাহ তায়ালা কোন সৃষ্টির মাঝে রয়েছেন। তবে তিনি কোন সৃষ্টির মাঝে রয়েছেন , ব্যাপারে সে নিশ্চিত নয়, এ ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে সৃষ্টির মাঝে বিশ্বাসের কারণে কুফুরী করল ”।

ইমাম আবু হানিফা রহ . বক্তব্যটি লক্ষ্য করুন। “কেউ যদি বলে , আল্লাহ আরশে রয়েছেন, তবে আরশ আসমানে রয়েছে না কি পৃথিবীতে রয়েছে , আমি জানি না , তবে সে কুফুরী করল ”।

বিষয়টা এভাবে বুঝুন। আজকে প্রধানমন্ত্রী বিমানে ভ্রমণ করছেন না। এখন কেউ যদি বলে, প্রধানমন্ত্রী বিমানে রয়েছেন। তার বিমানটি ঢাকা ইয়ারপোটের্ না কি যশোরে , সেটা আমি জানি না এ ব্যক্তি এক সাথে দু ’টো অপরাধ করেছে। প্রথমত : প্রধানমন্ত্রী বিমানে না থাকার পরে তাকে বিমানে বল করেছে। সাথে সাথে ঢাকা ও যশোরের কোথাও না থাকা সত্ত্বেও সে এই দু ’ই কোন একটি জায়গায় আছেন বলে মিথ্যাচার করেছে।

মাধ্যমে যদি প্রধানমন্ত্রীর নামে এ ধরণের মিথ্যা সংবাদ ছড়ানো হয় , তবে ব্যক্তির কোন কথাটাকে অপরাধ হিসেবে ধরা হবে ?

একইভাবে আরশ আল্লাহর একটি সৃষ্টি। এক সময় ছিলো না। এটি আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন। ফেরেশতারা আরশ বহন করে থাকে। আরশের চারপাশে তারা প্রদক্ষিণ করে। সাহাবী হযরত সায়াদ রা . মৃত্যুতে আরশ কেঁপে উঠে। এখন কেউ যদি এমন ধ্বংসশীল সৃষ্টির উপর আল্লাহ তায়ালা রয়েছেন

বলে বিশ্বাস করে , তবে স্রষ্টাকে সৃষ্টির স্তরে নামিয়ে আনা হবে। এরপর তার অপরাধ সীমা ছাড়িয়ে যায় এভাবে যে , সে আরশ ছাড়াও আরও দু'টি সৃষ্টির কোন একটিতে আল্লাহ তায়ালাকে বিশ্বাস করছে। সে আরশ সম্পকের্ এ বিশ্বাস রাখে যে , কোন সৃষ্টির মধ্যে আছে। তবে এটি আকাশে না কি সে জানে না। এ ব্যক্তির মূল অপরাধ হলো , তায়ালাকে সৃষ্টির মধ্যে বা সৃষ্টির উপর বিশ্বাস করা। আরশের উপর আল্লাহ তায়ালা রয়েছেন , এই বিশ্বাস রাখা তার প্রথম অপরাধ। দ্বিতীয় অপরাধ হলে , আকাশ অথবা পৃথিবীর যে কোনটিতে সে আল্লাহকে বিশ্বাস করেছে এখন এই ব্যক্তিকে ইমাম আবু হানিফা রহ . কাফের হওয়ার কথা বলেছেন , তার এই দু 'টি বিশ্বাসের কারণে উভয় বক্তব্যকে একই পযর্ায়ে রেখেছেন। "একইভাবে" এ শব্দটি ব্যবহার করে ইমাম আবু হানিফা রহ . স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছেন , বক্তব্যের মূল বিষয় এক আ'জমের বক্তব্যটি আবার লক্ষ্য করুন।

" ব্যক্তি বলল যে , আল্লাহ তায়ালা আকাশে আছেন না কি পৃথিবীতে আছেন আমি জানি না , তবে সে কুফুরী করল। একইভাবে যে বলল , আল্লাহ আরশের উপর রয়েছেন। তবে আরশ আকাশে রয়েছে না কি পৃথিবীতে রয়েছে , সেটা আমি জানি না "।

কিছু মূখর্ সালাফী ইমাম আবু হানিফা রহ . এই বক্তব্যকে সম্পূণর্ উল্টো অথের্ বিকৃত করার চেষ্টা করে থাকে। ইমাম আবু হানিফা রহ . এর বক্তব্য সম্পকের্ বলে , আল্লাহ তায়ালাকে আকাশে বিশ্বাস না করার কারণে সে কুফুরী করেছে। আমরা যখন এসব মূখর্ সালাফীকে জিজ্ঞেস করি , সালাফী ইমামরাই তো আল্লাহ তায়ালাকে আকাশে বিশ্বাস করা ভ্রষ্টতা বলে থাকে। আপনি কীভাবে ইমাম আবু হানিফা রহ . থেকে এই হাস্যকর অথর্ বের করলেন? উদ্দেশ্য নিলেন , যেটা আপনাদের কাছেই ভ্রষ্টতা ? আপনার স্তরে নেমে এসে যদি আপনার কথা মেনেও নেই , তাহলে ইমাম আবু হানিফা রহ . আকাশের সাথে পৃথিবীর কথা কেন বললেন ? সরাসরি এভাবে বলে দিতেন , "কেউ

যদি আল্লাহ তায়ালাকে আকাশে বিশ্বাস না করে , তবে সে কুফুরী করল ”। তার পৃথিবীর কথা রয়েছে।

ইমাম আবু হানিফা রহ . দ্বিতীয় বক্তব্য সম্পকের্ এসব মূখর্রা প্রচার করে থাকে, আল্লাহ তায়ালাকে আরশে বিশ্বাস না করার কারণে ইমাম আবু হানিফা রহ . কুফুরীর কথা বলেছেন।

আমরা যখন এদেরকে বলি, ইমাম সাহেবের মিথ্যা কেন বলেন। ইমাম আবু হানিফা রহ . বক্তব্যেই তো রয়েছে , ব্যক্তি আল্লাহকে আরশের উপর বিশ্বাস করে। আপনাদের প্রচারের সাথে ইমাম আবু হানিফা রহ . বক্তব্যের কোন দিক থেকে কোন মিল নেই।

মোটকথা , আকিদার ক্ষেত্রে জাল হাদীস , ইহুদীদের বর্ণনা ও বিভিন্ন ইমামের নামে মি ও তাদের বক্তব্য বিকৃতি হলো সালাফী আকিদার মূল সম্বল। তাদের এই বাস্তবতার শত শত উদাহরণ তাদের মৌলিক আকিদার কিতাবগুলোতে পাবেন। আমার কথার উপর বিন্দুমাত্র বিশ্বাসের কোন প্রয়োজন নেই। চোখ কান খুলে তাদের ও প্রাচীন আকিদার কিতাবগুলো খুলে দেখুন। আমার বক্তব্যের চেয়েও ভয়ঙ্কর অবস্থা দেখতে পাবেন। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে ভ্রান্ত আকিদা থেকে হেফাজত করুন। বিশুদ্ধ আকিদা গ্রহণের মানসিকতা দান করুন। আমীন।

বি :দ্র : আলোচনাটি এখানেই শেষ নয়। ইমাম আবু হানিফা রহ . বক্তব্য সম্পকের্ বিখ্যাত ইমামগণ কী বলেছেন সেটিও বিস্তারিত আলোচনা করবো ইনশা আল্লাহ। সালাফীরা ইমাম আবু হানিফা রহ . মূল বক্তব্যকে কীভাবে বিকৃত করেছে, সেটিও আলোচনায় আসবে।

একটি দো ’য়া ও আমাদের আমীন

IJHARUL ISLAM·SATURDAY, 17 OCTOBER 2015

আহলে হাদীস আলেম নওয়াব সিদ্দিক হাসান খানের পরিচয় :

উপমহাদেশে আহলে হাদিস আলেম হিসেবে সবচেয়ে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান ভুপালী। তিনি আহলে হাদীস আলেমদের মাঝে সর্বাধিক গ্রন্থপ্রণেতা। যদিও এসব গ্রন্থের অধিকাংশই অন্যের কিতাব থেকে কপি-পেস্ট করা , এরপরেও তিনি আহলে হাদীস আলেম হিসেবে সর্বাধিক প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন। আনিসুর রহমান গংরা তাকে না চিনলেও এদের শায়খরা নওয়াব সিদ্দিক হাসান খানকে কতটা মূল্যায়ন করে তার কিছু নমুনা নীচে উল্লেখ করছি। " কিতাবগুলোতে সিদ্দিক হাসান খান নিজের লিখিত ১১ টি কিতাবে নিজের জীবনী লিখেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল , ১. আবজাদুল উলুম। ২ .আত-তাজুল মুকাল্লাল। ৩ . আল-হিত্তা ফি যিকরির সিহাহ সিত্তা। এছাড়াও নওয়াব সিদ্দিক হাসান খানের পুত্র আলী হাসান মায়াসেরে সিদ্দিকী নামে পৃথকভাবে তার জীবনী রচনা করেছে। তার অপর পুত্র নুরুল হাসান খানও তার জীবনী লিখেছে। বিখ্যাত সালাফী আলেম সুলাইমান ইবনে সাহমান তার উপর কিতাব লিখেছেন। বিভিন্ন উলামায়ে কেরামের অভিমত ও বক্তব্য সংকলন করে মাতবাউল জাওয়াইব থেকে একটি কিতাব প্রকাশিত হয়েছে , قرة الأعيان ومسرة الأذهان في مآثر النواب السيد صديق حسن خان

নওয়াব সিদ্দিক হাসান খানের উপর থিসিস :সৌদি আরবের বিভিন্ন ভার্সিটি থেকে নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান ভুপালীর উপর থিসিস করে অনেকে মাস্টার্স ডিগ্রি নিয়েছেন।

১. ড. আলী আল-আহমাদ। তার থিসিসের নাম , دعوة الأمير العالم صديق حسن خان واحتسابه

২. ড. মুহাম্মাদ আখতার খান নওয়াব সিদ্দিক হাসান খানের আকিদা বিশ্লেষণ করে বৃহৎ কলেবরের দু 'খন্ডের থিসিস লিখেছেন। তার থিসিসের নাম , السيد صديق حسن القنوجي آراؤه الاعتقادية وموقفه من عقيدة السلف

৩.ড. রজিয়া হামেদ পৃথকভাবে সিদ্দিক হাসান খানের জীবনী রচনা করেছেন।

৪.ড. মুহিউদ্দীন আল -আলওয়াই মদীনা ইউনিভার্সিটি থেকে প্রকাশিত পত্রিকায় তার জীবনী আলোচনা করেছেন। (সংখ্যা , ৪৭-৪৮)৫.শায়খ আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ "মুহাম্মাদ বিন সউদ ইউনিভার্সিটি " থেকে তাফসীর বিষয়ে সিদ্দিক হাসান খানের অবস্থান সম্পর্কে মাস্টার্সের থিসিস করেন। তার থিসিসের নাম , منهج صديق حسن خان في التفسير،

নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান সম্পর্কে সালাফী শায়খদের প্রশংসাবাণী :

১. সালাফীদের অনুসরণীয় শায়খ নাসীরুদ্দীন আলবানী দীর্ঘ দিন যাবৎ সিদ্দিক হাসান খানের আর -রওজাতুন নাদিয়্যা কিতাবটি ছাত্রদেরকে পড়িয়েছেন। এবং তিনি তার কিতাব পড়ার নসীহত করেছেন।

[বিস্তারিত , http://www.at-tahreek.com/tawheederdak/sep-oct2010/8.html]

শায়খ আলবানী তার অনেক কিতাবে নওয়াব সিদ্দিক হাসান খানকে "আল্লামা ", মুহাক্কিক (গবেষক) উপাধি দিয়েছেন। বিশেষভাবে , তার সিফাতুস সালাহ (পৃ .১৭৬) ও কিতাবু সালাতিত ত্বারাবীহ (পৃ .৮৪)

২. সালাফীদের অনুসরণীয় বিখ্যাত আলেম হলেন মুহাম্মাদ রশীদ রেজা। এই শায়খের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে শায়খ আলবানী হাদীস শাস্ত্র চর্চায়

উদ্বুদ্ধ হন। শায়খ রশীদ রেজা সিদ্দিক হাসান খান সম্পর্কে বলেন ,
وناهيك بسلفها الصالح السيد صديق حسن خان صاحب المصنفات الشهيرة التي هي من دعائم إحياء العلم والدين، رحمه الله تعالى.অর্থাৎ তাকে 'সালাফে সালেহ ' ও ইলম ও দ্বীনের পুন :জাগরণী মহান পুরুষ আখ্যায়িত করেছেন। (মাজাল্লাতুল মানার , ১৪/৪৭১) অন্য জায়গায় তিনি সিদ্দিক হাসান খানকে 'মহান সংস্কারক ' উপাধি দিয়েছেন।

৩. আহলে হাদীসদের অপর আলেম শামসুল হক আজিমাবাদী তের শ হিজরীতে তিনজনকে মুজাদ্দিদ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। একজন হলেন , ১. মিয়া নজীর হুসাইন দেহলবী। ২ . হুসাইন আল -আনসারী। ৩. নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান ভুপালী। নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান সম্পর্কে আজীমাবাদী আউনুল মা 'বুদে লিখেছে , والعلامة الأجل، المحدِّث الفاضل الأكمل، جامع العلوم الغزيرة، ذو التصانيف الكثيرة، النواب صديق الحسن خان البوفالي القنوجي [আউনুল মা'বুদ , খ.১১, পৃ .৩৯৬]

৪. মাসিক আত-তাহরীক পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান ভূপালীর জীবন ও কর্ম , তার বক্তব্যের উদ্ধৃতি আলোচনা করা হয়েছে। আত-তাহরীক পত্রিকার সার্চ অপশনে গিয়ে 'হাসান খান ' লিখে সার্চ দিলেই বিস্তারিত পেয়ে যাবেন। http://www.at-tahreek.com/search.html মাসিক আত-তাহরিকে নওয়াব সিদ্দিক হাসান খানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়া হয়েছে এভাবে,"নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভারতীয় উপমহাদেশের বহু গ্রন্থ প্রণেতা আলেম ছিলেন। তিনি আরবী , ফার্সী ও উর্দূ তিন ভাষাতেই লিখেছেন। তাফসীর , হাদীছ , ফিকহ, ইতিহাস , আক্বাইদ , কবিতা ও কাব্যচর্চা , সাহিত্য , নৈতিকতা , তাছাওউফ প্রভৃতি বিষয়ে তিনি বিভিন্ন শিরোনামে ৩২৩টি গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেছেন।

"[বিস্তারিত , http://www.at-tahreek.com/june2014/article0201.html]

মোটকথা, আহলে হাদীস ও সালাফীদের প্রথম শ্রেণির আলেমদের নিকট নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান ছিলেন তের শতকের সংস্কারক বা মুজাদ্দিদ। এতকিছু লেখার উদ্দেশ্য হল, আগের মত যেন কোন চুনোপুটি এই দাবী না করতে পারে যে, সিদ্দিক হাসান খান কে আমরা চিনি না অথবা সিদ্দিক হাসান খানের সাথে আহলে হাদীসদের কোন সম্পর্ক নেই। এরপরেও যদি কোন চুনোপুটি এধরনের দাবী করার চেষ্টা করে, তাহলে তাদেরকে বাংলার প্রবাদ শুনিয়ে প্রবোধ দিবেন বলে আশা রাখি। হাতি ঘোড়া গেল তল ভেড়াঁ বলে কত জল।

শাইখে আকবার মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী সম্পকের্ কাজী শাওকানী ও সিদ্দিক খানের বক্তব্য :

আহলে হাদীসদের বিখ্যাত আলেম, কাজী শাওকানীর বিশিষ্ট ছাত্র নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান তার "আত-তাজুল মুকাল্লাল" কিতাবে লিখেছেন,

والذهب الراجح فيه على ماذهب اليه العلماء المحققون الجامعون بين العلم والعمل والشرع والسلوك " السكوت في شأنه " ، وصرف كلامه المخالف لظاهر الشرع الى محامل حسنة ، وكف اللسان عن تكفيره وتكفير غيره من المشائخ الذين ثبت تقواهم في الدين ، وظهر علمهم في الدنيا بين المسلمين ، وكانوا ذروة عليا من العمل الصالح ، ومن ثم رأيت شيخنا الامام العلامة الشوكاني في الفتح الرباني مال الى ذلك ، وقال : " لكلامه محامل " ، ورجع عما كتبه في أول عمره بعد أربعين سنة

অর্থ :[ইবনে আরাবী ও অন্যান্যদের সম্পর্কে] সঠিক বক্তব্য সেটিই যা গ্রহণ করেছে শ্রেষ্ঠ আলেমগণ। যারা ইলম ও আমল ও তাসাউফের সমন্বয়ে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন ছিলেন। তাদের অভিমত হলো, এসব সুফী ইমামদের সম্পর্কে চুপ থাকা। তাদের শরীয়ত বিরোধী কথাগুলোর সুন্দর ব্যাখ্যা দেয়া এবং তাদেরকে কাফের বলা থেকে বিরত থাকা। সাথে সাথে অন্যান্য সূফী শায়খদেরকে কাফের বলা থেকে বিরত থাকা, দ্বীনের

ব্যাপারে যাদের বিশেষ অবস্থান রয়েছে। যাদের ইলম মুসলমানদের মাঝে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। নেক আমলের ক্ষেত্রে যারা ছিলেন সর্বোচ্চ চূড়ায় সমাসীন। আমি আমার উস্তাদ শায়খ কাজী শাওকানীকে দেখেছি , তিনি এই মত গ্রহণ করেছেন। তিনি তাদের বক্তব্য সম্পর্কে বলেছেন , তাদের বক্তব্যের সম্ভাব্য সঠিক ব্যাখ্যা করা সম্ভব। তিনি তার প্রথম জীবনে তাদের সম্পর্কে যা লিখেছিলেন , চল্লিশ বছর পরে সেগুলো প্রত্যাহার করে নেন।

স্কিনশট দেখুন ,

এরপর কাজী নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান লিখেছেন ,

وأقول في هذا الكتاب : إن الصواب ماذهب اليه الشيخ أحمد السهرندي - مجدد الالف الثاني - ، والشيخ الاجل مسند الوقت أحمد ولي الله - المحدث الدهلوي - ، والإمام المجتهد الكبير محمد الشوكاني من قبول كلامه الموافق لظاهر الكتاب والسنة ، وتأويل كلامه الذي يخالف ظاهرهما ، تأويله بما يستحسن من المحامل الحسنة ، وعدم التفوه ، فيه بما لا يليق ، بأهل العلم والهدى ، والله أعلم بسرائر الخلق وضمائرهم

অর্থ : আমি তাদের সম্পর্কে বলবো , সঠিক মত হলো সেটিই যা গ্রহণ করেছেন , মুজাদ্দিদে আলফে সানী শায়খ আহমাদ সিরহিন্দী রহ ., যুগের শ্রেষ্ঠ আলেম শায়খ শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী রহ এবং বিশিষ্ট ইমাম কাজী শাওকানী। তারা বলেছেন , মনসুর হাল্লাজ ও অন্যান্য সূফীদের যেসব কথা কুরআন ও সুন্নাহের অনুগামী , সেগুলো গ্রহণ করা উচিৎ এবং কুরআন ও সুন্নাহের বাহ্যিক বিধানের বিপরীত বক্তব্যগুলো ব্যাখ্যা করা উচিৎ। এগুলোর সঠিক-সুন্দর ব্যাখ্যা করা এবং এগুলো নিয়ে তাদের ব্যাপারে অন্যায় সমালোচনা না করা। কেননা আলেম ও বুজুর্গদের সম্পর্কে মন্দচারিতায় লিপ্ত হওয়া কখনও শোভনীয় নয়।

[আত-তাজুল মুকাল্লাল, পৃ.১৬৮-১৬৯]

আকবার মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবীর জন্য সিদ্দিক হাসান খানের বিশেষ
দুয়া:

“আল্লাহ তায়ালা ইবনে আরাবীকে আমাদের পক্ষ থেকে এবং সমস্ত মুসলমানের পক্ষ থেকে তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। তার নূরানীয়তের ফয়জ আমাদেরকে তার গোপন রহস্য ও তাসাউফের অমূল্য অজর্নের চাদরে আমাদেরকে আবৃত করুন। তিনি খোদাপে্রমের যেই অমীয় সুধা পান করেছেন, তার থেকে
আমাদেরও কিছু দান করুন। ইবনে আরাবীকে যারা ভালবাসে তাদের দলে
আমাদের হাশর-নাশর দান করুন। সবর্শ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ স. এর ওসিলায়ে হে আল্লাহ আমাদের দুয়া কবুল করুন।”

[আত-তাজুল মুকাল্লাল, পৃ.১৬৯]

আমরা আহলে হাদীসদের গুরু সিদ্দিক হাসান খানের এই দুয়ার পক্ষে আমীন বললাম।

সিদ্দিক হাসান খানের বইয়ের ডাউন লোড লিংক:

http://waqfeya.com/book.php?bid=9027

মূল বইয়ের স্ক্রিনশট:

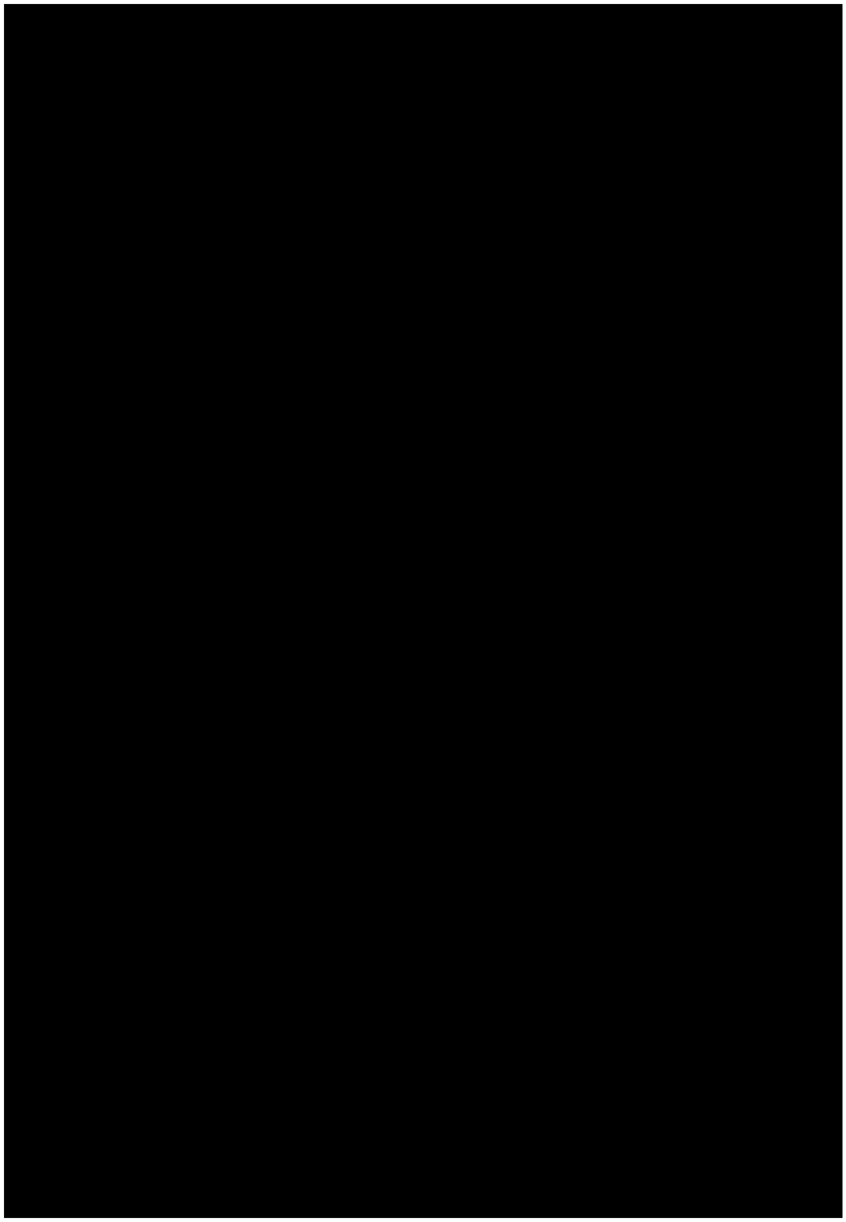

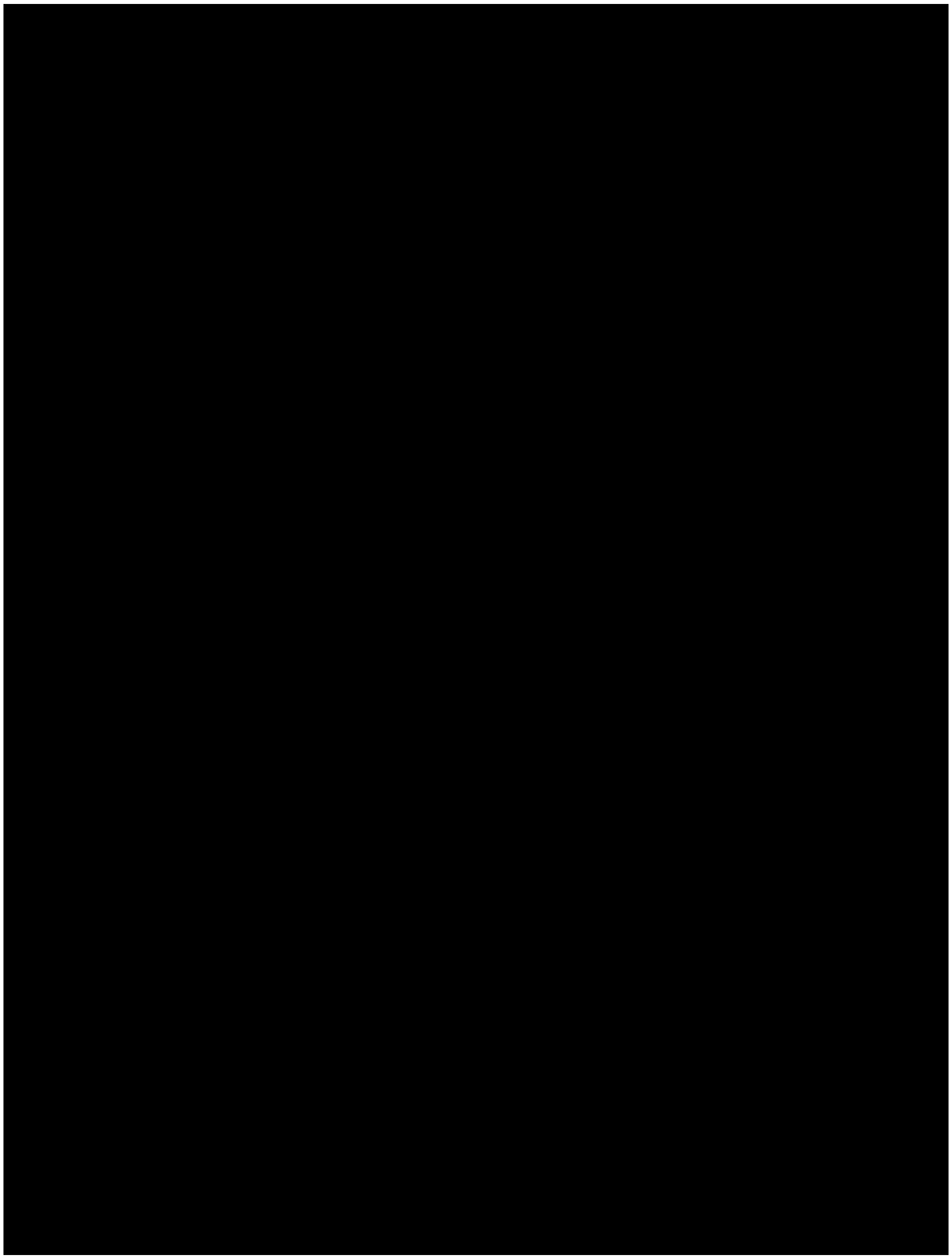

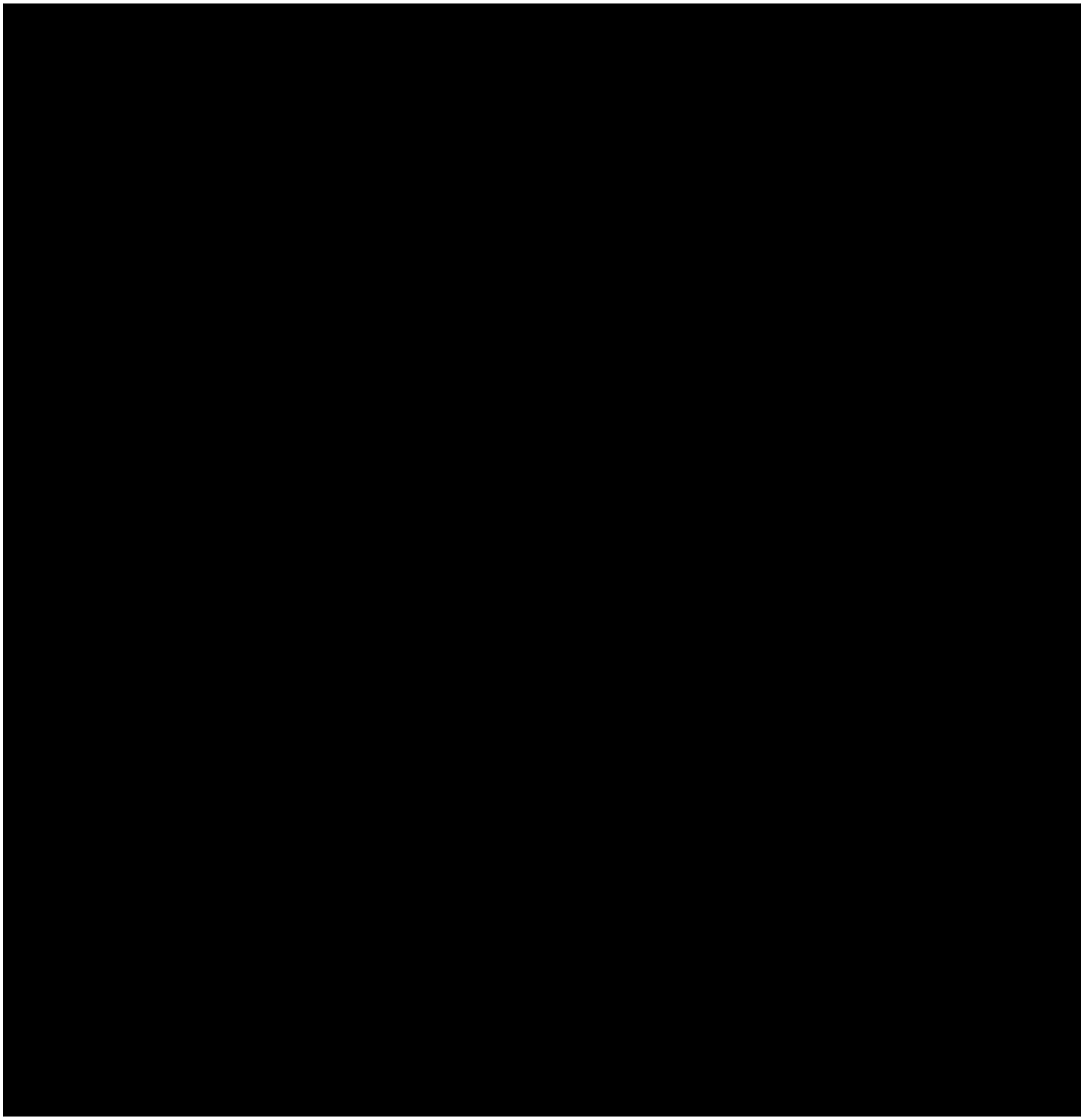

[illegible]

1 February 2015 at 12:07

[illegible]

أي قوم!!، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يُعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له

অর্থ : হে কুরাইশ সম্প্রদায়, আল্লাহর শপথ, আমি বহু রাজা -বাদশার নিকট প্রতিনিধি হয়ে গমন করেছি। আমি কায়সার, কিসরা, ও নাজ্জাশীর নিকট প্রতিনিধি হয়ে গিয়েছি। আল্লাহর শপথ, মুহাম্মাদ স. এর সাহাবীরা তাকে যে পরিমাণ সম্মান করে, কোন রাজা-বাদশাকে এধরনের সম্মান করতে দেখিনি। আল্লাহর শপথ, তিনি যদি কফ ফেলেন, তাহলে সেটা তার কোন সাহাবীর হাতে পড়ে। আর সেই সাহাবী সেটি তার মুখে ও শরীরে মেখে নেয়। তিনি কোন আদেশ করলে সেটি পালনে তারা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। তিনি ওজু করলে তার ওজুর পানি নেয়ার জন্য এত বেশি প্রতিযোগিতা করে যেন তারা যুদ্ধ করছে। রাসূল স. এর সামনে তারা অত্যন্ত নিচু স্বরে কথা বলে। তাঁর সম্মানে তারা চোখ তুলে তার দিকে তাকায় না। [বোখারী শরীফ, হাদীস নং ২৭৩৪]

হাদীস থেকে শিক্ষণীয় বিষয় :

১. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন,

وفيه طهارة النخامة والشعر المنفصل، والتبرك بفضلات الصالحين الطاهرة

অর্থ : এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষের কফ ও কর্তিত চুল পবিত্র এবং নেককার বুজুর্গদের শরীরের পবিত্র জিনিস দ্বারা বরকত হাসিল করা যায়। [ফাতহুল বারী, খ.৫, পৃ.৩৪১]

বোখারী শরীফের বিখ্যাত ব্যাখ্যাকার আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি রহ. বলেন,

ومن الاستنباط من هذا الحديث، التبرك ببزاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم توقيرا له وتعظيما

অর্থ : এই হাদীস থেকে গবেষণালব্ধ শিক্ষণীয় বিষয় হল , রাসূল স . এর সম্মানে তার থুতু দ্বারা বরকত হাসিল করা। [উমদাতুল কারী , খ.৩, পৃ .১৭৮]

২ য় হাদীস :

হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. বর্ণনা করেন ,

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خَدَمُ المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها

অর্থ : রাসূল স . যখন ফজরের নামাজ শেষ করতেন, মদীনার খাদেমরা পানিভর্তি পাত্র নিয়ে উপস্থিত হত। রাসূল স . সকল পাত্রে নিজের হাত ডুবিয়ে নিতেন। এমনকি অনেক শীতের সকালে পাত্র নিয়ে এলেও রাসূল স . হাত ডুবাতেন। [মুসলিম শরীফ , হাদীস নং ২৩২৪ , অধ্যায় , সাধারণ মানুষকে রাসূল স . এর নৈকট্য প্রদান এবং রাসূল স . এর থেকে তাদের বরকত হাসিল]

হাদীস থেকে শিক্ষণীয় বিষয় :

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনুল জাওযী রহ . বলেন,

إنما كانوا يطلبون بهذا بركته صلى الله عليه وسلم، وينبغي للعالم إذا طلب العوام التبرك به في مثل هذا ألا يخيب ظنونهم

অর্থ : সাহাবীরা এভাবে রাসূল স . এর বরকত হাসিল করত। একইভাবে কোন আলেম থেকে সাধারণ মানুষ যদি বরকত হাসিল করতে চায় , তাহলে তাদেরকে সুযোগ দেয়া উচিৎ , যেন তাদের ধারণা নষ্ট না হয়। [কাশফুল মুশকিল মিন হাদিসিস সহীহাইন , খ.৩, পৃ .৩১২]

মুসলিম শরীফের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থে ইমাম নববী রহ . বলেন,

وفيه التبرك بآثار الصالحين، وبيان ما كانت الصحابة عليه من التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم وتبركهم بإدخال يده الكريمة في الآنية

অর্থ : এই হাদীস থেকে একটি শিক্ষণীয় বিষয় হল , নেককার বুজুর্গদের থেকে বরকত হাসিল। সাহাবায়ে কেরাম রা . রাসূল স . এর থেকে কীভাবে বরকত হাসিল করতেন তার বর্ণনাও রয়েছে এই হাদীসে। অর্থাৎ বরকতের উদ্দেশ্যে রাসূল স . এর মোবারক হাত তাদের পাত্রে ঢোকাতেন। [শরহু সহীহি মুসলিম , খ.১৫, পৃ .৮২]

৩ য় হাদীস :

হযরত আনাস ইবনে মালিক রা . বলেন,

لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه، وأطاف به أصحابه، فما يُريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل

অর্থ : আমি রাসূল স . এর মাথার চুল হলক করতে দেখেছি। সাহাবায়ে কেরাম রাসূল স . এর চার পাশে চক্কর দিতেন। রাসূল স . এর মাথা থেকে কোন চুল পড়লে যেন কোন সাহাবীর হাতে পড়ে। [মুসলিম শরীফ , হাদীস নং ২৩২৫]

হাদীস থেকে শিক্ষণীয় বিষয় :

ইমাম নববী , ইবনে হাজার আসকালানী ও ইমাম বদরুদ্দিন আইনি রহ. বলেন,

" এই হাদীস থেকে রাসূল স. এর চুলের মাধ্যমে বরকত হাসিল প্রমাণিত হয় "[শরহু সহীহি মুসলিম , খ.৯, পৃ.৫৪, ফাতহুল বারী , খ.১, পৃ.২৭৫, উমদাতুল কারী , খ.৩, পৃ. ৩৮]

আহলে হাদীস-সালাফীদের অনুসরণীয় আলেম কাজী শাওকানী , আব্দুর রহমান মুবারকপুরী ও শামসুল হক আজীমাবাদী বলেন ,

" এই হাদিস থেকে বুজুর্গদের চুল ও অন্যান্য জিনিস দ্বারা বরকত হাসিলের বৈধতা প্রমাণিত হয় "[নাইলুল আওতার, খ.৫, পৃ.১২৮, তুহফাতুল আহওয়াজী , খ.৩, পৃ.৫৬, আউনুল মা'বুদ , খ.৫, পৃ.৩১৭]

৪ র্থ হাদীস :

হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. বলেন,

قال دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا فعرق وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب

অর্থ : রাসূল স . আমাদের বাড়ীতে আগমন করেন এবং বিশ্রামের উদ্দেশ্যে শয়ন করেন। রাসূল স . ঘেমে যাচ্ছিলেন। আমার মা একটি বোতল নিয়ে এলেন এবং রাসূল স . এর শরীর থেকে ঘাম মুছে সেই বোতলে ভরছিলেন। রাসূল স . জেগে উঠলেন এবং বললেন, হে উম্মে সুলাইম , তুমি এটি কী করো ? তিনি বললেন , এটি আপনার ঘাম। আমরা একে সুগন্ধি হিসেবে ব্যবহার করি। কেননা এটি সর্বোত্তম সুগন্ধি। [মুসলিম শরীফ , হাদীস নং ২৩৩১]

মুসলিম শরীফের অপর বর্ণনায় রয়েছে ,

ما تصنعين يا أم سليم فقالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا قال أصبت

অর্থ : হে উম্মে সুলাইম , তুমি কী করছ ? তিনি বললেন , হে আল্লাহর রাসূল , আমাদের শিশুদের জন্য এর থেকে বরকত হাসিল করতে চাই। রাসূল স . বললেন, তুমি ঠিক করেছ।

এছাড়াও সাহাবায়ে কেরাম রাসূল স . এর পরিহিত পোশাক দ্বারা বরকত হাসিল করতেন। এ সংক্রান্ত বর্ণনার জন্য দেখুন , বোখারী শরীফের ৫৬৮৯ নং হাদীস।

৫ম হাদীস :

হযরত মাহমুদ ইবনে রবী আল -আনসারী বর্ণনা করেন ,

أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير، فصل يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أين تحب أن أصلي؟" فأشار إلى مكان من البيت، فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم

অর্থ : হযরত ইতবান বিন মালিক রা. একজন অন্ধ সাহাবী ছিলেন। তিনি তার সম্প্রদায়ের ইমাম ছিলেন। তিনি রাসূল স. কে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, অনেক সময় পথ অন্ধকার থাকে, বৃষ্টি হলে পানির প্রবাহ থাকে। আর আমি একজন অন্ধ। হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আমার ঘরের একটি জায়গায় নামায পড়ুন। এটাকে আমার নামাযের জায়গা বানাব। রাসূল স. তার বাড়ী আগমন করলেন এবং বললেন, আমি কোথায় নামায পড়লে তুমি খুশি হবে? তিনি ঘরের একটি জায়গা দেখালেন। রাসূল স. সেখানে নামায আদায় করলেন। [বোখারী শরীফ, হাদীস নং ৬৩৬]

হাদীস থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

কাজী ইয়াজ রহ. বলেন,

فيه التبرك بالفضلاء، ومشاهد الأنبياء وأهل الخير ومواطئهم، ومواضع صلاتهم، وإجابة أهل الفضل لما رغب إليهم فيه من ذلك" ।

এই হাদীস থেকে বুজুর্গদের থেকে বরকত হাসিলের বিষয়টি প্রমাণিত হয়। এছাড়া নবী ও ওলীগণের স্মরণীয় স্থান, তাদের হাটা-চলার জায়গা, তাদের নামাজের জায়গা থেকে বরকত হাসিল প্রমাণিত হয়। সেই সাথে এটাও প্রমাণিত হয় যে, বুজুর্গদের থেকে এভাবে কেউ বরকত লাভ করতে চাইলে তার আবেদনে সাড়া দেয়া উচিৎ।"[ইকমালুল মু'লিম, কাজী ইয়াজ রহ. খ.২, পৃ.৩৫৩]

ইমাম নববী রহ. বলেন,

وفيه التبرك بالصالحين وآثارهم، والصلاة في المواضع التي صلوا بها، وطلب التبريك منه

অর্থ : এই হাদীস থেকে একটি শিক্ষণীয় বিষয় হল, নেককার বুজুর্গদের মাধ্যমে বরকত লাভ। এবং বুজুর্গরা যেখানে নামায আদায় করেছেন সেখানে নামায আদায় করে বরকত অর্জন করা। [শরহু সহীহি মুসলিম, খ.৫, পৃ.১৬১]

কাজী শাওকানী নাইলুল আওতারে লিখেছেন ,

"وفيه أنه يشرع لمن دعي من الصالحين للتبرك به الإجابة، وإجابة الفاضل دعوة المفضول، وغير ذلك من الفوائد

অর্থ : এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে , কোন নেককার বুজুর্গ থেকে কেউ যদি বরকত হাসিল করতে চাই , তাহলে তার আবেদনে সাড়া দেয়া উচিৎ । এছাড়াও অনুত্তমের দাওয়াতে উত্তমের সাড়া প্রদানসহ আরও অনেক শিক্ষণীয় বিষয় এই হাদীসে রয়েছে। [নাইলুল আওতার, খ.৩, পৃ .৯৫]

৬ষ্ঠ হাদীস :

হযরত আবু বকর রা . এর কন্যা আসমা এর নিকট রাসূল স . এর জুব্বা ছিল। তিনি জুব্বাটি বের করে বলেন,

وقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عند عائشة فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها

অর্থ : এটি রাসূল স . এর জুব্বা। এটি হযরত আয়েশা রা . এর কাছে ছিল। হযরত আয়েশার যখন ইন্তেকাল হলে আমি এটি নিয়েছি। রাসূল স . জুব্বাটি পরতেন। আমরা এই জুব্বা ধৌত করে অসুস্থদেরকে পানি পান করায় যেন তারা এর দ্বারা আরোগ্য লাভ করে। [মুসলিম শরীফ , হাদীস নং ২০৬৯]

ইমাম যাহাবী সিয়ারু আ 'লামিন নুবালাতে লিখেছেন ,

قال عبد الله بن أحمد -أي ابن حنبل- رأيت أبي يأخذ شعرة من شعر النبيّ فيضعها على فيه يقبلها وأحسب أني رأيته يضعها على عينه ويغمسها في الماء ويشربه يستشفي به ورأيته أخذ قصعة النبيّ فغمسها في جب الماء ثم شرب فيها

অর্থ : ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের ছেলে আব্দুল্লাহ বলেন , আমি আমার পিতাকে দেখেছি , তিনি রাসূল স . এর একটি চুল নিয়ে চুমু খাচ্ছিলেন। এছাড়াও তিনি রাসূল স . এর চুল তার চোখের উপর রাখতেন। রোগমুক্তির জন্য চুল পানিতে ডুবিয়ে পানি পান করতেন। আমি তাকে আরও দেখেছি , তিনি রাসূল স . এর ব্যবহৃত পাত্র পানিতে ডুবাতেন এবং সেই পানি পান করতেন।

এই বর্ণনার পর ইমাম যাহাবী নিজের মন্তব্য লিখেছেন ,

قلت -أي الذهبي-: أين المتنطع المنكر على أحمد وقد ثبت أن عبد الله سأل أباه عمن يلمس رمانة منبر النبيّ ويمس الحجرة النبوية، فقال -أي أحمد بن حنبل-: لا أرى بذلك بأسا. أعاذنا الله وإياكم من رأي الخوارج ومن البدع :

অর্থ : "ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের সমালোচনাকারীরা এখন কোথায় ? অথচ ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল থেকে প্রমাণিত যে , তার ছেলে আব্দুল্লাহ তাকে জিজ্ঞাসা করেন , কেউ যদি বরকত হাসিলের জন্য রাসুল স . এর মেম্বার ও তার হুজরা স্পর্শ করে , এ বিষয়ে আপনার মতামত কি? ইমাম আহমাদ বলেন, এতে আমি কোন অসুবিধা দেখি না। আল্লাহ তায়ালা সবাইকে খারেজী ও বিদয়াতীদের মতাদর্শ থেকে হেফাজত করুন। "[সিয়ারু আ 'লামিন নুবালা , খ.১১, পৃ .২১২]

উপর্যুক্ত আলোচনায় হাদীসগুলি গ্রহণ করা হয়েছে বোখারী ও মুসলিম শরীফ থেকে। হাদীসের বুঝ গ্রহণ করা হয়েছে আহলে সুন্নতের বিখ্যাত ইমামগণ থেকে। ইমাম নববী রহ, ইবনে হাজার আসকালানী রহ, কাজী ইয়াজ রহ, ইমাম বদরুদ্দীন আইনি রহ ও ইমাম যাহাবীর মত নক্ষত্রতুল্য ইমামগণের মতামত উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের এসব বক্তব্যের মাধ্যমে তাবাররুক সম্পর্কে আহলে সুন্নতের অবস্থান স্পষ্ট হয়েছে। তাদের মতে নবী-রাসুল ও অলী-বুজুর্গদের থেকে তাবাররুক বা বরকতগ্রহণ শরীয়তে বৈধ। নবী-রাসুল ও অলীদের ব্যবহ্রত আসবাব, তাদের স্মরণীয় স্থান, নামাযের জায়গা, জামা-কাপড় ইত্যাদি থেকেও বরকত হাসিল শরীয়তে বৈধ। মোটকথা, চার মাজহাবের সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমগণের নিকট তাবাররুক বৈধ।

আল্লাহ সবাইকে সঠিক বুঝ দান করুন। আমিন।